ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান পরিচিতি

মানুষের প্রতিটি স্বপ্ন হাঁটিহাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলে বাস্তবায়নের পথে। প্রতিটি স্বপ্ন পূরণের পেছনে থাকে ঘড়ির কাঁটার অবিরাম ছুটে চলা।

প্রায় এক দশক হতে চলল মাকতাবাতুল হাসানের পথ চলা। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে তার অভীষ্ট গন্তব্যে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে জড়িয়ে আছে লক্ষ্যে পৌছার দুর্বার চেতনা।

একটি একটি করে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এখন সত্তর অধিক। আছে ইতিহাস, উপন্যাস, আত্মশুদ্ধি ও শিশুদের জন্য নানা আয়োজন। পাঠকচাহিদা ও সামসময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় রয়েছে আরও কিছু চমকপ্রদ সংযোজন। আছে মৌলিক, সংকলন, অনুবাদের অঢেল ভান্ডার। একটি বইকে পাঠোপযোগী করে তুলতে, পাঠকের হাতে পৌছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে আমাদের দক্ষ কয়েকটি টিম। তাদের ঘাম ঝরানো পরিশ্রম মাকতাবাতুল হাসানের গন্তব্যে পৌছানোর মূল চালিকাশক্তি।

এতকিছুর পেছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কী? আমরা কী চাই?

আমরা চাই সুস্থ একটি পাঠকশ্রেণি গড়ে উঠুক, আর তার ভিত্তি হোক ইসলামি চেতনা। বাংলায় ইসলামি প্রকাশনা সমৃদ্ধ হোক বিশুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের সংযোজনে। প্রজন্ম বেড়ে উঠুক ইসলামি শিক্ষার শীতল ছায়ায়।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে এখনো বাকি অনেকটা পথ। বাকি আরও অনেক কিছু পাঠকদের উপহার দেওয়ার। সে পর্যন্ত আমরা আল্লাহর কৃপার ভিখিরি। আর পাঠকদের দোয়ার মোহতাজ।

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

চতুর্থ খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (৪র্থ খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece (4th Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

* * *

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾

বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর এর দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষরাজি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো ইলাহ আছে কি? তবু তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়।[১]

* * *

---

১. সুরা নামল : আয়াত ৬০।

সূচিপত্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
নাম, পদবি ও শিরোনামের সৌন্দর্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ
কর্ডোভা : একটি নান্দনিক ইসলামি শহরের নমুনা

অষ্টম অধ্যায়
ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইউরোপে ইসলামি সভ্যতার পারাপারস্থল বা সেতু

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব : কিছু নিদর্শন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার মূল্যায়নে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

চিত্র সূচি

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতায় সৌন্দর্যচর্চা

ইসলামি সভ্যতার মহত্ত্ব ও পূর্ণতার একটি দিক এই যে, তা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে সৌন্দর্যের চর্চা করেছে। সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত বিষয় এবং তা সকল মানবমনের গভীরে প্রোথিত—এই চেতনাকে ধারণ করার ফলে ইসলামি সভ্যতা নন্দনচর্চাকে কখনোই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেনি। মানবমন সৌন্দর্যকে ভালোবাসে এবং যা-কিছু সুন্দর তার প্রতি আকর্ষিত হয়। অসুন্দরতা ও কদর্যতাকে ঘৃণা করা এবং যা-কিছু অসুন্দর ও কুৎসিত তা থেকে দূরে সরে থাকাও মানবমনের বৈশিষ্ট্য।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সৌন্দর্যের চর্চা ও নান্দনিক সৃজনশীলতা ইসলামি সভ্যতায় একটি মৌলিক মাত্রা সংযোজন করেছে। যে সভ্যতা সৌন্দর্যের উপাদানশূন্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করার মতো উপায় যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না সেই সভ্যতা মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেয় না, মানসিক পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারে না এবং সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ-আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে পারে না।

এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্যচর্চা ও নন্দনকলা বিষয়ে আলোকপাত করব। এ বিষয়গুলো একটি বিশাল পরিসর তৈরি করে এই সভ্যতার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ফলে তা পূর্ণতা ও মহত্ত্ব এবং মানবিক রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচিত হবে :

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামি শিল্পকলা

শিল্প বা আর্ট সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ইসলামি আর্ট বা শিল্প বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতাকে পরিস্ফুট করে তোলার একটি পরিচ্ছন্ন ও যথার্থ চিত্র; বরং মানব সভ্যতার একটি স্বচ্ছ আয়না। কারণ বিশ্বের সভ্যতাগুলো আধুনিক যুগে ও প্রাচীন কালে যত শিল্পের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে ইসলামি শিল্পকলাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহৎ বলে গণ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও ইসলামি শিল্পকলার ভাগ্যে যথার্থ গবেষণা ও বিচারবিশ্লেষণ জোটেনি। যারা এ বিষয়ে লিখেছেন তাদের অধিকাংশেরই রচনা ইসলামি শিল্পকলা যে চৈন্তিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা বরং পাশ্চাত্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইসলামি শিল্পকলার বিচারবিশ্লেষণ করেছেন।

ইসলামি চারিত্র্যগুণমণ্ডিত শিল্পকলার কয়েকটি প্রকার রয়েছে, যা ইসলামি সভ্যতাকে অনন্য ও অসাধারণ করে তুলেছে। নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে এগুলোর ওপর আলোকপাত করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্থাপত্যকলা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অলংকরণ-শিল্প

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আরবি লিপিকলা

প্রথম অনুচ্ছেদ

স্থাপত্যকলা

ইসলামি স্থাপত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতেই তা প্রতিভাত হয়। সামগ্রিক নকশা বা স্বতন্ত্র স্থাপত্য-শৈলি অথবা ব্যবহৃত অলংকরণের বা মেটিফের কারণে এটা হয়ে থাকে।

মুসলিম স্থপতিরা স্থাপত্য-প্রকৌশলে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তারা প্রাথমিক মাপজোকের পাশাপাশি নির্মাণের জন্য আবশ্যক নকশা প্রণয়ন, সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান ও ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলোর জন্য প্রয়োজন হলো প্রকৌশল, গণিত ও নির্মাণকলায় গভীর জ্ঞান অর্জন। এসব জ্ঞানশাখায় মুসলিমরা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইসলামি স্থাপত্যকলার কয়েকটি প্রযুক্তি ও নির্মাণকৌশল নিয়ে আলোচনা করব। যাতে এগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং এগুলোর উদ্ভাবন ও বিকাশে মুসলিমরা কী অবদান রেখেছেন তা অনুধাবন করা যায়।[২]

গম্বুজের নির্মাণকলা

বড় বড় গম্বুজ নির্মাণে মুসলিমরা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এগুলোর জটিল পরিমাপে সফলতা দেখিয়েছেন। এসব পরিমাপ খোলস-কাঠামো (শেল স্ট্রাকচার) বিশ্লেষণের পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। জটিল ও উন্নত খোলস-কাঠামোর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের কুব্বাতুস সাখরা (Dome of the Rock) এবং আস্তানা, কায়রো ও আন্দালুসের মসজিদগুলোর গম্বুজ। এসব গম্বুজ জটিল গাণিতিক হিসাবনিকাশের ওপর নির্ভরশীল। মসজিদগুলোকে অনুপম নান্দনিক কাঠামো দিয়েছে এসব গম্বুজ। এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে

---

২. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩৯-৪৭।

চিত্র নং-৩
বহিঃগাত্রীয় মুকারনাস
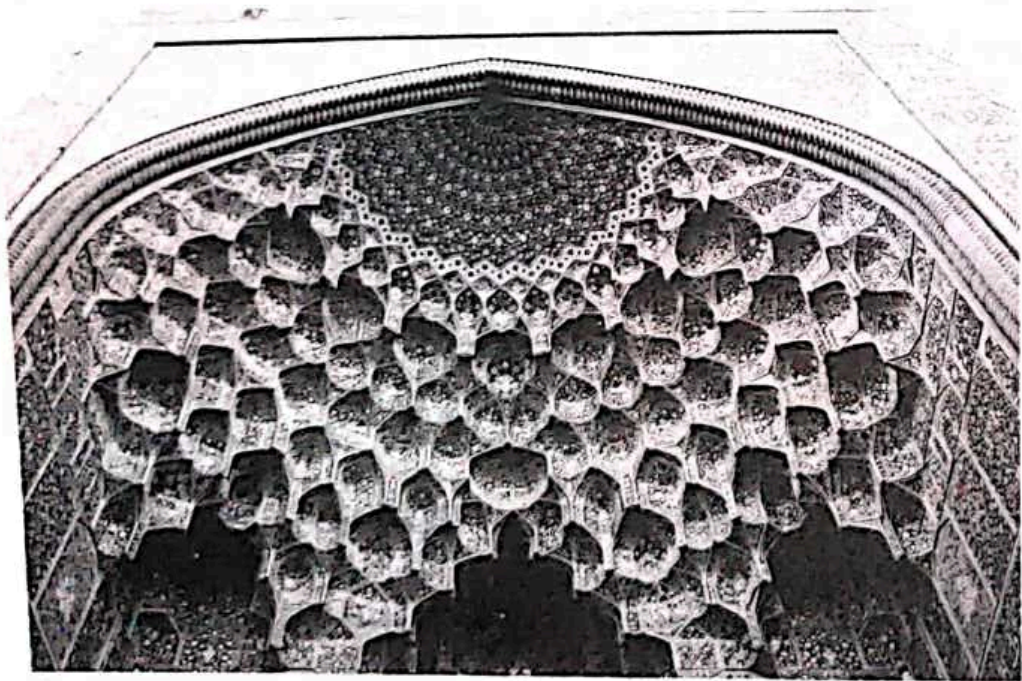
চিত্র নং-৪
অভ্যন্তরীণ মুকারনাস (মেহরাব)
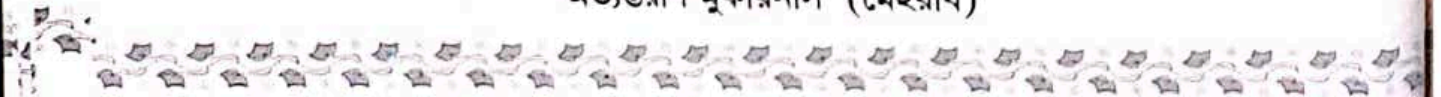
মাশরাবিয়াত নির্মাণকলা

মাশরাবিয়াতের অপর নাম শানশুল বা রুশান। ইসলামি স্থাপত্যশিল্পের বহিঃগাত্রীয় প্রদর্শনমূলক অংশ হলো মাশরাবিয়াত। বাড়িঘরে দুই ধরনের মাশরাবিয়াত নির্মাণ করা হতো : ছিদ্রযুক্ত ও অলংকৃত। মাশরাবিয়াত বৃত্তাকার হলে তার নাম হতো চাঁদনি (কামারিয়্যাহ) এবং বৃত্তাকার না হলে নাম হতো সৌরীয় (শামসিয়্যাহ)। এগুলো হতো কাঠের তৈরি, যাতে জানালার পর্দার মতো শেপ বা আকার দেওয়া হতো। মাশরাবিয়াতের উপকার ছিল অনেক, রোদের তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখত, কমিয়ে রাখত আলোর তেজ এবং মহিলারা বাইরের দৃশ্য দেখতে পেত, যদিও তাদের কেউ বাইরে থেকে দেখতে পেত না। মাশরাবিয়াত ছিল ইসলামি সভ্যতায় নির্মিত বাড়িঘরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৪]

চিত্র নং-৫
মাশরাবিয়াত

[৪]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২৬৮-২৬৯।

স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন নির্মাণকলা : মুসলিমরা ধ্বনিবিজ্ঞানের (Acoustics) প্রয়োগ ঘটিয়ে শ্রুত্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নতি সাধন করেছিলেন। যা বর্তমানে স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন প্রযুক্তি (architectural acoustics technology) নামে পরিচিত। ধ্বনিবিজ্ঞানের উদ্ভব ও তার বিশুদ্ধ পদ্ধতিগত নীতিমালার প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তারা জানতেন যে, ধ্বনি অবতল (ভেতরের দিকে ধনুকের মতো বক্রতাযুক্ত) পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট পার্শ্বস্থ অবলম্বে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। ব্যাপারটি অবতল দর্পণতল থেকে আলোর প্রতিবিম্বিত হওয়ার মতোই।
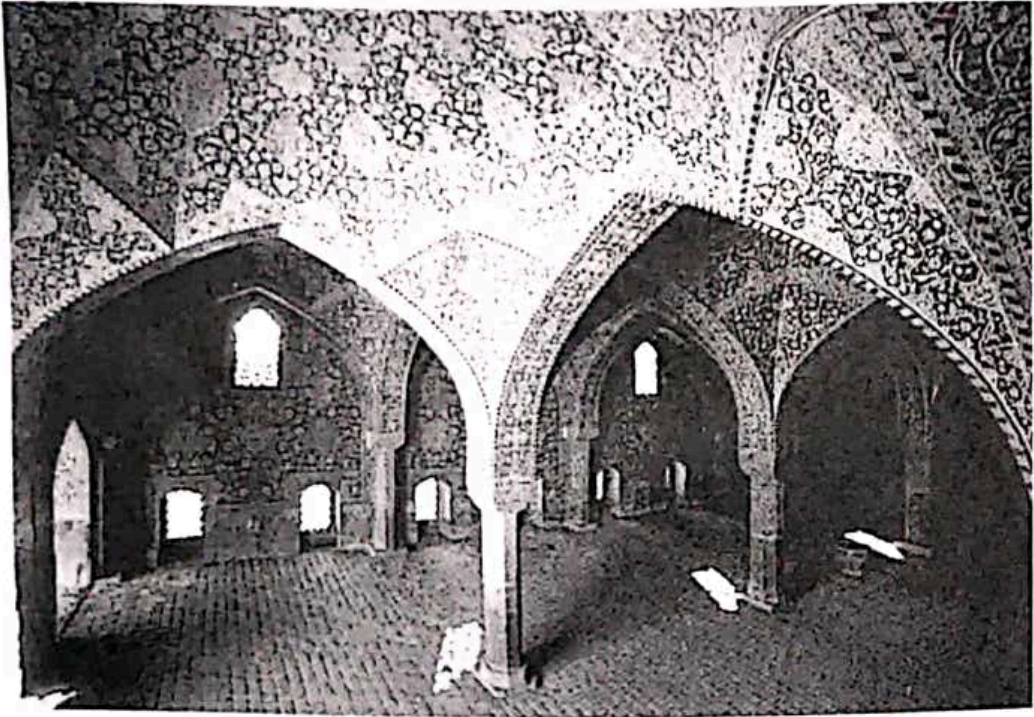
চিত্র নং-৬
স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন নির্মাণকলা

মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা শব্দের কেন্দ্রীভবনের (Focusing of sound) বৈশিষ্ট্যকে নির্মাণকলা ও স্থাপত্যশিল্পে কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে বড় বড় জামে মসজিদে তারা এ কাজটি করেছেন। যাতে জুমআর দিন ও ঈদের দিন ইমাম ও খতিবের আওয়াজ উচ্চকিত হয় ও সমভাবে পরিবেশিত হয়। যেমন : ইস্পাহানের প্রাচীন জামে মসজিদ, আলেপ্পোর আল-আদিলিয়্যাহ মসজিদ, বাগদাদের কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ। এ মসজিদগুলোর ছাদ ও দেয়াল অবতল পৃষ্ঠদেশের আকারে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা মসজিদের মূল অংশে ও কোণগুলোতে যথার্থ বিন্যাসে

ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে ধ্বনি ও আওয়াজ মসজিদের সর্বত্র সমান পরিমাপে পরিবেশিত হয়।

এসব ইসলামি কীর্তি স্থাপত্যশিল্পে ধ্বনি-পরিবেশন প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী হিসেবে আজও বিদ্যমান। প্রখ্যাত মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ও স্থাপত্য শ্রুতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ালেস সি. সাবিন (Wallace Clement Sabine, ১৮৬৮-১৯১৯ খ্রি.) ১৯০০ সালের দিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার হলের দুর্বল ধ্বনি-পরিবেশন ব্যবস্থা ও শ্রুতিগুণের সমস্যা ও কারণ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তা ছাড়া তিনি মিউজিক রুম ও হলঘরের ধ্বনি-সরঞ্জামের (Acoustical properties) কার্যাবলি নিয়েও গবেষণা করেন।[৫]

স্থাপত্যশিল্পে ধ্বনি-পরিবেশন প্রযুক্তির উন্নতিতে মুসলিমদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য ধ্বনির কেন্দ্রীভবনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট। মুসলিমরা তার প্রায়োগিক উপকারিতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। সমকালীন সভ্যতায় ধ্বনির কেন্দ্রীভবনের এই বৈশিষ্ট্য স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন প্রকৌশলের (architectural acoustics engineering) একটি মৌলিক অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় নাট্যশালা ও বিশাল বিশাল সম্মেলন কক্ষ সজ্জিত হয় গোপনীয় অবতল দেওয়ালে, যা শব্দের প্রতিধ্বনি ও অধিকতর স্পষ্টীকরণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

খিলান নির্মাণকলা

ইসলামি স্থাপত্য-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গবেষণা ও তথ্যসূত্র থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, মুসলিমদের স্থাপত্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তির প্রথম যে কাঠামো ও উপাদান দৃষ্টি আর্কষণ করে তা হলো ফাঁপা খিলান। ৮৭ হিজরিতে/৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকের মসজিদে উমাইয়াতে প্রথম ফাঁপা খিলান ব্যবহার করা হয়। তারপর এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এটি ইসলামি স্থাপত্যের একটি অনন্য উপাদানে পরিণত হয়। বিশেষ করে মরক্কোয় ও আন্দালুসে ফাঁপা খিলানের ব্যবহার চোখে পড়ে।

---

৫. Robert Jacobus Forbes ও Eduard Jan Dijksterhuis, *A History of Science and Technology*, পৃ. ৬৮।

তারপর ইউরোপীয় স্থপতিরা এই নকশা গ্রহণ করেন এবং তা তাদের স্থাপত্যশিল্পে বিশেষ করে গির্জায় ও অট্টালিকায় ব্যবহার করেন।

চিত্র নং-৭
ফাঁপা খিলান (মসজিদে উমাইয়া)

মুসলিমরা তিনটি ফাঁকযুক্ত বা গহ্বরবিশিষ্ট খিলান নির্মাণের প্রযুক্তিতেও উন্নতি সাধন করেন। গণিতভিত্তিক প্রকৌশলীয় চিন্তাভাবনার ফসল এটি। আন্দালুসের আয-যাহরা শহরের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত দেয়ালের নকশা থেকে গবেষকেরা তা প্রমাণ করেছেন। স্প্যানিশ, ফরাসি ও ইতালীয় গির্জাগুলোতেও এ ধরনের খিলান নির্মাণ করা হয়েছিল।

মাল্টিফয়েল খিলানের নির্মাণকলা

এই খিলানের অভ্যন্তরীণ বা নিচের প্রান্ত অর্ধবৃত্তের মালার আকারে গঠিত। সম্ভবত এই অর্ধবৃত্তের মালার নকশা এসেছে শঙ্খের পার্শ্বদেশের আকার থেকে। তবে তা মুসলিমদের হাতে ইসলামি স্থাপত্যের একটি বিশুদ্ধ প্রকৌশলীয় রূপ নিয়েছে। হিজরি দ্বিতীয় শতক (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক)-এ নির্মিত স্থাপত্যের যা-কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তাতে এই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর যাবতীয় জ্যামিতিক বা প্রকৌশলীয় বৈশিষ্ট্য ২২১ হিজরিতে/৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কায়রাওয়ান জামে মসজিদের গম্বুজ

নির্মাণে সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। মাল্টিফয়েল খিলান তার বিকাশ ও উন্নতির পথে জ্যামিতিক চেহারা ধরে রেখেছে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মাল্টিফয়েল খিলান আরও জটিল রূপ ধারণ করে, ফয়েলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ছোট আকৃতি ধারণ করে, এতে ফুল ও গোলাপের নকশা দেওয়া হয়। এভাবে তা এক মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম অলংকরণখচিত কাঠামোতে পরিণত হয়। এগুলোর দ্বারা সজ্জিত হয় মিহরাব ও আজানখানা।

ইসলামি স্থাপত্যকলায় এসব খিলানের পাশাপাশি আরও নানান আকারের খিলানের দেখা মেলে। যেমন : সূচ্যগ্র খিলান (acute-arch), অন্ধ খিলান (blind arch), ভোঁতা কৌণিক খিলান (obtuse angle arch) ইত্যাদি। ভোঁতা কৌণিক খিলানের ব্যবহার প্রাচ্যে যেমন, তেমনই পাশ্চাত্যেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয় স্থাপত্যে এর বহু উদাহরণ মেলে। যেমন প্রচলিত আছে যে, ভোঁতা কৌণিক খিলানের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ব্রিটিশ স্থাপত্যে, তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে এর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। খিলানটির নামও পালটে যায়, তখন এটির নাম হয় টিউডার খিলান (Tudor arch)। কিন্তু ইউরোপে ব্যবহারের পাঁচ শতাব্দীরও বেশি পূর্বে এই খিলান ইসলামি স্থাপত্যকলায় ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন মসজিদে তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য রয়েছে। যেমন : (উজির বদরুদ্দিন আল-জামালি (মৃ. ৪৮৭ হি./১০৯৪ খ্রি.) কর্তৃক নির্মিত কায়রোর আল-জুয়ুশি মসজিদ, উজির আল-মামুন আল-বাতায়িহি (মৃ. ১১২৫ খ্রি.) কর্তৃক নির্মিত কায়রোর আল-আকমার মসজিদ এবং আল-আযহার জামে মসজিদ।[৬]

বাঁধ ও পুল নির্মাণকলা

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামি স্থাপত্য প্রকৌশলের নান্দনিকতা ছিল অনেক ব্যাপক; জলবন্ধক, পুল, কৃত্রিম খাল ও নালাগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর নির্মাণকলা ছিল অত্যন্ত নান্দনিক, নকশার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও। তা নদী ও নালায় প্রবহমান পানিতে যোগ করেছিল সৌন্দর্যের নতুন মাত্রা, দর্শক তাতে অভিভূত হয়ে পড়ত।

---

৬. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি*, পৃ. ৪১।

ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষের যুগে মুসলিম স্থাপত্য এবং তার প্রকৌশলীয় ও নান্দনিক নির্মাণকলা ছিল একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ।

প্রাচীর নির্মাণকলা

ইসলামি স্থাপত্য কৌশলবিজ্ঞানের (মেকানিক্স) প্রায়োগিক দিকগুলোর ওপর নির্ভরশীল ছিল। উঁচু-উঁচু মসজিদ ও লম্বা-লম্বা মিনার নির্মাণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নদীনালার উপরে বড় বড় বাঁধ ও বিশাল পুল নির্মাণ থেকেও তা স্পষ্ট হয়। যেমন : নাহরাওয়ান (নদীর ওপর) বাঁধ, রাস্তান বাঁধ, ফুরাত নদীর ওপর বাঁধ। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির যুগে কায়রোতে নির্মিত উঁচু জলপ্রাচীর থেকেও তা প্রমাণিত হয়। এই জলপ্রাচীর নীলনদের উপর দিয়ে ফামুল খলিজ[৭] থেকে মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর নির্মিত দুর্গ পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিত।

প্রাণীদের দ্বারা একটি জলসেচক যন্ত্র ঘোরানো হতো যা দশ মিটার উঁচু পর্যন্ত পানি তুলতে পারত। এই যন্ত্রের দ্বারা প্রাচীরের উপর থেকে নালায় জলের প্রবাহ অব্যাহত রাখা হতো।

দুর্গ নির্মাণকলা

ইসলামি সভ্যতায় আরব দুর্গগুলো ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পাশ্চাত্যের স্থপতিরা এসব দুর্গের নকশা ও নির্মাণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সিগরিড হুংকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। দুর্গ নির্মাণে বৃত্তাকার নকশা ছাড়া পাশ্চাত্য সমাজের আর কিছু জানা ছিল না। মুসলিমরা প্রথমে প্রবেশ করল আন্দালুসে, তারপর গেল সিসিলিতে, তারপর ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংশ্লেষ ঘটল। এরপর থেকেই ইউরোপীয় স্থাপত্যকলার নমুনাগুলো নির্মিত হতে শুরু করল আরব স্থাপত্যকলার নমুনাগুলোর অনুসারে। আরব স্থাপত্যে দুর্গের নির্মাণকলায় প্রাধান্য ছিল বর্গাকারের নকশার, যার কোণগুলোতে থাকত পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরক্ষা টাওয়ার। দুর্গের পার্শ্বদেশেও কখনো কখনো এসব টাওয়ার নির্মিত হতো।[৮]

---

৭. কায়রোর একটি এলাকার নাম।

৮. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪৪০ ও তার পরবর্তী।
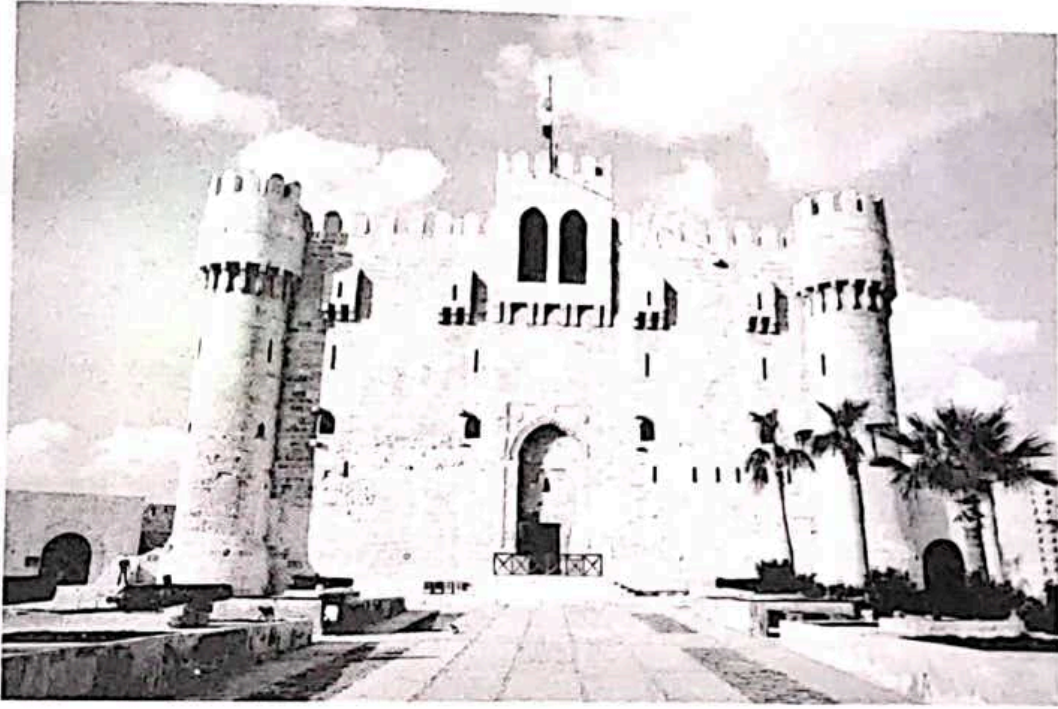
চিত্র নং-৮
কাইতবাই দুর্গ

কোনো সভ্যতার স্থাপত্যকলার সৌষ্ঠব ও নান্দনিকতা ওই সভ্যতারই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বকে প্রমাণ করে। এটি একটি ঐতিহাসিক নীতি। যেমন ইবনে খালদুন বলেছেন, রাষ্ট্র এবং নগরায়ণ একটি মৌল বস্তুর চিত্রের মতো, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সুরক্ষার জন্য এটাই যথার্থ কাঠামো। একটির থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। নগরায়ণ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। তেমনই রাষ্ট্র ছাড়া নগরায়ণও দুঃসাধ্য। তাই এদের একটিতে অসামঞ্জস্য ও সমস্যার সৃষ্টি হলে অন্যটিতে তা অনিবার্য। একইভাবে এদের একটির অনস্তিত্ব অন্যটির অনস্তিত্বকে আবশ্যক করে তোলে।[১]

---

১. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৩৭৬। দেখুন, আদিল ইওয়াজ, আল-মাদিনাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-মাদিনাতুল উরুব্বিয়্যাহ, *মাজাল্লাতুল ইলম ওয়াত-তিকনুলুজিয়া*, সংখ্যা ২৭, ১৯৯২ খ্রি. পৃ. ৩২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অলংকরণ-শিল্প

মুসলিম শিল্পীরা নতুন নতুন শিল্পবিশ্বের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ ও প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ঠাঁই পায়নি এবং প্রকৃতিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করারও প্রয়োজন পড়েনি। এখানেই তাদের প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে, তাদের উদ্ভাবনশক্তি, চিন্তার সক্রিয়তা, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মৌলিক রুচিবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এসব নতুন বিশ্বের একটি হলো অলংকরণ-বিশ্ব।

চিত্র নং-৯
আরাবেস্ক-শিল্প

সৌন্দর্য সৃষ্টিই ছিল ইসলামি আর্ট বা শিল্পের দায়িত্ব। সৌন্দর্য সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর অন্যতম হলো অলংকরণ। অলংকরণ এমন নির্ভেজাল শিল্পকর্ম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য সৃষ্টি। এখানে শিল্পকর্মের কাঠামো তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে গেছে এবং

উভয়টি মিলে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য সৃষ্টির এক সুসংগত ঐক্যের সৃষ্টি করেছে। এই ব্যাপারটি আমরা শিল্পের আর কোনো প্রকারে পাই না।[১০]

চিত্র নং-১০
ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ

ইসলামি অলংকরণ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ইসলামি অলংকরণ-শিল্প অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলির অধিকারী, মুসলিমদের জাগরণের সভ্যতাকেন্দ্রিক উপস্থিতি তুলে ধরতে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। তা ছাড়া ইসলামি অলংকরণ-শিল্প উচ্চ মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করেছে। নকশা ও নির্মাণের দিক থেকে যেমন, তেমনই বিষয়বস্তু ও শৈলীর দিক থেকেও।

মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা অনুপম গঠনযুক্ত ও দৃশ্যমানতায় উজ্জ্বল আলংকারিক রেখা ব্যবহার করেছেন এবং সামগ্রিকতার বিচারে অলংকরণের এমনসব নমুনা তৈরি করেছেন যেখানে তাদের ভাবনা স্পর্শ করেছে অন্তিমতাকে, যেখানে রয়েছে পৌনঃপুনিকতা, নতুনত্ব, অনুবর্তন ও বিজড়ন। তারা

---

১০. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৬৯।

উদ্ভাবন করেছেন তারকা-বহুভুজ (star polygon) এবং পাতা-কাটা নকশার নানা আঙ্গিক। আরবীয় লতানো ও ফুলেল অলংকরণের আরও কিছু শৈলী তারা উদ্ভাবন করেছিলেন, ইউরোপীয়রা যার নাম দিয়েছে আরাবেস্ক (Arabesque)[১১]। আরাবেস্কের প্রথম প্রকাশ ঘটে হিজরি চতুর্থ/খ্রিষ্টীয় দশম শতকে ফাতিমীয় অলংকরণ-শিল্পে আল-আযহার জামে মসজিদে। তারপর থেকে অলংকরণের এই আরবীয় শৈলী বেশ কয়েকটি দেশে অত্যন্ত সমাদর পায়। ইসলামি স্থাপত্যের অলংকরণবিদরা কাঠ, পাথর ও মার্বেলের ওপর সমতল ও নিমজ্জিত খোদাইচিত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন এবং রঙিন উপকরণের ব্যবহার ও নকশার অভিনবত্বেও পরিচয় দেন অসাধারণ দক্ষতার।[১২]

উদ্ভিজ্জ উপাদান ও জ্যামিতিক উপাদানকে এই শিল্পের বিনির্মাণে মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব উপাদানের মধ্যে কখনো সহযোগিতামূলক সংশ্লেষ ঘটেছে এবং কখনো সম্পূর্ণ আলাদারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে অলংকরণ-শিল্পের দুটি ফর্ম বা শৈলী দাঁড়িয়ে গেছে : একটি হলো ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ এবং অপরটি হলো জ্যামিতিক অলংকরণ।[১৩]

ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ

ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা ও নানা ধরনের ফুলের তৈরি মোটিফের ওপর নির্ভরশীল। ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ কয়েকটি শৈলীতেই উৎকর্ষ লাভ করেছে; যেমন : একক ও জোড়া অলংকরণ, মুখোমুখি ও আলিঙ্গনাত্মক অলংকরণ। একক অলংকরণ অধিকাংশ সময় একগুচ্ছ উদ্ভিদ্‌জাতীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়, যা আন্তঃপ্রবিষ্ট, আন্তঃবিজড়িত ও পারস্পরিক অনুরূপ, একটি শৃঙ্খলিত রূপ নিয়ে যার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে।

---

১১. ডালপালা, পাতা, ফুল, সর্পিল বস্তু ইত্যাদির কারুকার্যময় নকশা।

১২. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৪৪।

১৩. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ১৭০-১৭৩।
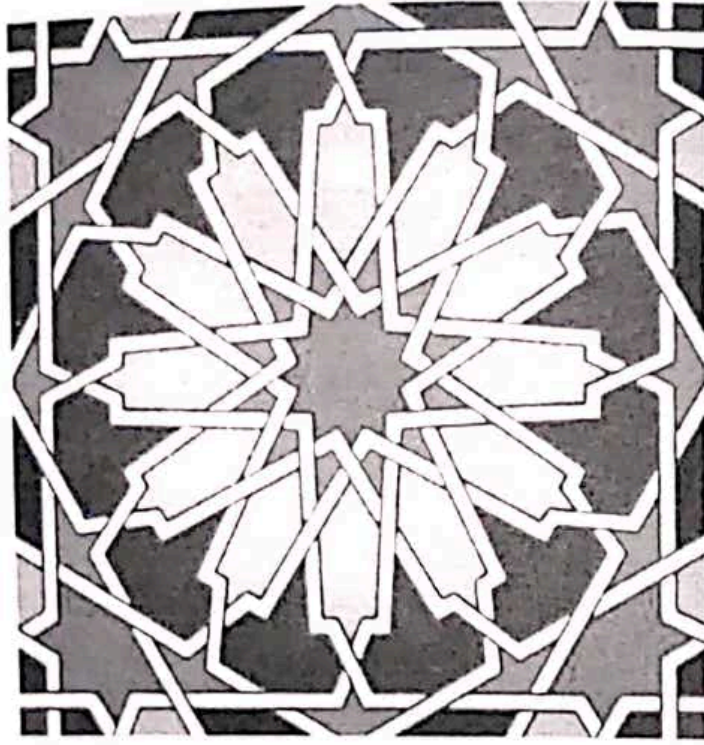
চিত্র নং-১১
জ্যামিতিক অলংকরণ

মুসলিম শিল্পীরা তাদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বলে তারা অলংকরণশিল্পে প্রকৃতির অনুকরণ থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসতেও সক্ষম হন। ফলে পাতা ও ফুলের নকশাগুলো জ্যামিতিক কারুকার্যের রূপ নেয়, যেখানে জীবিত উপাদানের মৃত্যু ঘটে। বিমূর্ত রীতির ধারণটি এখানে সক্রিয় থাকে। দেয়াল ও গম্বুজের অলংকরণে ফুলেল ও লতানো অলংকরণের ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন শিল্পকর্মে (যেমন : তামা ও কাঁচের তৈজসপত্র ও চীনামাটির বাসনকোসন) এবং বইয়ের পৃষ্ঠা ও বাঁধাইয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এই অলংকরণ।

জ্যামিতিক অলংকরণ

ইসলামি অলংকরণশিল্পের এটি আরেকটি প্রকার। জ্যামিতিক রেখার ব্যবহারে ও রুচিস্নিগ্ধ শৈল্পিক কাঠামো প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলিমরা অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বিভিন্ন ধরনের বহুভুজ, তারকা-আকৃতি, আন্তঃপ্রবিষ্ট বৃত্ত ইত্যাদি অলংকরণের বিস্তার ঘটে। এসব অলংকরণে ভবন ও অট্টালিকা সজ্জিত হয়ে ওঠে। কাঠ ও পিতলের শিল্পকর্মে এবং ছাদ ও দরজার নির্মাণেও জ্যামিতিক অলংকরণ ব্যবহার করা হয়। মুসলিমরা যে জ্যামিতিক জ্ঞানে প্রাগ্রসর ছিলেন, এটা তারই প্রমাণ।
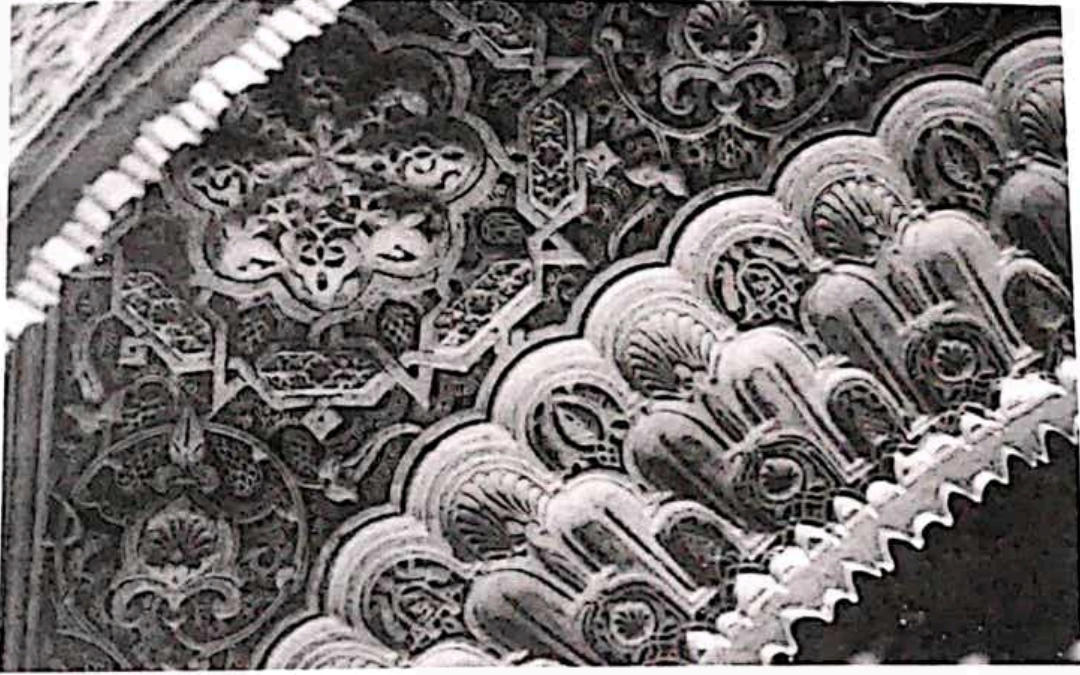
চিত্র নং-১২
নিখুঁত কারুকার্য

মুসলিমরা অলংকরণশিল্পে নানা ধরনের বৃত্তাকার জ্যামিতিক আকৃতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ষড়ভুজ, অষ্টভুজ ও দশভুজ। এগুলোর সঙ্গে আরও রয়েছে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও পঞ্চভুজ। এসব আকৃতির আন্তঃপ্রবেশন ঘটিয়ে অলংকরণের নতুন নতুন প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে। কিছু জায়গা পূরণ করা হয়েছে এবং কিছু ফাঁকা রাখা হয়েছে এভাবে ক্রমান্বয়ে অংশ থেকে পূর্ণতায়, আংশিক পূর্ণতা থেকে পরিপূর্ণ পূর্ণতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ফলে এসব মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম অলংকরণের অসংখ্য রূপ তৈরি হয়েছে।

মুসলিম শিল্পীদের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানজ্ঞান ছিল নতুন ও অভিনব কাঠামো তৈরি করা, যার মূলে থাকবে কোণ-ছেদকের জটিল জড়াজড়ি বা জ্যামিতিক কাঠামোর জোড়। এতে আরও বেশি শান্ত ও পরিমিত সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটবে।

বহুল ব্যবহৃত জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর মধ্যে রয়েছে : সংলগ্ন বৃত্ত ও আন্তঃপ্রবিষ্ট বা জোড় বৃত্ত, বিনুনি, ভাঙা-ভাঙা রেখা ও জড়াজড়ি রেখা।

যেসব আঙ্গিকের জ্যামিতিক অলংকরণ ইসলামি শিল্পকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো : বিভিন্ন সংখ্যক ভুজবিশিষ্ট তারকা-আকৃতি, গঠিত

ফর্ম বা কাঠামোকে বলা হয় তারকা প্লেট (Stellar plates)। অলংকরণের এই আঙ্গিকটিকে কাষ্ঠ ও ধাতব শিল্পকর্মে, কুরআন ও গ্রন্থাবলির সোনালি রঙে গিলটি করা পৃষ্ঠায় এবং ছাদের নকশায় ব্যবহৃত হয়।

ফরাসি শিল্প-ঐতিহাসিক ও শিল্প-সমালোচক অঁরি ফকিলোন (Henri Focillon) ইসলামিক আর্ট সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণধর্মী সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এমনকিছু ভাবতে পারি না যা প্রাণকে তার বাহ্যিক আবরণ থেকে মুক্ত করে নিতে পারে এবং আমাদেরকে তার নিহিত বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষিত করতে পারে। অথচ ইসলামি অলংকরণশিল্পে জ্যামিতিক কারুকার্য ও নকশাগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটিই ঘটেছে। এসব কারুকার্য ও নকশা সূক্ষ্ম গণিতভিত্তিক চিন্তার ফসল। এই গণিত মূলত দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার বর্ণনাত্মক অলংকরণের একটি শৈলীতে পরিণত হয়েছে। তবে আমাদের এ কথা বলতেই হবে যে, এই বস্তুনিরপেক্ষ অলংকরণশৈলীতে রেখা ও নকশার মধ্যে উচ্ছল প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে। রেখা ও নকশার কাঠামোগুলোতে আনুপাতিক হারে বেড়েছে; কখনো কখনো আলাদা-আলাদাভাবে রয়েছে এবং কখনো কখনো জড়াজড়ি করে রয়েছে। যেন এখানে এক উচ্ছল প্রাণশক্তি রয়েছে এবং সেটাই এসব কাঠামোর মধ্যে সংশ্লেষ ঘটিয়েছে, আবার দূরত্বও তৈরি করেছে; তারপর আবার নতুন করে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে। অলংকরণের প্রতিটি কাঠামোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ব্যাখ্যাটা নির্ভর করে মানুষ এটিকে কোন দৃষ্টিতে দেখছে এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে কী ভাব উদিত হচ্ছে তার ওপর। এসব কাঠামো একই সময়ে একটি রহস্যের জন্ম দিচ্ছে এবং একটি রহস্যকে উন্মোচিত করছে, যা অনিঃশেষ শক্তি ও সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে।[১৪]

ইসলামি অলংকরণশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ শৈলীগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:
আত-তারসি', আত-তাকফিত, আত-তালবিস, আত-তাশিক, আত-তাতইম, আত-তাজসিস, আল-কারনাসা, আত-তাযবিক, আত-তাসফিহ, আত-তাওশি'।

---

[১৪]. সারওয়াত উকাশা, *আল-কিয়ামুল জামালিয়্যা ফিল-ইমারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৯।

অলংকরণশিল্পে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : মার্বেল পাথর, চুন, কাঠ, ধাতব বস্তু, ইট, মোজাইক, চিত্রিত মৃৎপাত্র ও চিনামাটির পাত্র।

অলংকরণশিল্প এবং এর উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনায় ফরাসি দার্শনিক রোজার গারাউডি[১৫] (Roger Garaudy) যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আরব অলংকরণশিল্পকে আলংকারিক ধারণার একটি বৈশিষ্ট্যসূচক ও প্রতিনিধিমূলক প্রকাশ বলে বোধ হয়। তা একই সময়ে বিমূর্ততা ও মূর্ততার মধ্যে সংশ্লেষ ঘটিয়েছে। আরব অলংকরণশিল্পের গাঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে সবসময়ই সমন্বয় সাধন করেছে সংগীত-প্রকৃতির দ্যোতনা ও বৌদ্ধিক জ্যামিতির ব্যঞ্জনা।[১৬]
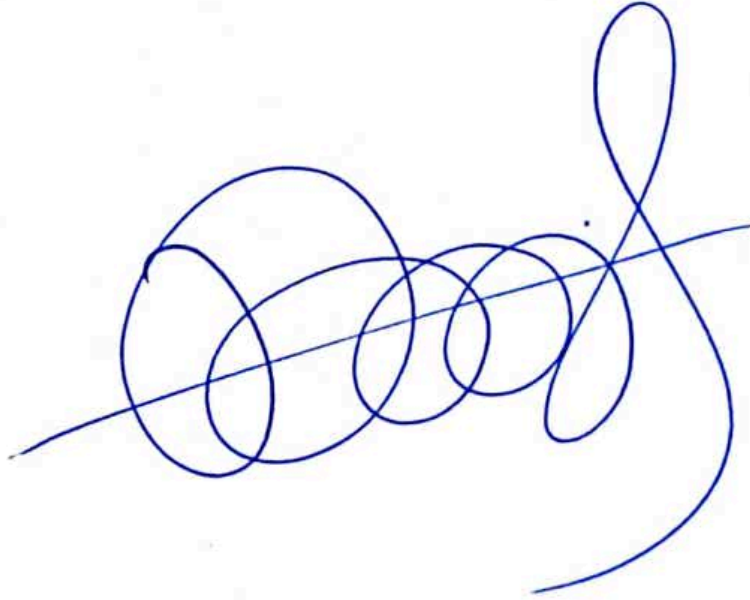
[১৫]. রোজার গারাউডি : (১৩৩১ হি./১৯১৩ খ্রি.) ফরাসি দার্শনিক। সাংস্কৃতিক, ইতিহাস, সাহিত্য ও মানব বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ উঁচুমানের গবেষক। বিভিন্ন দর্শন গবেষণার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তিনি জায়নবাদী রাজনীতির বিরোধিতা করেন।

[১৬]. রোজার গারাউডি, *ফি সাবিলি হিওয়ারিল হাদারাত*, পৃ. ১৭৪।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আরবি লিপিকলা

আরবি লিপির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য

আরবি লিপিকলা একটি বিশুদ্ধ ইসলামি শিল্প। এটি ইসলামধর্মের অন্যতম সৃষ্টি। আরবি লিপিকলার সঙ্গে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার আগে কোনো জাতির মধ্যেই বর্ণ ও বর্ণমালা কোনো দৃশ্যমান শিল্প (দৃশ্যকলা) ছিল না। যদিও প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা ছিল, ভাষা লেখার বিভিন্ন রীতি ছিল। তাদের ভাষার লেখ্য রীতি কেবল ভাষার অন্তর্গত ভাবকেই প্রকাশ করেছে, কারণ ভাষার লিখিত রূপ নিহিত ভাবেরই দৃশ্যমান প্রতীক। কিন্তু এসব প্রতীক বা চিহ্ন (বা বর্ণমালা) নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি ঘটেনি। কিন্তু আরবি বর্ণমালার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটিই ঘটেছে যথাযথভাবে, কারণ আল-কুরআন আরবি ভাষাকে মর্যাদার চাদরে মুড়িয়ে দিয়েছে।[১৭]

ড. ইসমাইল ফারুকি[১৮] বলেছেন, ওইসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কোনো জাতি-গোষ্ঠীর কেউ-ই–অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ান জাতিসমূহ, হিব্রু জাতিসমূহ, ভারতীয় জাতিসমূহ, তাদের মতো গ্রিক ও রোমান জাতি-গোষ্ঠী... আরবরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত–ভাষার দৃশ্যমান প্রতীকের সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেনি। 'লিখন' ছিল একটি স্থূল ব্যাপার, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো রয়েছে। একে ঘিরে বিশ্বের সংস্কৃতিগুলোতে কোনো নন্দনতাত্ত্বিক প্রচেষ্টা দানা বাঁধেনি। ভারতে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে,

---

১৭. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৬।

১৮. ড. ইসমাইল ফারুকি (১৩৩৯-১৪০৬ হি./১৯২১-১৯৮৬ খ্রি.) : বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি পণ্ডিত। ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত। দর্শনশাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পড়াশোনা করেছেন আমেরিকায় ও পাকিস্তানে। আমেরিকায় অবস্থিত International Institute of Islamic Thought-এর প্রধান ছিলেন।

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী পশ্চিমে 'লিখন' কেবল ভাব-প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত থেকেছে, অর্থাৎ ভাবের দৃশ্যমান প্রতীকরূপেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। হিন্দুধর্মে ও খ্রিষ্টধর্মে ফিগারেটিভ আর্ট মূর্ত শিল্পকলার ক্ষেত্রে 'লিখন' একটি পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ, তা কেবল ভাব-প্রকাশক প্রতীকরূপে শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করেছে...। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাব শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রকাশের উপাদান হিসেবে বর্ণমালা ও শব্দের সামনে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। এই ক্ষেত্রে ইসলামি প্রতিভা সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আরবি লিপিকলা আরাবিস্কের একটি প্রকরণ হিসেবে তার স্থান দখল করে নিয়েছে। ফলে আমাদের জন্য একে স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। এটি অবিমিশ্র ইসলামি শিল্পকলা। লিপিকলার চৈন্তিক বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত না করেই এ কথা বলা যায়।[১৯]

ড. মুস্তাফা আবদুর রহিম এ বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আরবি লিপিকলা একমাত্র শিল্প যার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে আরবে; এটি অবিমিশ্র আরব শিল্প, যা কোনোকিছুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়নি, যার সঙ্গে কোনোকিছুর সংশ্লেষ ঘটেনি...। কতিপয় প্রাচ্যবিদ বলেছেন, তুমি যদি ইসলামি আর্ট সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে সরাসরি আরবি লিপিকলার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।[২০]

আরবি তথ্যসূত্রগুলো, যেমন : *আল-ইকদুল ফারিদ*, *খুলাসাতুল আসার*, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, *আল-ফিহরিসত*, *সুবহুল আ'শা* ও অন্যান্য উৎসগ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, আরবি লিপিকলা মুসলিমদের কাছে যে যত্ন ও পরিচর্যা লাভ করেছে এবং শৈল্পিক উৎকর্ষে মণ্ডিত হয়েছে, অন্যকোনো সভ্য জাতির বেলায় এটা ঘটেনি।[২১]

অল্প কালের মধ্যেই মুসলিম শিল্পীরা আরবি বর্ণমালাকে তার শ্রুত কর্তব্যের পাশাপাশি একটি দৃশ্যমান কর্তব্যে ভূষিত করেন। আরবি বর্ণমালা এই নান্দনিক ময়দানে প্রবেশ করামাত্রই তার বিকাশ দ্রুত এগিয়ে যায়। অলংকরণশিল্পের নকশা ও রেখাগুলোর সঙ্গে তার মিশ্রণ ঘটে, তা

---

[১৯]. *মাজাল্লাতুল মুসলিমিল মুআসির*, সংখ্যা ২৫, ১৪০১ হি.।
[২০]. পরিশিষ্ট, *আল-আনবাউল কুয়েতিয়্যাহ*, সংখ্যা ৫১৭, তারিখ : ১৬/০৭/১৯৮৬ খ্রি.।
[২১]. নাজি যাইনুদ্দিন, *মুসাওয়ারুল খাত্তিল আরাবি*, পৃ. ৩১৫।

বরং অলংকরণশিল্পকে অনেক এগিয়ে দেয়। আরবি লিপিকলা ও অলংকরণশিল্পের মধ্যে রয়েছে দৃঢ় সহযোগিতামূলক সম্পর্ক।[২২]

এই মৌলিক শিল্পের প্রতি মুসলিমদের যে মনোযোগ ও পরিচর্যা এবং তাদের যে বহুবিধ উৎকর্ষ সাধন তার সবকিছু এখানে আমি উল্লেখ করতে পারব না। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি লিপির উল্লেখ করছি : কুফি লিপি[২৩], নাসখি লিপি, সুলুস লিপি, আন্দালুসি লিপি, রুকআ লিপি, দিওয়ানি লিপি, তা'লিক (ফার্সি) লিপি, ইজাযা লিপি ইত্যাদি।

এসব লিপির বহু শাখালিপি রয়েছে, যা আরবি লিপিকলাকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। ফলে আরবি লিপির রয়েছে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা, তা সর্বাবস্থায় ও সব জায়গায় নিজের ভূমিকা পালন করতে পারে। শাখালিপির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। কুফি লিপির শাখালিপি হলো কুফি আল-মুওয়াররাক, কুফি আল-মুযহির, কুফি আল-মুনহাসির, কুফি আল-মুআশশাক বা আল-মুযাফফার বা আল-মুওয়াশশাহ। দিওয়ানি লিপির একটি শাখালিপি হলো জালি আদ-দিওয়ানি। সুলুস লিপির শাখালিপি হলো জালি আস-সুলুস। অন্য লিপিগুলোরও শাখালিপি রয়েছে।[২৪]

মুসলিম শিল্পীদের সৃজনশীলতা

মুসলিম শিল্পীরা কখনো কখনো একাধিক লিপিকে একই পটে সাজিয়েছেন। এতে লিপির সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই শিল্প সৃজনশীলতায় নতুনত্ব ও অভিনবত্বের দিকে এগিয়ে গেছে। লিপিশিল্পে যে প্রতিযোগিতা ছিল তা একে পূর্ণতা দিয়েছে, এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, নান্দনিক উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।[২৫]

লিপিকলায় মুসলিম শিল্পীরা কেবল হরফ-বিন্যাস ও তার সৌন্দর্য-বর্ধনে ক্ষান্ত থাকেননি; বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অভিনবত্বের সৃষ্টি

---

২২. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৮।

২৩. মুসলিম বিজেতারা তাদের দ্বীন ও শরিয়তের প্রচারের জন্য এই লিপিকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত মুসহাফগুলো কুফি লিপিতেই লেখা হয়েছে। কুফার আলেমগণই কুফি লিপির উৎকর্ষ সাধন করেন। দেখুন, নাজি যাইনুদ্দিন, *মুসাওয়ারুল খাত্তিল আরাবি*, পৃ. ৩৩৯।

২৪. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

২৫. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৯।

করেছেন, সৃজনশীলতা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা স্বয়ং হরফকেই অলংকরণের উপাদান হিসেবে প্রস্তুত করেছেন। ফলে লিপির পটগুলো নান্দনিক আলংকারিক পটে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলিম শিল্পীরা পটের ওপর কী অসীম দক্ষতা ও নিয়ন্ত্রণের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আপনি অবশ্যই বিস্মিত হবেন। তারা হরফকে দিয়ে একই সময়ে দুটি কাজ করিয়ে নিয়েছেন। একটি হলো ভাব প্রকাশের কাজ, অপরটি হলো অলংকরণের কাজ। তারা দ্বিতীয় কাজকে প্রথম কাজের সাজরূপে উপস্থাপন করেছেন!

মুসলিম শিল্পীরা আরবি লিপিকলায় অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতার শিখরে পৌঁছেও ক্ষান্ত থাকেননি, তারা হরফের ডানায় চড়ে শিল্পের নতুন নতুন দিগন্তে ভ্রমণ করেছেন। হরফ এখানে কাঠামোগত শিল্পের (ফিগারেটিভ আর্টের) হাতিয়ার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। চাকচিক্যময় নান্দনিক শিল্পের কার্যকরী উপাদানে পরিণত হয়েছে। লিপির আলংকারিক পটের ওপর চোখ পড়ামাত্র প্রথম মুহূর্তে পটে আপনি একটি চিত্র দেখতে পাবেন, সেটা হতে পারে পাখির, হতে পারে কোনো প্রাণীর, ফলের বা প্রদীপের। কিন্তু আপনি একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে চিত্রটি আরবি হরফ ও শব্দ ছাড়া কিছু নয়। এগুলো শিল্পীদেরই আবিষ্কার। বাহ্যিক চিত্রের সঙ্গে এসব শব্দ ও হরফের অর্থগত সামঞ্জস্য থাকে। এটাই অভিনবত্ব।[২৬]

আরবি লিপিকলার ক্ষেত্রে মুসলিমদের ঐতিহ্য এমনই ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাদের এমন কৃতিত্ব ও সৃজনশীলতা আরবি লিপিকলাকে ইসলামি সভ্যতার জন্য যুগ যুগ ধরে ও ইসলামি বিশ্বের সব ভূখণ্ডে এক অনন্য শিল্পরূপে ভাস্বর করে তুলেছে।

---

[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রীর নান্দনিকতা

আমরা এখানে মুসলিমদের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও প্রস্তুতকৃত দ্রব্যসামগ্রীর নান্দনিক সৌন্দর্যের কথা বলতে চাচ্ছি। যন্ত্রপ্রকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অতি চমৎকার পন্থায় এগুলো তৈরি করা হয়েছে। এগুলোতে সৌন্দর্য যেন তার উজ্জীবনী শক্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মুসলিম প্রযুক্তিবিদ ও কারিগররা কেবল নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যই এসব যন্ত্র প্রস্তুত করেননি; বরং এগুলোতে অনুপম সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটেছে, যা চিত্তকে মোহিত করে, হৃদয়কে প্রশান্ত করে।

এই পরিচ্ছেদে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সৌন্দর্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিল্প-সামগ্রীর সৃজনশীলতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সৌন্দর্য

প্রযুক্তিবিদ্যায় মুসলিমদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা কেবল মসজিদ, আজানখানা ও গম্বুজ নির্মাণ এবং বাঁধ ও পুল নির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা এমনকিছু অভিনব বস্তু আবিষ্কার করেছেন যেখানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সৌন্দর্য-অনুভূতি ও নান্দনিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। তারা এ ধরনের বিজ্ঞানকে কতটা আয়ত্ত করেছিলেন তারও প্রমাণ মেলে এসব বস্তু থেকে। এসব বস্তু যেমন দৃষ্টিনন্দন তেমনই চিত্তাকর্ষক ও মনোহর।

ইসলামি সভ্যতায় মুসলিম বিজ্ঞানীরা কয়েকটি জটিল যান্ত্রিক আবিষ্কার সম্পন্ন করেছেন। এসব যন্ত্র কেবল এদের সেই ভূমিকাই পালন করবে যে, প্রতিভাবান কেবল উদ্ভাবক এতেই সন্তুষ্ট থাকেননি। বরং কীভাবে এগুলো আরও বেশি নান্দনিক ভূমিকা পালন করবে, সেদিকেও তারা মনোযোগী ছিলেন। কিছু যন্ত্রের উদাহরণ নিচে পেশ করা হলো।

ঘড়ি

ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন যে, জামে দিমাশকের[২৭] একটি ফটকের নাম ছিল বাবুস সাআত বা ঘড়ি-ফটক।[২৮] কারণ এই ফটকে কিছু ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল। ঘড়িগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন ঘড়ি-নির্মাতা প্রকৌশলী মুহাম্মাদ ইবনে আলি, যিনি ছিলেন ফখরুদ্দিন রিদওয়ান ইবনুস সাআতির পিতা।[২৯] প্রধান ঘড়ি থেকে দিবসের প্রতি ঘণ্টার অতিক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি টের পাওয়া যেত।

---

[২৭]. উমাইয়া মসজিদ, দামেশক গ্রেট মসজিদ নামেও পরিচিত।-অনুবাদক

[২৮]. অন্য বর্ণনামতে, এটি ছিল দামেশকের একটি ফটক। যা বাবে শারকি বা পূর্ব ফটক নামেও পরিচিত ছিল।-অনুবাদক

[২৯]. ইবনুস সাআতি : দিরদওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে রুস্তম, ফখরুদ্দিন আল-খুরাসানি, ইবনুস সাআতি (মৃ. ৬১৮ হি./১২২১ খ্রি.)। চিকিৎসক, দার্শনিক ও কবি। তার পিতা ছিলেন ঘড়িনির্মাণ-প্রকৌশলী। এ কারণেই তার নাম হয়েছিল আস-সাআতি (ঘড়ি-

এই ঘড়ির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন ইবনে জুবায়েরও। তিনি বলেছেন, বাবে জিরুনের (জিরুন ফটক) বাইরের দিকে ডানপাশে সম্মুখবর্তী যে প্রাসাদ রয়েছে তার প্রাচীরে একটি কক্ষ বিদ্যমান। কক্ষটিতে একটি বড় গোলাকার খিলানের মতো কাঠামো রয়েছে, দিবসের ঘণ্টার সংখ্যানুপাতে এতে রয়েছে পিতলের তৈরি কয়েকটি বৃত্তাকার ছোট খিলান, প্রকৌশলীয় পরিমাপে প্রস্তুত করা হয়েছে এগুলো। দিবসের একটি ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেই পিতলের কাঠামোতে নির্মিত দুটি বাজপাখির মুখ থেকে পিতলের দুটি করতাল পতিত হয়। বাজপাখি দুটি দাঁড়িয়ে আছে পিতল-নির্মিত দুটি ছড়ানো পাত্রের (থালার) ওপর। একটি বাজপাখি আছে এই দরজাগুলোর[৩০] প্রথমটির নিচে, এবং দ্বিতীয় বাজপাখিটি আছে শেষ দরজাটির নিচে। থালা দুটি ছিদ্রযুক্ত; এগুলোতে গোল বল দুটি আঘাত করলে দেয়ালের অভ্যন্তরের কক্ষে ঢুকে যায় এবং দেখা যায় যে, বাজপাখি দুটি থালার দিকে বলসহ তাদের গলা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং খুব দ্রুত বল দুটি নিক্ষেপ করছে। আশ্চর্যজনক কৌশল! দেখলে মনে হয় জাদু ছাড়া কিছু নয়। বল দুটি যখন থালা দুটির ওপর পড়ে, ঝনঝন আওয়াজ শোনা যায়। তখনই দিবসের অতিক্রান্ত ঘণ্টাটির জন্য নির্ধারিত দরজাটি একটি পিতলের পাতের দ্বারা ঢেকে যায়। দিবসের প্রতি ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার সময় ঘড়িটি এভাবেই সচল থাকে। দিবসের ঘণ্টাগুলো শেষ হয়ে যায়, সেগুলোর নির্ধারিত দরজাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন আবার প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে।[৩১]

রাতেরবেলার জন্য ঘড়িটির অন্য কৌশল রয়েছে। তা এই যে, উপরিউক্ত ছোট খিলানগুলোর উপরে স্থাপিত বাঁকযুক্ত ধনুকটিতে পিতলের বারোটি বৃত্ত রয়েছে, বৃত্তগুলো ছিদ্রযুক্ত। কক্ষে প্রাচীরের ভেতর থেকে বৃত্তগুলোর উপরে রয়েছে কাচের আড়াল। কাচের পেছনে রয়েছে একটি বাতি, পানির সাহায্যে ঘণ্টার সময়ের অনুপাতে বাতিটি ঘোরে। রাতের একটি ঘণ্টা কেটে গেলে কাচের ওপর বাতির আলো পরিপূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং কাচের সামনে যে বৃত্ত রয়েছে তাতে কাচের রশ্মি ছড়িয়ে যায়, তখন

নির্মাতা)। তিনি দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৪৭১।

৩০. কক্ষের খিলানের মতো কাঠামোতে যেসব বৃত্তাকার ছোট খিলানকে দরজার রূপ দেওয়া হয়েছে।

৩১. ইবনে জুবায়ের, *রিহলাতু ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২৪০-২৪১।

দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে একটি লালাভ বৃত্ত। তারপর ওই বাতি অন্য বৃত্তের কাছে চলে যায়, রাতের ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে থাকে এবং একটির পর একটি লালাভ আকৃতি নিয়ে দৃশ্যমান হতে থাকে। ঘড়িটির তত্ত্বাবধান ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কক্ষে একজন লোক নিযুক্ত করা হয়েছে, সে ঘড়ির কার্যক্রম ও পরিবর্তন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। দরজাগুলো পুনরায় খুলে দেওয়া ও করতাল যথাস্থানে রাখা তার কাজ। মানুষ এটির নাম দিয়েছে 'আল-মিনজানা' (অর্থাৎ ঘড়ি)।[৩২]

এ তো গেল ঘড়ির কথা। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ হিজরি দ্বিতীয় শতকে (খ্রিষ্টীয় নবম শতক, ৮০৭ সালের দিকে) তার বন্ধু ফরাসি সম্রাট শার্লেমাইনের[৩৩] কাছে একটি আশ্চর্যজনক উপঢৌকন পাঠান। উপঢৌকনটি ছিল একটি বিরাটাকার ঘড়ি, ঘড়িটি কামরার দেয়ালের সমান উঁচু এবং অভ্যন্তরীণ জলীয় (ব্যবস্থায় উৎপাদিত) শক্তিতে সঞ্চালিত হয়। প্রতি ঘণ্টা শেষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাতব বল ঘণ্টার সংখ্যানুপাতে একের পর এক পতিত হয়। বলগুলো পতিত হয় একটি পিতলের পাত্রের ওপর, ফলে একটি সংগীতময় অনুরণন শোনা যায়, পুরো প্রাসাদজুড়ে অনুভূত হয় তার গুঞ্জরণ। ঠিক একই সময়ে ঘড়িটির অভ্যন্তরীণ বারোটি দরজার একটি দরজা খুলে যায় এবং সেই দরজা দিয়ে একজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে ঘড়িটির চারপাশে ঘোরে। তারপর যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেখানেই ফিরে যায়। ঘড়িতে বারোটা বাজার সময় বারোটি দরজা দিয়ে একসঙ্গে বারোজন অশ্বারোহী বেরিয়ে আসে এবং ঘড়িটির

---

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. শার্লেমাইন বা শার্ল দা গ্রেট (Charlemagne) : ৭৬৮ সাল থেকে ফরাসিদের রাজা এবং ৮০০ সাল থেকে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রোমান সম্রাট ছিলেন। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের তিন শতাব্দী পর, শার্লেমাইন ছিলেন পশ্চিম ইউরোপের প্রথম সম্রাট। তিনি ফরাসি সাম্রাজ্যকে অনেক বর্ধিত করে তার মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজত্বকালে তিনি ইতালীয় সাম্রাজ্য দখল করেন এবং পোপ তৃতীয় লিয়োঁ ৮০০ খ্রি. ২৫ ডিসেম্বর রোম নগরে তাকে ইমপেরাতোর আউগুস্তুস হিসেবে অভিষিক্ত করেন। ৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে পেপিন দা শর্ট-এর মৃত্যুর পর শার্লেমাইন তার ভাই প্রথম কার্লোমানের সাথে ফরাসিদের রাজা হন। ৭৭১ সালে প্রথম কার্লোমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি ফরাসি রাজ্যের (বর্তমান কালের বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং পশ্চিম জার্মানি) নিরঙ্কুশ আধিপত্য গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তিনি রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন, যা ছিল পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। তার জন্ম ৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি।-অনুবাদক

চারপাশে পূর্ণ এক চক্কর দিয়ে ফিরে যায়। দরজাগুলো দিয়ে ভেতরে প্রবেশের পর দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এই ঘড়ি সম্পর্কে আরব ও অনারব উৎস-গ্রন্থসমূহে এমনই বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণিত হয়েছে। ঘড়িটি তৎকালে শিল্পের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বস্তু বলে বিবেচিত হয়েছিল। এমনকি তা ফরাসি সম্রাট ও তার সহচরদেরও বিস্ময়াভিভূত করে তুলেছিল। কিন্তু প্রাসাদের পুরোহিতদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাল যে, ঘড়ির ভেতরে নিশ্চয় একটি শয়তান রয়েছে, ওই শয়তানই ঘড়িটিকে নাড়ায়। ফলে তারা রাতের অপেক্ষায় থাকল। রাতেরবেলা কুড়াল নিয়ে উপস্থিত হলো। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ঘড়িটি পুরো ধ্বংস করে ফেলল। তবে তারা ভেতরে কিছুই পেল না।

ইতিহাসের উৎসগুলো বরাবরই এসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে এবং বলেছে, আরবরা এই ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নতিসাধনে যুগধর্মকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার আরও উদাহরণ আছে। খলিফা আল-মামুনের যুগে ফরাসি সম্রাটকে অধিকতর উন্নত একটি ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়েছিল। ঘড়িটি চলত শিকলের সঙ্গে যুক্ত পাথরের বলের সাহায্যে উৎপাদিত যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা। এই শক্তি ছিল জলীয় শক্তির বিকল্প।[৩৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, চিন্তা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইসলামি প্রতিভা সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছিল। এসব উদ্ভাবনে জ্ঞানগত দিক ও নান্দনিক দিকের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

যন্ত্রমানব!

বিশ্ব তো এখন সেই যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে যে যুগকে বলা হচ্ছে যন্ত্রমানবের যুগ। গত কয়েক দশকে যন্ত্রমানবের প্রযুক্তি দ্রুত ও অভাবিত উন্নতি লাভ করার ফলে এ কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের ইসলামি জ্ঞান-উৎসগুলো ইঙ্গিত করে যে, যন্ত্রমানবের প্রযুক্তির সূচনা ঘটেছিল ইসলামি সভ্যতার যুগে।

---

[৩৪]. লুইস সিডিও তার Histoire des Arabes 1854, আরবি অনুবাদ : *তারিখুল আরাবিল আম* গ্রন্থে বিষয়টির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেখুন, মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২২৬।

যন্ত্রপ্রকৌশলী, বিজ্ঞানী বদিউযযামান আবুল ইয্য ইসমাইল ইবনে রাযায জাযারির হাতে যন্ত্রমানবের প্রযুক্তি সূচিত হয়েছিল। তিনি হিজরি ষষ্ঠ শতকে তার জীবৎকাল কাটিয়েছেন। তিনিই প্রথম যন্ত্রমানব উদ্ভাবন করেছিলেন, যা ঘরের মধ্যে সেবাদানে সক্রিয় ছিল। খলিফা তার কাছে এমন একটি যন্ত্র প্রস্তুত করে দেওয়ার আবেদন জানান, যার ফলে খলিফা যখনই নামাযের জন্য অজু করতে চাইবেন খাদেমদের প্রয়োজন পড়বে না, যন্ত্রই সেই প্রয়োজন পূরণ করবে। আল-জাযারি তার জন্য খাদেমের আকৃতিতে খাড়া একটি যন্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। যন্ত্রটির এক হাতে ছিল একটি পানির পাত্র, অপর হাতে ছিল একটি তোয়ালে। তার পাগড়ির ওপর দাঁড়ানো ছিল একটি চড়ুই। নামাযের সময় হলে পাখিটি কিচিরমিচির ডেকে উঠত। তারপর খাদেমটি তার মনিবের দিকে এগিয়ে আসত। পানির পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ঢেলে দিত। মনিব অজু শেষ করলে সে তোয়ালে এগিয়ে দিত। তারপর সে তার জায়গায় ফিরে যেত এবং চড়ুইটি গান গেয়ে উঠত![৩৫]

আল-কুরআনের ইলেক্ট্রনিক বাহক!

এই আধুনিক কালে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের লরেন্তিয়ান গ্রন্থাগারে (Laurentian Library)[৩৬] উপকারী কলাকৌশল (প্রকৌশল)-বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। পাণ্ডুলিপিটির শিরোনাম '*আল-আসরার ফি নাতায়িজিল আফকার*'। স্প্যানিশ-আরবীয় যুগে রচিত হয়েছে এই পাণ্ডুলিপি। এতে ওয়াটারমিল (Watermill) ও ওয়াটার কম্প্রেসর (Water compressor)-সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ

---

৩৫. জাযারি : তার *আল জামে বাইনাল ইলমি ওয়াল আমাল আল নাফি ফি সিনায়াতিল হিয়াল* গ্রন্থ থেকে। ১৯৭৪ সালে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন এই নামে : *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices*. আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস-রচয়িতা গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত এটিই সবচেয়ে ব্যাখ্যামূলক ও বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থ। মুসলিমদের এই ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটিকে শিখর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দেখুন, ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩১।

৩৬. লরেন্তিয়ান গ্রন্থাগার (Biblioteca Medicea Laurenziana or BML) ইতালির ফ্লোরেন্সে অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে ১১ হাজারেরও বেশি পাণ্ডুলিপি ও ৪ হাজার প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। গ্রন্থাগারটি মেডিসি পোপ ক্লিমেন্ট সপ্তমের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্যশৈলীর জন্য গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত বিখ্যাত। মহান শিল্পী মাইকেলেঞ্জেলো গ্রন্থাগারটির নকশা করেছিলেন।-অনুবাদক

যন্ত্রাংশের (পার্টস) বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রের বা মেকানিক্যাল মেশিনের ত্রিশটিরও বেশি প্রকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। রয়েছে অত্যন্ত উন্নত সূর্যঘড়ি নির্মাণের কলাকৌশল। ইউনিভার্সিটি অব বার্সেলোনার আরবীয় বিজ্ঞান-ইতিহাসের অধ্যাপক জুয়ান ভার্নেট গিনেস (Juan Vernet Ginés) বলেন, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, '*আল-আসরার ফি নাতায়িজিল আফকার*' গ্রন্থটি স্প্যানিশ-আরবীয় লেখক আহমাদ (অথবা মুহাম্মাদ) ইবনে খাল্ফ আল-মুরাদির রচনা। তিনি হিজরি পঞ্চম শতকে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে) তার জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যান্ত্রিক খেলনা প্রস্তুতকরণের কৌশল শিক্ষাদান। এসব খেলনার অধিকাংশই ছিল ব্যবহার-উপযোগী, যেমন সূর্যঘড়ি। ভার্নেট আরও জোরালোভাবে মন্তব্য করেন যে, এই গ্রন্থ এবং Schmelzer কর্তৃক ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় অনূদিত অপর একটি গ্রন্থের মধ্যে নিকট-সম্পর্ক রয়েছে। ভার্নেট নিশ্চিতভাবে এটাও জানিয়েছেন যে, ফরাসি নকশাবিদ ও স্থপতি Villard de Honnecourt–আরবীয় বিশ্বের প্রযুক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন, যিনি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তার জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। আরবীয় প্রযুক্তি-বিজ্ঞান একটি স্থায়ী আন্দোলন জিইয়ে রেখেছে।[৩৭]

আল-মুরাদির গ্রন্থে উন্নত প্রযুক্তির যেসব নমুনার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার মধ্যে 'হামিলুল মুসহাফ' বা আল-কুরআনের বাহক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশি। এটি কর্ডোভার জামে মসজিদে রয়েছে। কুরআনুল কারিমের একটি দুর্লভ কপি এতে বিদ্যমান। হাত দিয়ে ধরা ছাড়াই কপিটি হাতের নাগালে পাওয়া যায় এবং পাঠ করা যায়। কারণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খুলে যায় কুরআন শরিফের হোল্ডার বা ধারকটি। কুরআন শরিফটি রয়েছে একটি বন্ধ সিন্দুকের মধ্যে একটি সচল তাকের ওপর, সিন্দুকটি রয়েছে মসজিদের উঁচু অংশে। সিন্দুকের চাবি ঘোরানো হলে তার দুটি দরজা সঙ্গে সঙ্গে ভেতর দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায় এবং তাকটি নিজ থেকেই কুরআনের কপিটি বহন করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উঠে যায়। একই সময়ে কুরআনের ধারকটি খুলে যায় এবং

---

[৩৭]. দেখুন, ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি*, পৃ. ৩৫-৩৬।

সিন্দুকের দরজা দুটি বন্ধ হয়ে যায়। সিন্দুকের তালায় নতুনভাবে চাবি ঢোকালে এবং বিপরীত দিকে ঘোরালে আগের ক্রিয়াগুলোই একের পর এক বিপরীতভাবে ঘটে। এসব ব্যাপার ঘটে এমন কলাকৌশল ও যন্ত্রের সাহায্যে যেগুলো চোখের আড়ালেই থেকে যায়।[৩৮]

মুসলিমরা এসব উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে উপহার দিয়েছে এমন এমন যন্ত্র ও বস্তু যা তাদের সভ্যতার সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা এবং তাদের রুচির সূক্ষ্মতা ও উৎকৃষ্টতাই প্রমাণ করে।

---

৩৮. জোয়ান ভার্নেট, *আল-ইনজাযাতুল মিকানিকিয়্যা ফিল-গারবিল ইসলামি*, মাজাল্লাতুল উলুমিল *আমরিকিয়্যাহ*, আরবি অনুবাদ, কুয়েত, অক্টোবর-নভেম্বর, ভলিউম ১০, ১৯৯৪ খ্রি.। প্রাগুক্ত উৎস থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৫।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শিল্প-সামগ্রীর সৃজনশীলতা

নান্দনিকতার ক্ষেত্রে শিল্পসামগ্রীর মূল্য তেমন কোনো প্রভাব রাখে না। কারণ এখানে সামগ্রীটির যে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা রয়েছে তারই আলোচনা হয়, তার মূল্যের নয়। অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীর মধ্যেও সৌন্দর্যের এমন নমুনা পাওয়া যায় যা জনজীবনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিষয়কে ফুটিয়ে তোলে, তাদের শৈল্পিক নির্মাতাদের জ্ঞানজগৎকে মূল্যায়ন এবং তাদের উদ্ভাবক ও সংগ্রাহকদের প্রয়োজন অনুধাবনে সাহায্য করে।

গুস্তাভ লি বোঁ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আরবদের মধ্যে সব জায়গাতেই শিল্পকলার বিস্তৃতি ঘটেছিল। আরবরা যেসব বস্তু প্রস্তুত করেছে, চমৎকারিত্ব ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের আদলে সেগুলোকে গড়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের সামান্যতম নির্মাণও শৈল্পিক রুচির পরিচয় বহন করে।[৩৯]

ইসলামি শিল্পকলায় শোভা ও অলংকারের অশেষ আঙ্গিক ও রীতি সব স্থানেই পাওয়া যায়, তা কেবল কুরআনুল কারিমের পৃষ্ঠাগুলোতে অলংকৃত লিপির অনন্য উদাহরণগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। গল্প-সংকলন বা কবিতা-সংকলনের যেসব কপি খলিফাদের বা আমিরদের উপহার দেওয়া হতো অনুরূপ আঙ্গিকে অলংকারে শোভিত থাকত। উৎকর্ষপূর্ণ ও শিখরস্পর্শী অলংকরণশিল্পের অস্তিত্ব কেবল মসজিদে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা পান্থশালা, মাদরাসা ও আবাসগৃহেও তার উজ্জ্বলতা ছড়িয়েছে।

একইভাবে সংখ্যাহীন শৈল্পিক আঙ্গিক কেবল মসজিদে কুরআন শরিফের কপি রাখার তেপায়াকে আচ্ছাদিতকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং একজন মুসলিম যেসব পাত্র থেকে খাদ্য গ্রহণ করত তাতেও পাওয়া যেত। পাওয়া যেত সৈনিকের বর্মে, তার তরবারিতে এবং মাথা ঢাকার রুমালেও।

৩৯. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৫০৭।

অলংকরণগুলো হতো একই পদ্ধতি মেনে। এ কারণে এটাই সবচেয়ে সংগত যে আমরা ইসলামি শিল্পকে একটি অনন্য ও অসাধারণ প্রকরণ হিসেবে বিবেচনা করব। সকল শোভামণ্ডিত বস্তু ও নান্দনিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবহারের জন্য এগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েও এ কথা বলা যায়।[৪০]

ইসলামি শিল্পসামগ্রীতে, সেগুলোর গুরুত্ব যত কমই হোক না কেন, নান্দনিকতার বিস্তার একটি বিষয়, ইসলামি সভ্যতার মর্যাদা প্রকাশে এর আলাদা প্রদর্শনীর প্রয়োজন নেই।

নান্দনিকতার সূচনা ঘটেছে ইসলামের শুরুর যুগেই। বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু দুজানাকে যে তরবারিটি দিয়েছিলেন তার একপাশে খচিত ছিল নিম্নরূপ পঙ্ক্তি :

> في الجبن عارٌ وفي الإقبـال مكـرمة ☆ والمرء بالجبن لا ينجو من القـدر
>
> ভীরুতায় রয়েছে কলঙ্ক, এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে সম্মান। মানুষ ভীরুতা অবলম্বন করে তার ভাগ্যলিপি থেকে মুক্তি পায় না।[৪১]

কবিতা হলো সেই জাদু যার জন্য আরবেরা সবসময় ছিল উল্লসিত ও পাগলপারা।

এরপর থেকেই ইসলামি শিল্পসামগ্রীর উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে এবং অবশেষে নান্দনিকতার এক আশ্চর্যজনক পর্যায়ে পৌছায়। একইসঙ্গে ইসলামি রাজ্যগুলোতে তার সাংস্কৃতিক বিস্তৃতিও ঘটে।

গুস্তাভ লি বোঁ তো ইসলামি শিল্পকলাকে পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়েছেন; তিনি শিল্পকৌশল, অলংকরণ ও নকশাখচিত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো কোনো বিষয় তাদের এতটাই আয়ত্তে এসেছিল এবং তারা এতটা দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে আমাদের এ যুগেও সেই পর্যায়ে পৌছা অসম্ভব মনে হয়।[৪২]

---

৪০. ড. ইসমাইল রাযি ফারুকি ও ড. লুইস লামিয়া ফারুকি, *আতলাসুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫৩৯।

৪১. ফারুকি, *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৪৯৭।

৪২. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৫১১।

যাবতীয় ইসলামি শিল্পসামগ্রীই মহৎ শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে : তরবারি, বর্ম, বর্শা, কিরিচ, খঞ্জর, শিরস্ত্রাণ, চিঠি আদান-প্রদানের নল বা বেলন; গৃহের তৈজসপত্র ও সাজসরঞ্জাম, যেমন : চেয়ার, টেবিল, অলংকারের বাক্স, বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষণের সিন্দুক, খাবারের পাত্র ও থালা, জগ, পানপাত্র ও কাপ, চীনামাটির বাসনকোসন, দোয়াত এবং দরজা ও জানালা, কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা-বালিশ, ঘোড়ার জিন, মসজিদের বাতি, মিম্বার, মোমদানি, দাঁড়িপাল্লা, চাবি, তালা, দরজার চৌকাঠ, কুঠার, লেখার যন্ত্রপাতি, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, এমনকি হুক্কাও। এগুলো তো বটেই, এ ছাড়াও এমনকিছু শিল্পসামগ্রী রয়েছে যেগুলোর মধ্যে খচিত নকশা ও অলংকরণই মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যেমন : কানের দুল, গলার হার, হাতের আংটি, পাগড়ির প্রান্ত, নূপুর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও রয়েছে অলংকরণের আরও বিভিন্ন উপকরণ।

উইল ডুরান্ট সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আরবরা তাদের পূর্ববর্তীদের যেসব শিল্পের আয়ত্তীকরণ করেছে, তা তারা যথার্থভাবে আয়ত্তীকরণ করেছে, অনুকৃতি বা নকল করা নয়। আয়ত্তীকরণের মধ্য দিয়ে তারা নতুন নতুন ও মৌলিক বহু কিছু উদ্ভাবন করেছে। তিনি বলছেন, বরং তাদের শিল্পকলায় বিভিন্ন কাঠামো ও আকৃতির মধ্যে সৃজনশীল ও উজ্জ্বল সমন্বয় ঘটেছে। মুসলিমরা অন্যান্য জাতি থেকে যা-কিছু গ্রহণ করেছে তাতে এর মর্যাদা হ্রাস পায় না। যে ইসলামি শিল্পকলা ছড়িয়ে পড়েছে আন্দালুসের আল-হামরা প্রাসাদ থেকে ভারতের তাজমহল পর্যন্ত তা অতিক্রম করেছে স্থানের ও কালের সকল সীমা। উপাদান ও জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে তা মূলত কৌতুক করেছে এবং এক অনন্য শৈলীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সেই শৈলীর বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে। ইসলামি শিল্পকলা মানবাত্মাকে প্রকাশ করেছে অফুরন্ত সৌষ্ঠব ও রুচিবোধের মধ্য দিয়ে, যাকে ওই সময় পর্যন্ত কোনোকিছু ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।[৪৩]

'*আতলাসুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*'[৪৪] গ্রন্থের প্রণেতাদ্বয় (ড. ইসমাইল রাযি ফারুকি ও ড. লুইস লামিয়া ফারুকি) মনে করেন, ইসলামি

---

৪৩. উইল ডুরান্ট, *The Story of Civilization*, আরবি অনুবাদ : *কিসসাতুল হাদারাহ* থেকে উদ্ধৃত, খ. ১৩, পৃ. ২৪০।

৪৪. গ্রন্থটির মূল নাম *The Cultural Atlas of Islam*। আরবি অনুবাদ : ড. আবদুল ওয়াহিদ লু'লু।-অনুবাদক

অলংকরণ তার অশেষ প্রকরণ ও রীতির মধ্য দিয়ে একটি বিষয় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যত্নশীল থেকেছে, তা হলো একত্ববাদ বা তাওহিদ। সবকিছুতে ইসলামি অলংকরণের বিস্তৃতি ইসলামি চিন্তাকেই প্রতিফলিত করেছে। একজন মুসলিমের প্রতিটি উদ্যোগ ও কর্ম হবে আবশ্যিকভাবে ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটাই ইসলামি চিন্তার দাবি।

এ কারণেই উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন মুসলিম শিল্পী লেখালেখির সরঞ্জামাদি রাখার কাঠের একটি সাধারণ বাক্স অলংকরণ করেন, তা তিনি অলংকৃত করেন হাতির দাঁত, ঝিনুক ও রঞ্জিত কাঠের টুকরো দিয়ে; ফলে কাঠের মূল কাঠামোটি কেবল যে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে তা নয়, অপরিচিতও হয়ে ওঠে। ফলে বোঝাই যায় না এটি কি ওক কাঠ, না সেগুন, না মেহগনি।

বড় বড় প্রাসাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যেখানে নির্মাণের মূল উপাদানগুলো অলংকরণ-স্তরের নিচে পুরোপুরিই ঢাকা পড়ে গেছে। যে চিন্তা মৌলিক উপাদানরাশির বস্তুগত মূল্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না তা-ই এখানে সৌন্দর্যকে বস্তুগত মূল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে; এটাই সাধারণ ইসলামি চিন্তার নির্যাস, যে চিন্তা বস্তুগত মূল্যের ক্ষেত্রে বিমুখ। এই চিন্তার ফলে সৌন্দর্য তার ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সাধারণ ও বস্তুগত দিক থেকে নগণ্যমূল্য জিনিসের মধ্যেও। এ সবকিছু প্রথমত নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যকে তার মূল্য দিয়েছে এবং সবচেয়ে বড় মূল্য দিয়েছে মানবের অস্তিত্বকে।[৪৫]

এই যে দৃষ্টিভঙ্গি—যা ইসলামের শিল্পদর্শনকে মূর্ত করে তোলে তা নিজেই একটি বড় অবদান, দীর্ঘ সময় নিয়ে তার সামনে দাঁড়ানো উচিত। ইসলামি ভাবপ্রবণতাকে কাঠামোবদ্ধ রূপদান এবং প্রকৃতি ও স্রষ্টা, জীবন ও বিশ্বের জন্য মানবিক বোধ নির্মাণে তা কী গভীর অবদান রেখেছে তা পুঙ্খানুরূপে যাচাই করা উচিত।

নিচের চিত্রগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামি শিল্পসামগ্রীতে—তার মূল্য যত কমই হোক না কেন—সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা ছিল একটি মৌলিক উপাদান এবং তার উপস্থিতি সব ধরনের সামগ্রীতেই ছিল।

---

৪৫. ড. ইসমাইল রাযি ফারুকি ও ড. লুইস লামিয়া ফারুকি, আতলাসুল হাদারাতিল ইসলামিয়া, পৃ. ৫৪০ ও তার পরবর্তী।

চিত্র নং-১৩
কুঠার
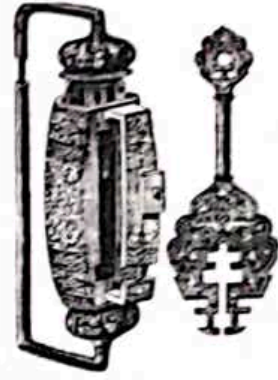
চিত্র নং-১৪
তালা ও চাবি

চিত্র নং-১৫
অশ্বপৃষ্ঠের জিন

চিত্র নং-১৬
জগ

চিত্র নং-১৭
পট

চিত্র নং-১৮
অলংকার

চিত্র নং-১৯
থালা

চিত্র নং-২০
পানপাত্র

চিত্র নং-২১
মোমবাতি
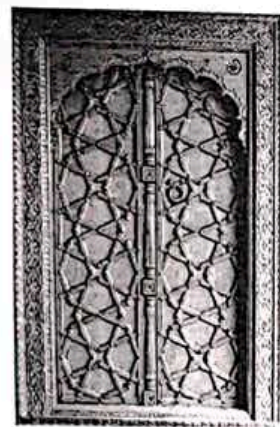
চিত্র নং-২২
দরজা

চিত্র নং-২৩
তরবারির খাপ

চিত্র নং-২৪
খিলান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবেশের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা

আল-কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস যে অপরিসীম সৌন্দর্যের ভান্ডার বিলি করছে তা থেকেই মুসলিমরা প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছেন সবসময়। পৃথিবীর বুকে জান্নাত রচনা করতে তারা প্রেরণা পেয়েছেন এখান থেকেই।

আল-কুরআনের আয়াত যে জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছে ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস যে জান্নাতের চিত্র তুলে ধরেছে তা অবশ্যই শ্রোতার মধ্যে নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যের অনুভূতি তৈরি করে। ইসলাম যখন প্রায়োগিক ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা তাহলে তো এটা আশাই করা যায় যে, শ্রোতা শ্রবণানন্দকে নির্মাণানন্দে রূপান্তরিত করবে।

ইসলাম পরিবেশের সৌন্দর্য রক্ষার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে তা এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকেই বোঝা যায়। একে মানবসভ্যতার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবেও আখ্যায়িত করেছে। অথচ পরিবেশ, পরিবেশ-সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে সাম্প্রতিক কালে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিচ্ছেদে আমরা ইসলামি সভ্যতা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যে সৌন্দর্য নির্মাণ করেছে, যার ফলে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম... যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। আমরা এই পরিচ্ছেদে নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সৌন্দর্য-বিষয়ক আলোচনা

গাছ, লতাপাতা, উদ্ভিদ, ফল ও ফসল সৃষ্টির পেছনে যে প্রজ্ঞা নিহিত তা কেবল আমাদের পরিচিত প্রাণিজগতের জন্য অপরিহার্য উপকারিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ, তা কেবল মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য নয় অথবা কেবল প্রকৃতির শ্বাস নেওয়ার ফুসফুস নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কিতাবে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বৃক্ষরাজি ও উদ্যানসমূহ মানবজীবনে আরও একটি ভূমিকা পালন করে, মানবহৃদয়ে আনন্দ ও সজীবতা এবং উদ্যম ও প্রাণোচ্ছলতা জাগরূক রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾

> বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর এর দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষরাজি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো ইলাহ আছে কি? তবু তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়।[৪৬]

যে নান্দনিক বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিকে তার ভিন্ন ভিন্ন অজস্র উপাদান সত্ত্বেও অনন্য ও অসাধারণ করে তুলেছে তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি সাধারণ রীতিরই বাস্তবিক রূপ। পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তিনি তার বান্দাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন যে তারা এই

---

৪৬. সুরা নামল : আয়াত ৬০।

নীতিকে তাদের চরিত্রে ধারণ করবে। তা হলো সৌন্দর্যের নীতি (সৌন্দর্যতত্ত্ব)! আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।[৪৭]

কুরআনুল কারিমে যে বৃক্ষরাজি, ফল ও ফসল এবং বাগান ও উদ্যান সম্পর্কে অনেক আলোচনা রয়েছে তা সম্ভবত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন : আল-কুরআনে শাজার (গাছ) শব্দটি তার থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দসহ ছাব্বিশবার এসেছে; সামার (ফল) শব্দটি তার থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দসহ এসেছে বাইশবার; নাবাত (তৃণ ও উদ্ভিদ) শব্দটি তার থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দসহ এসেছে ছাব্বিশবার; হাদিকাহ (বাগান) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তিনবার; জান্নাত (উদ্যান) শব্দটি একবচন ও বহুবচনসহ বর্ণিত হয়েছে একশ আটত্রিশবার।

বরং কুরআনুল কারিমে মানুষ ও প্রাণিকুলের খাদ্য হিসেবে গাছ ও ফলের প্রসঙ্গ যতবার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যগত সৌন্দর্যের দিকটিও এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾

মানুষ তার খাদ্যের দিকে লক্ষ করুক! আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, তারপর আমি ভূমি উৎকৃষ্টরূপে বিদারিত করি; এবং তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; আঙুর, শাকসবজি, যাইতুন, খেজুর, বহুবৃক্ষশোভিত উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য, তা তোমাদের ও তোমাদের প্রাণীদের ভোগের জন্য।[৪৮]

---

[৪৭]. *মুসলিম*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : তাহরিমুল কিব্‌র ওয়া বায়ানুহু, হাদিস নং ৯১; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৩৭৮৯; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬৬।

[৪৮]. সুরা আবাসা : আয়াত ২৪-৩২।

বৃক্ষরাজিশোভিত ও ফলরাশিপূর্ণ উদ্যান সৃষ্টির পেছনে যে নন্দনতাত্ত্বিক প্রজ্ঞা, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এমন চমৎকার পদ্ধতিতে। এর পাশাপাশি কুরআন মাজিদ ও পবিত্র সুন্নাহ জান্নাত বা উদ্যানের যে চিত্রাঙ্কন করেছে সেখানেও রয়েছে মানসিক সুখ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নানা উপকরণ। পরিবেশের সঙ্গে জীবনযাপনে এই অনন্য চিত্রায়ণের অনুকরণ করতে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধকরণে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে এসব বিষয়।

কুরআনুল কারিমে উদ্যানের যেসব দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে তার কিছু ফুটে উঠেছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে,

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ مُدْهَامَّتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾

আর যে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু শাখা-

পল্লববিশিষ্ট। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুটি প্রস্রবণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেইসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত-নয়না, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে? সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? এই উদ্যান দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ঘন সবুজ এই উদ্যান দুটি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? যেখানে রয়েছে ফলমূল—খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেই উদ্যানসমূহে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীরা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার ওপর।[৪৯]

---

[৪৯]. সুরা রহমান : আয়াত ৪৬-৭৬।

এ ছাড়াও কুরআনের আরও অনেক আয়াতে অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ দ্বিতীয় উৎস, যেখান থেকে মুসলিমরা প্রাকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে শাণিত করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنَا عَنِ الْـجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، وَمِلَاطُهَا الْـمِسْكُ الأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلاَ يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلاَ يَمُوتُ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُه»

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাত সম্পর্কে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, তার নির্মাণ কী দিয়ে? তিনি বললেন, জান্নাতের একটি ইট রুপার, আরেকটি ইট সোনার। তার প্রলেপ (প্লাস্টার) সুরভিত মিসকের। মুক্তা ও পদ্মরাগ হলো তার কঙ্কর। তার মাটি হলো জাফরান। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো কষ্ট পাবে না । সে সেখানে হবে চিরঞ্জীব, কখনো তার মৃত্যু হবে না। তার পোশাক জীর্ণ হবে না, কখনো ফুরাবে না তার যৌবনকাল।[৫০]

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ لِلْـمُؤْمِنِ فِي الْـجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيْلاً، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْـمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

নিশ্চয় মুমিনের জন্য জান্নাতে একটি শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা মুক্তা দিয়ে তৈরি তাঁবু থাকবে। তাঁবুটির দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। মুমিন বান্দার

---

৫০. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮০৩০। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি সহিহ।

জন্য সেখানে হুর-বালা থাকবে। মুমিন বান্দা তাদের কাছে যাবে, কিন্তু তাদের একজন অপরজনকে দেখতে পাবে না।[৫১]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ فِي الْـجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا»

নিশ্চয় জান্নাতে এত বড় গাছ থাকবে, অশ্বারোহী তার ছায়ায় একশ বছর ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।[৫২]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْـجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْـمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ. فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ»

আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এ সময় একটি ঝরনার কাছে এলে দেখি তার দুই ধারে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী হে জিবরাইল? তিনি বললেন, এই কাউসারই আপনাকে দিয়েছেন আপনার প্রতিপালক। তার মাটি (বা তার ঘ্রাণ) সৌরভময় মিসক।[৫৩]

এই নান্দনিকতা ও সৌন্দর্য প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহে প্রচুর দলিল রয়েছে। সর্বজনীন ইসলামি চেতনার কাঠামো নির্মিত হয়েছে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগ্য উপকরণের প্রতি কৌতূহলের ওপর ভিত্তি করে, তাই মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহর উপর্যুক্ত অনন্য চিত্র অনুকরণ করে মানবসভ্যতাকে দুহাত ভরে উপহার দিয়েছেন।

---

[৫১]. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, বাব : তাফসিরু সুরাতির রাহমান, হাদিস নং ৪৫৯৮; মুসলিম, কিতাব : আল-জান্নাতু ওয়া সিফাতু নাইমিহা ওয়া আহলিহা, বাব : সিফাতু খিয়ামিল জান্নাতি ওয়া মা লিল মুমিনিনা ফিহা মিনাল আহলিনা, হাদিস নং ২৮৩৮।

[৫২]. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালকি, বাব : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া আন্নাহা মাখলুকাহ, হাদিস নং ৩০৭৯; মুসলিম, কিতাব : আল-জান্নাতু ওয়া সিফাতু নাইমিহা ও আহলিহা, বাব : ইন্না ফিল জান্নাতি শাজারাতান ইয়াসিরু রাকিবু ফি যিল্লিহা মিআতা আমিন লা ইয়াকতাউহা, হাদিস নং ২৮২৭।

[৫৩]. *বুখারি*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আর-রিকাক, বাব : আল-হাউদ, হাদিস নং ৬২১০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৩০১২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় বাগানের বিস্তার

বাগানের দৃশ্য বুকের মধ্যে আনন্দ, প্রফুল্লতা, উদ্যম ও প্রাণশক্তি সৃষ্টি করে। এই আনন্দের অনুভূতি এবং সজীব-সপ্রাণ সৌন্দর্যের চিন্তা হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বাগানে-উদ্যানে অসাধারণ নৈসর্গিক নিদর্শন-সম্পর্কিত ভাবনা সেই স্রষ্টার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করে, যিনি এই বিস্ময়কর সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। একটিমাত্র ফুলকে রঞ্জিত ও সুসজ্জিত করে প্রাণময় করে তোলা মানবজাতির সমস্ত বড় শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব নয়। একটি ফুলে রঙের বিস্তার ও বৈচিত্র্য, আঁকিবুকির কারুকাজ ও পাপড়িগুলোর বিন্যাস এমন মুজিযা ও অলৌকিকতা প্রকাশ করে যার সামনে প্রাচীন কালের ও আধুনিক কালের যাবতীয় শিল্পপ্রতিভাই অক্ষম। বৃক্ষরাজিতে যে বর্ধনশীল প্রাণের অস্তিত্ব তার কথা তো বলাই বাহুল্য, কারণ তা এমন অদ্ভুত রহস্য যা মানুষের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য...।[৫৪]

কুরআন ও সুন্নাহ চোখ ধাঁধানো দীপ্তিময় চিত্ররাশি দ্বারা পরিপূর্ণ, তার বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটেছে ইসলামি সভ্যতার ওপর। প্রাচ্যে ও মাগরিবে[৫৫] ইসলামের এমন কোনো সভ্যতা নেই যেখানে নয়নাভিরাম বাগান ও উদ্যান রচিত হয়নি, এসব বাগান ও উদ্যানে চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা ছড়িয়েছে ইসলামি স্থাপত্য-চেতনা। আন্দালুস, তুরস্ক, সিরিয়া

---

৫৪. সাইয়িদ কুতুব, *তাফসির ফি যিলালিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৩৯০।

৫৫ বর্তমানে মাগরিব কথাটি দিয়ে মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে বোঝানো হয়; ব্যাপকতর অর্থে লিবিয়া ও মোরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীতকালে আরবি ভাষায় মাগরিব বলতে অবশ্য দেশ তিনটির যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, সেগুলোকে বোঝানো হতো। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ স্পেন, পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ এবং মাল্টা দ্বীপপুঞ্জকেও মাগরিবের অন্তর্ভুক্ত করেন। মাল্টা দ্বীপপুঞ্জে আজও আরবি ভাষার একটি মাগরিবীয় উপভাষা প্রধান ভাষা হিসেবে প্রচলিত। অ্যাটলাস পর্বতমালা এবং সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি আফ্রিকার বাকি অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। জলবায়ু, ভূমিরূপ, অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক দিক থেকে এটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত।-অনুবাদক

(শাম), পারস্য, মিশর, সমরকন্দ, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ইয়ামেন, ওমান, ভারত ও অন্যান্য এলাকায় এসব বাগান ও উদ্যানের ছড়াছড়ি ছিল।

আন্দালুসে[৫৬]

কর্ডোভা : আবদুর রহমান আদ-দাখিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'আর-রুসাফা' (রুসাফা আল-আন্দালুস)। ইসলামের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় উদ্যান হিসেবে বিবেচিত হয়। সিরিয়ায় (শামে) যে রুসাফাটি ছিল তার অনুকরণেই তিনি এটি তৈরি করেছিলেন। সিরিয়ার রুসাফাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার দাদা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক। দাদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্ডোভার শহরতলিতে আবদুর রহমান তৈরি করেন তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় উদ্যান। তিনি উদ্যানটির জন্য সব এলাকা থেকে বিস্ময়কর সব উদ্ভিদ ও মহামূল্য সব গাছ সংগ্রহ করেন। ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক[৫৭] যেসব গাছের সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন সেগুলোও তিনি এই উদ্যানে নিয়ে আসেন। তার দুইজন দূত গোটা সিরিয়া ভ্রমণ করে বাছাই করা বীজ ও দুর্লভ দানা সংগ্রহ করেন। এগুলো ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও যথাযথ পরিচর্যার ফলে কিছুকালের ব্যবধানেই মনোরম গাছগাছালিতে পরিণত হয়। গাছগুলোতে ফলে আশ্চর্যজনক সব ফল। কয়েক বছরের মধ্যেই এসব গাছ গোটা আন্দালুসে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য গাছের তুলনায় এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।[৫৮]

গ্রানাডা[৫৯] : গ্রানাডার নগরপ্রাচীর ঘিরে চতুর্দিকে উদ্যান আর বাগান চোখে পড়ে। এগুলোকেও আরেকটি প্রাচীর মনে হয়।[৬০] এটা হলো

---

৫৬. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা খাদরা জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : العلم والتكنولوجيا والزراعة (Science, Technology and Agriculture), অনুচ্ছেদ : أولوية في مدلولاتها الرمزية الحديقة الأندلسية : دراسة (The Hispano-Arab Gerden : Notes towards A Typology), লেখক : জেমস ডিকি (James Dickie), খ. ২, পৃ. ১৪১১ ও তার পরবর্তী।

৫৭. ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনে আবুল আস (৬৮৭-৭২৪ খ্রি.) ছিলেন আবদুর রহমানের দাদার ভাই এবং উমাইয়া খেলাফতের নবম খলিফা। তিনি দ্বিতীয় ইয়াযিদ নামেও পরিচিত।-অনুবাদক

৫৮. আহমাদ মুহাম্মাদ আল-মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৪৬৭।

৫৯. ইবনে খতিব, *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা*, অনুচ্ছেদ : ওয়াসফু হাদাইকি গারনাতা, পৃ. ১১৫ ও তার পরবর্তী।

শহরের বাইরের দৃশ্য। শহরের ভেতরে প্রাসাদগুলোতেও বাগান ছিল। আল-হামরা প্রাসাদের বাগানগুলোকে ইসলামি সভ্যতার বাগানগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায়।

গ্রানাডায় আরও আছে 'জান্নাতুল আরিফ'[৬১] বাগান। বাগানটি নির্মাণ করা হয়েছে পাহাড়ের উপরে, মুসলিম শিল্পীরা এটিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন। বাগানটির প্রশস্ততা প্রায় তেরো মিটার এবং স্তর প্রায় ছয়টি। এই বাগানে পানি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বাগানটির উপরের স্তর থেকে ঝরনার মধ্য দিয়ে পানি নেমে আসছে এবং কয়েকটি নালা দিয়ে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে। এই বাগানের কারিগরেরা যে কুরআনের এই আয়াত, ﴿وَمَآءٍ مَّسۡكُوبٍ﴾—'সদা প্রবহমান পানি'[৬২]-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।[৬৩]
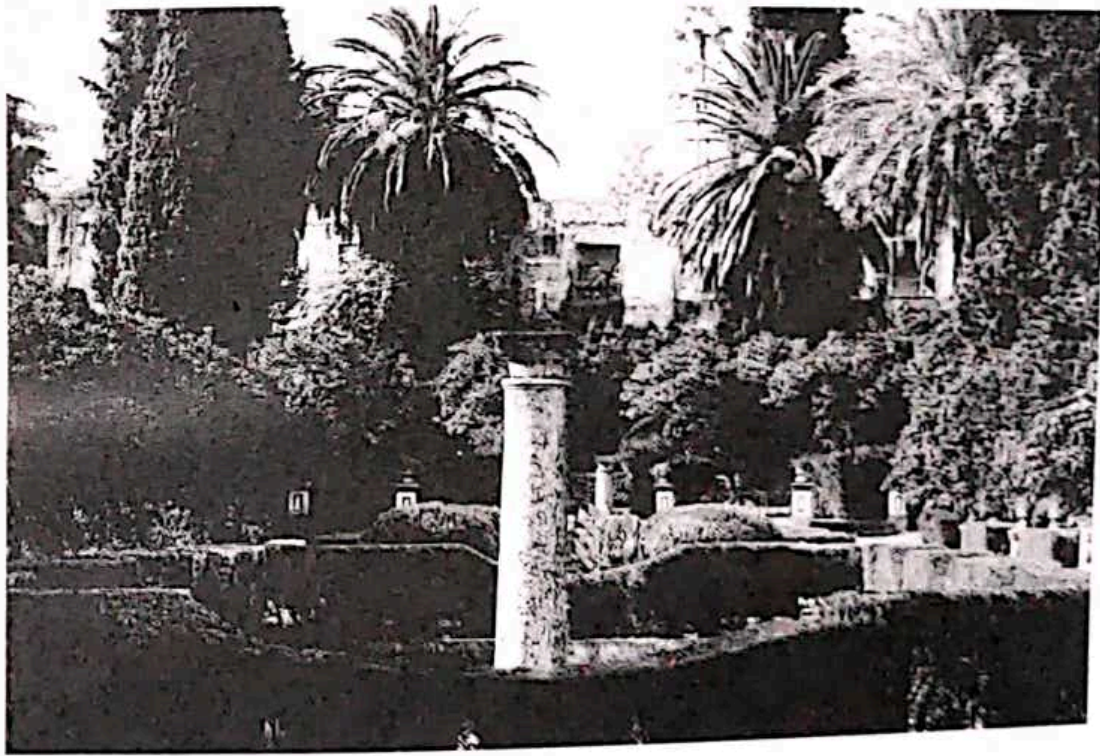
চিত্র নং-২৫
আন্দালুসের বাগান

---

৬০. প্রাগুক্ত।
৬১. বর্তমানে এটি Generalife নামে পরিচিত।
৬২. সুরা ওয়াকিআ : আয়াত ৩১।
৬৩. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২২৩।

কর্ডোভার স্বর্ণযুগ যখন শেষ হয়ে গেল এবং তায়িফা[৬৪] আমিরদের যুগ শুরু হলো, তখনও বাগান নির্মাণের ধারা অব্যাহত ছিল। এক্সপিরাসিওন গার্সিয়া সানচেজ[৬৫] আন্দালুসের বাগানগুলোর চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, খেলাফত যখন ভেঙে গেল এবং তায়িফা নৃপতিদের উদ্ভব ঘটল, নতুন শাসকরা পদচ্যুত খলিফাদের রীতিনীতি অনুকরণ করতে কিছুমাত্র পিছপা হলো না। ফলে ওইসব কৃত্রিম বাগানের আধিক্য দেখা গেল, নতুন নৃপতিদের প্রাসাদগুলোর প্রত্যেকটিতেই একাধিক বাগান তৈরি হলো। এসব বাগানের প্রতিটিতে থাকতেন একজন কৃষিবিদ, যিনি বাগানটির তত্ত্বাবধান করতেন।[৬৬]

আন্দালুসে বাগান ছিল বাড়ির সমান সংখ্যক। প্রত্যেক বাড়িতে ছোট করে হলেও একটি বাগান থাকত। জেমস ডিকি[৬৭] গ্রানাডার ছোট ছোট বাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, অধিকাংশ বাড়ি ছোট হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই ছিল প্রবহমান জল, অজস্র ফুল, সৌরভময় গোলাপরাশি, তরুগুল্ম এবং আরাম ও সুখ লাভের সব উপকরণ। এসব বিষয় প্রমাণ করে যে, এই পৃথিবী যখন মুরদের

---

[৬৪]. ৪২২ হিজরিতে/১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে উজির আবুল হায্ম ইবনে জাহওয়ার আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের পতনের ঘোষণা দেন। ফলে এলাকাগুলো কোনো একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধীন না থেকে আমিরদের স্বাধীন আমিরাত বা রাজ্যভূমিতে পরিণত হয়। তাদেরকে তায়িফা আমির বা গোত্রভিত্তিক আমির বলা হতো।-অনুবাদক

[৬৫]. এক্সপিরাসিওন গার্সিয়া সানচেজ (Expiración García Sánchez) : গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি ইতিহাসের অধ্যাপিকা এবং মাদ্রিদে অবস্থিত স্প্যানিশ ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) আরবি ভাষা বিভাগের গবেষক।

[৬৬]. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা খাদরা জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : العلم والتكنولوجيا والزراعة (Science, Technology and Agriculture), অনুচ্ছেদ : الزراعة في إسبانيا المسلمة (Agriculture in Muslim Spain), লেখক : এক্সপিরাসিওন গার্সিয়া সানচেজ, খ. ২, পৃ. ১৩৭০।

[৬৭]. জেমস ডিকি (ইয়াকুব যাকি) : আন্দালুস বা ইসলামি স্পেনের ইতিহাস এবং ইসলামি শরিয়ায় বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী পণ্ডিত। পণ্ডিত হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করেছেন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে, লানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটিতে (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি)। ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স ১৯৭৪-১৯৭৬-এ তিনি উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৫ সালে তিনি কায়রো থেকে ইবনে ওহাইদ আল-আন্দালুসির নৃবিজ্ঞানের ওপর একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন।

(আরবদের) হাতে ছিল তখন আজকে যেমন আছে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ছিল।[৬৮]

ইসলাম বুল[৬৯] (কনস্টান্টিনোপল)

যদি আমরা ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ভ্রমণ করতে শুরু করি তাহলে আমরা উসমানি খেলাফতের রাজধানীতে পৌঁছে যাব। আমরা দেখব যে, সেখানে কেবল ইসলাম প্রবেশের ফলেই দেশের সর্বত্র বাগান ও উদ্যানের বিস্তার ঘটেছে। আনাতোলিয়ান বাগানগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যরকম, প্রথমে বাগানের নকশা তৈরি করা হতো, তারপর সেই নকশা অনুযায়ী বাগান তৈরি করা হতো। এ কারণেই ইস্তাম্বুলের প্রাসাদগুলোর নাম ছিল 'হাদিকাহ' বা বাগান। যদিও প্রাসাদগুলো থাকত বাগানের অভ্যন্তরীণ অংশে। এসব বাগান বিনোদন, সামাজিক অনুষ্ঠান ও সরকারি সভার কাজে ব্যবহৃত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাগানগুলো তৈরি করা হয়েছে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে, যেমন ইস্তাম্বুলে।

উসমানি খেলাফতের যুগে মসজিদগুলোর স্থাপত্য কাঠামোতে সবুজ চত্বর রাখা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থেকে মসজিদগুলোকে সুরক্ষাদানের জন্য এসব চত্বর নির্মাণ করা হতো। যেমন ইস্তাম্বুলের সুলাইমানিয়া মসজিদ। জনশ্রুতি ছিল যে, যেসব বাড়িঘর কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো সেগুলোতে আগুন লাগত, সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ত পার্শ্ববর্তী মসজিদগুলোতে। বিষয়টি স্থপতি সিনানকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি জামে মসজিদ ও তার সংলগ্ন অংশগুলোকে বহিঃপ্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। বহিঃপ্রাচীর ও মসজিদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে বড় বড় চত্বর, এসব চত্বরে লাগানো হবে অসংখ্য গাছ। বিভিন্ন জাতের নানা ধরনের ফুল। মসজিদকে পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর থেকে আলাদা রাখবে এগুলো। ওই সময়েই এসব বাগানের অনন্য নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

---

৬৮. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা আল-খাদরা আল-জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : التاريخ (Histoy), অনুচ্ছেদ : غرناطة.. مثال من المدينة العربية في الأندلس (Granada : A Case Study of Arab Arbanism in Muslim Spain), লেখক : জেমস ডিকি (James Dickie), খ. ১, পৃ. ১৭৬।

৬৯. ইসলাম বুল অর্থ ইসলামের শহর। জয় করার পর কনস্টান্টিনোপলকে উসমানিরা এই নামেই ডাকত। বর্তমানে শহরটির নাম ইস্তাম্বুল।
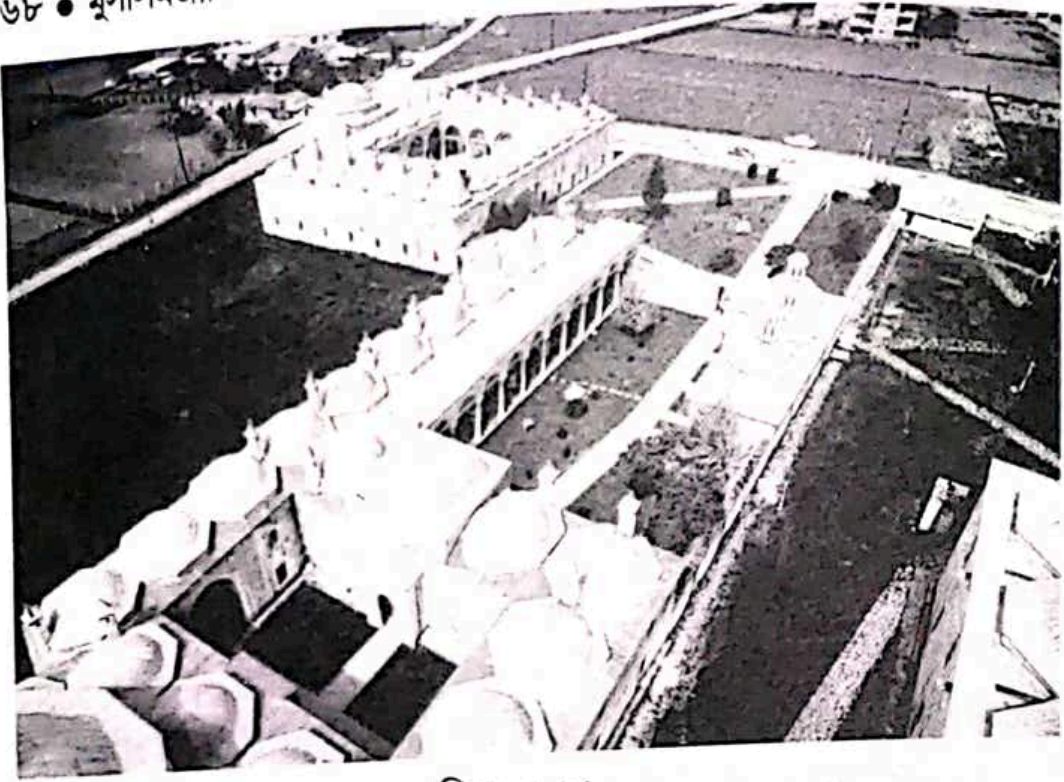
চিত্র নং-২৬
বায়জিদ কমপ্লেক্স (তুরস্ক)

উসমানি যুগে বড় বড় মসজিদের প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনে বৃক্ষ রোপণ করা হতো। এসব মসজিদের উদাহরণ হলো পবিত্র মসজিদে নববি ও তুরস্কের মসজিদে বাইজিদ।

চিত্র নং-২৭
তোপকাপি প্রাসাদের বাগান

তোপকাপি প্যালেসের বাগানগুলোকে অনন্য বিবেচনা করা হয়। তোপকাপি প্যালেসের নির্মাণকাজ শুরু হয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের যুগে।[৭০] হিজরি দশম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক (খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক) পর্যন্ত এই প্যালেস ছিল উসমানি সুলতানদের আবাসস্থল। প্রাসাদটির চারপাশে উনসত্তর হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃতি ছিল সেসব বাগানের। জায়গার মোট আয়তন ছিল পাঁচ বর্গ কিলোমিটার। বাগানের মধ্য দিয়ে রেখা টানার মতো ছিল উন্মুক্ত চলার পথ, এসব পথ প্রাসাদটিকে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। এসব বাগানের মধ্যে ফল ও সবজির বাগানও ছিল। শিকারের জন্যও একটি বিশাল জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছিল।[৭১]

মিশর

ফুসতাত ছিল ইসলামি মিশরের প্রথম রাজধানী। 'বিরকাতুল হাবাশ' হলো ফুসতাতের একটি অংশ। এই বিরকাতুল হাবাশের বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে সাইদ। তিনি বলেছেন, বিরকাতুল হাবাশ ছিল তুলুন পরিবারের উজির আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আলি মাদরায়ির রাজ্যের আওতাধীন। পূর্ব প্রান্তের বাগানগুলো ব্যতীত এখানকার যাবতীয় ফসলি খেত, বাগান ও উদ্যানও ছিল তার মালিকানাধীন। আমি ধারণা করি, পূর্ব প্রান্তের বাগানগুলো ছিল ওয়াহাব ইবনে সাদাকার, যিনি আল-হাবাশ নামে পরিচিত ছিলেন। এই বিরকাহর পূর্ব প্রান্ত শেষ হয়েছে উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে, ওই উন্মুক্ত প্রান্তর পর্যন্তই রয়েছে হাবাশের বাগানগুলো। বিরকাতুল হাবাশের আগে রয়েছে কাতাদা ইবনে কাইস ইবনে হাবাশ সাদাফির বাগানগুলো। তিনি মিশর বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার নামেই বাগানগুলোও বিরকাহ পরিচিতি পেয়েছে।[৭২]

খুমারাওয়াইহ ইবনে আহমাদ ইবনে তুলুনের শাসনামলে (৮৮৪-৮৯৬ খ্রি.)—তুলুনি রাজবংশের যুগে—কিছুকালের জন্য মিশরের রাজধানী ছিল আল-কাতায়ি। মিশরীয় ঐতিহাসিক আল-মাকরিযি (১৩৬৪-১৪৪২ খ্রি.)

---

৭০. শাসনকাল ১৪৪৪-১৪৪৬ খ্রি. এবং ১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.। জন্ম ১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে।-অনুবাদক

৭১. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২২৪-২২৬।

৭২. আহমাদ আদিল কামাল, *আতলাসু তারিখিল কাহেরা*, পৃ. ৩৫ থেকে উদ্ধৃত। তিনি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে দুকমাক রচিত *আল-ইনতিসার লিওয়াসিতাতি আকদিল আমসার* থেকে।

এই রাজধানীর নিসর্গ সম্পর্কে বলেন, খুমারাওয়াইহ ইবনে আহমাদ তার পিতার প্রাসাদে আসেন এবং প্রাসাদটিকে সংস্কার ও বড় করেন। তার পিতার যে বিশাল ময়দান ছিল তার পুরোটাকে উদ্যানে রূপান্তরিত করেন। উদ্যানে রোপণ করেন নানা জাতের সুগন্ধ গুল্ম ও ফুল, বিভিন্ন রকমের গাছ। তিনি উদ্যানটির জন্য সুন্দর সুন্দর চারা[৭৩] নিয়ে আসেন, এগুলোতে যেসব ফল ফলেছিল দাঁড়িয়েই সেগুলোর নাগাল পাওয়া যেত। বিভিন্ন উৎকৃষ্ট জাতের খেজুরগাছ ছিল, বসে থেকে হাত বাড়ালেই এসব খেজুর ছেঁড়া যেত। উদ্যানের জন্য আরও নিয়ে আসেন অদ্ভুত ও মনোরম সব গাছ, সব ধরনের গোলাপ। এখানে জাফরানও চাষ করেন তিনি। খুমারাওয়াইহ খেজুরগাছের দেহে পরিয়ে দেন চমৎকার করে বানানো সোনালি পাত দিয়ে মোড়া তামার কাঠামো। তামার কাঠামো ও খেজুরগাছের দেহের মাঝখানে বসিয়ে দেন সিসার তৈরি নালি। তিনি এতে প্রবাহিত করিয়ে দেন নিয়ন্ত্রিত জলের ধারা। খেজুরগাছের দীর্ঘ কাঠামোর খাঁজ বেয়ে নেমে আসত পানির ঝরনা এবং তা পতিত হতো কৃত্রিম ফোয়ারাবিশিষ্ট হাউজে; হাউজ থেকে পানি প্রবাহিত হতো বিভিন্ন ধারায়, ধারাগুলো বাগানকে সিঞ্চিত করত। উদ্যানে তিনি কৃত্রিম পত্রপল্লব ও নকশার (খোদাইকর্ম ও ভাস্কর্য) ওপর রোপণ করেছিলেন সুগন্ধ ফুল ও লতাগুল্ম। বাগানের মালি কাঁচি দিয়ে নিয়মিত এগুলোর পাতা কেটে দিত, যাতে পাতার ওপর পাতা জড়িয়ে না যায়। কৃত্রিম জলাশয়ে জলপদ্মের চাষও তিনি করেছিলেন। লাল, নীল ও হলুদ রঙের জলপদ্ম বাগানটির শোভা বাড়িয়ে দিয়েছিল...। আল-মাকরিযি এভাবেই ওইসব নয়নাভিরাম দৃশ্যের বর্ণনা দিতে থাকেন।[৭৪]

বাগদাদ

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মানসুর[৭৫] ১৪৫ হিজরি থেকে ১৪৯ হিজরির মধ্যে বাগদাদ শহর নির্মাণ করেন। একে আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী ঘোষণা করেন। বাগদাদে তার প্রাসাদের নাম দেন 'আল-খুলদ'। খতিব বাগদাদি বলেন, আল-মানসুরের প্রাসাদের নাম 'আল-খুলদ' রাখা হয় কুরআনে বর্ণিত 'জান্নাতুল খুলদ' নামানুসারে।

---

৭৩. মূল বইয়ে এখানে মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে।-অনুবাদক

৭৪. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ১, পৃ. ৮৭২।

৭৫. দ্বিতীয় আব্বাসি খলিফা। রাজত্বকাল ১৩৬ হি. থেকে ১৫৮ হি.।

কারণ এই প্রাসাদে ছিল অপরূপ সব দৃশ্য, চমৎকার সব বস্তু এবং খলিফার আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত সব চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল এখানে।[৭৬]

আব্বাসি খলিফাদের যুগে বাগদাদ ছিল গোটা পৃথিবীর বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ শহর। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলার দিক থেকে তা ছিল গোটা বিশ্বের রাজধানী। বাগদাদের পর আরও অনেক শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... কর্ডোভা, কায়রো, কনস্টান্টিনোপল ইত্যাদি। এরপর অন্যান্য শহরের কথাও উল্লেখ করা যায়।

ইয়াকুত হামাবি প্রাচীন বাগদাদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাগদাদ হলো পৃথিবীর জান্নাত, শান্তির শহর, ইসলামের চূড়া, আগন্তুকদের মিলনমেলা, অন্য শহরগুলোর ললাট, ইরাকের চোখ, দারুল খিলাফা, ভালো ও উত্তম সবকিছুর সমাবেশস্থল, দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তাকর্ষক বস্তুরাশির খনি; বাগদাদে ছিল সব শাস্ত্রের সীমাহীন প্রতিভাবানদের বসবাস, সব বিষয়ের যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের আবাস। আবু ইসহাক আয-যুজাজ বলতেন : বাগদাদ হলো পৃথিবীর নগরী, তা বাদে সবকিছু গ্রাম ও মরুভূমি।[৭৭]

যাকারিয়া কাযবিনি আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহর প্রাসাদ-উদ্যানের বর্ণনা দিয়ে বলেন, আল-মুকতাদির বিল্লাহর (২৮২-৩২০ হি.) ভবনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো বৃক্ষভবন (দারুশ শাজারাহ)। ভবনটি বেশ প্রশস্ত, চারপাশে বাগান দ্বারা বেষ্টিত। ভবনটির ফটকের সামনে রয়েছে একটি বড় কৃত্রিম জলাশয়। জলাশয়ের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটি বৃক্ষ, বৃক্ষটি তৈরি করা হয়েছে সোনা ও রুপা দিয়ে। বৃক্ষের শরীরে রয়েছে সোনা ও রুপার তৈরি আঠারোটি ডাল। প্রতিটি ডালে রয়েছে অসংখ্য শাখা, শাখাগুলো ফলের আকারে বিভিন্ন ধরনের অলংকারে শোভিত। ডালগুলোতে আরও রয়েছে সোনা-রুপার তৈরি নানা জাতের রং-বেরঙের পাখি। বাতাস বয়ে গেলে শোনা যায় সুরেলা ধ্বনি ও গুঞ্জরণ। এই বৃক্ষের জন্যই ভবনটির নামকরণ হয়েছে বৃক্ষভবন।[৭৮]

---

৭৬. খতিব বাগদাদি, *তারিখু বাগদাদ*, পৃ. খ. ১ , পৃ. ৭৩।

৭৭. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৪৬১।

৭৮. কাযবিনি, যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ, *আসারুল বিলাদি ওয়া আখবারুল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ১২৭।

অক্ষের নীতি মেনে, যা চারবাগ

চিত্র নং-২৮

তাজমহলের বাগান

---
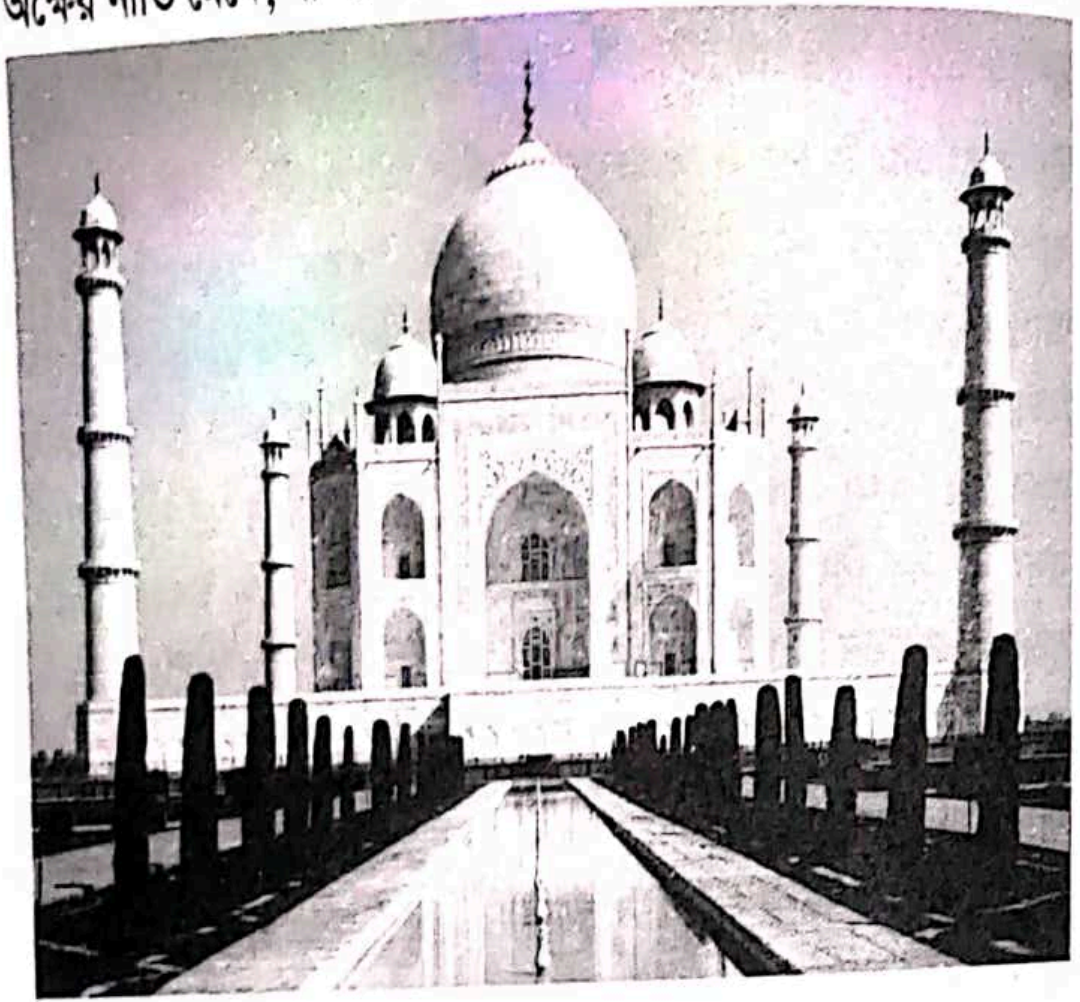
*. তাজমহলের সামনের চত্বরে একটি বড় চারবাগ (মুঘল বাগান পূর্বে চার অংশে বিভক্ত থাকত) করা হয়েছিল। ৩০০ মিটার × ৩০০ মিটার জায়গার বাগানের প্রতি চতুর্থাংশ উঁচু পথ ব্যবহার করে ভাগগুলোকে ১৬টি ফুলের বাগানে ভাগ করা হয়। মাজার অংশ এবং দরজার মাঝামাঝি অংশে এবং বাগানের মধ্যখানে একটি উঁচু মার্বেল পাথরের পানির চৌবাচ্চা বসানো আছে এবং উত্তর-দক্ষিণে একটি সরলরৈখিক চৌবাচ্চা আছে যাতে তাজমহলের প্রতিফলন দেখা যায়। এ ছাড়া বাগানে আরও বেশ কিছু বৃক্ষশোভিত রাস্তা এবং ঝরনা আছে। চারবাগ বাগান ভারতে প্রথম করেছিলেন প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর, যা পারস্যের বাগানের মতো করে নকশা করা হয়েছিল। চারবাগ মানেই যাতে স্বর্গের বাগানের প্রতিফলন ঘটবে। প্রায় সব মুঘল চারবাগ চতুর্ভুজাকৃতির, যার বাগানের মধ্যখানে মাজার বা শিবির থাকে। কিন্তু তাজমহল এ ব্যাপারটিতে অন্যগুলোর থেকে আলাদা, কারণ এর মাজার অংশটি বাগানের মধ্যখানে হওয়ার বদলে বাগানের একপ্রান্তে অবস্থিত। যমুনা নদীর অপর প্রান্তে নতুন আবিষ্কৃত মাহতাব বাগ অন্যরকম তথ্যের আভাস দেয়, যমুনা নদীটি বাগানের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যাতে তা স্বর্গের নদী হিসেবে অর্থবহ হয়। মুঘল সম্রাটদের উত্তরোত্তর অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাগানেরও অবক্ষয় ঘটে। ইংরেজ শাসনামলে তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইংরেজরা নেয়। তারা এ প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যকে পরিবর্তন করে বাগানের চেহারা পালটে দেয়।-অনুবাদক

আগ্রাতেই অবস্থিত ই'তিমাদুদ দাওলার সমাধিসৌধের উদ্যানটিও এরূপ নকশায় তৈরি করা হয়েছে। সমাধিসৌধটি চতুর্ভুজ আকৃতির উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে একটি উঁচু চত্বরের ওপর নির্মিত। সমাধিসৌধের বহির্ভাগে চারদিকে রয়েছে চারটি চৌবাচ্চা। উদ্যানটি চারটি অংশে বিভক্ত, চারটি অংশ সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গাছপালায় শোভিত।

দিল্লিতে অবস্থিত সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিসৌধেও একইরকম নকশা লক্ষ করা যায়। সমাধিটি উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উদ্যানে রয়েছে পানির হাউজ ও নালা, এগুলো অক্ষীয় চতুর্ভুজ আকৃতিতে বিন্যস্ত।[৮০]

মাগরিব

মুওয়াহহিদিনদের শাসনামলে (আল-মুহাদ রাজবংশের যুগে) উদ্যান ও বাগান সবচেয়ে বেশি ছিল মারাকেশে, আঙুর ও অন্যান্য সব ধরনের ফলের বাগান ছিল প্রচুর। মারাকেশের বাগানগুলোর মধ্যে দুটি ছিল বেশ বিখ্যাত : বুসতানুল মাসাররাহ ও বুসতানুস সালিহিয়্যাহ। বাগান দুটি নির্মাণ করেন আবদুল মুমিন ইবনে আলি। কয়েকটি বড় লেক বা কৃত্রিম জলাশয়ও ছিল এই শহরে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইয়াকুব আল-মানসুরের তৈরি লেক। এটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৮০ গজ। লেকটির একপাশে রয়েছে চারশ কমলালেবুগাছ। প্রতি দুই কমলালেবু গাছের মাঝে রয়েছে একটি লেবুগাছ বা ফুল গাছ।[৮১]

মারাকেশের বাগানগুলোই মাগরিবের একমাত্র বাগান ছিল না। অন্যান্য শহরেও বাগান ও উদ্যান ছিল। যেমন : মিকনাস (Meknes), ফাস (ফেজ), আল-মাকারমিদাহ, তাযারাইন (Tazzarine)[৮২], সালা (Salé) ও সাবতাহ (Ceuta)।[৮৩], [৮৪]

ইবনে ফাদলুল্লাহ উমারি (১৩০০-১৩৮৪ খ্রি.) সাবতাহর বাগানগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিররুল আওদায় অবকাশযাপনের

---

৮০. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২২৭-২২৮।

৮১. মুহাম্মাদ বিন আবদুল হাদি আল-মানুনি, *হাদারাতুল মুওয়াহহিদিন*, পৃ. ১৬২।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৮৩. ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত একটি স্প্যানিশ স্বায়ত্তশাসিত শহর। শহরটি মরক্কো দ্বারা বেষ্টিত।-অনুবাদক

৮৪. হাসান আলি হাসান, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-মাগরিব ওয়াল-উন্দুলুস আসরুল মুরাবিতিন ওয়াল-মুওয়াহহিদিন*, পৃ. ৪২৮ ও তার পরবর্তী।

বেশ কিছু স্থান ছিল। স্থানগুলো সবার চিত্তাকর্ষণ করত, চোখ ধাঁধিয়ে দিত দর্শকদের। সমুদ্রের কূল ঘেঁষে সাবতাহর উপকণ্ঠে বেলিওনেচ[৮৫]-এ রয়েছে উদ্যান ও বিনোদনকেন্দ্র। এটির নকশা ও নির্মাণ অত্যন্ত চমৎকার। এখানকার পানি এক শ্রুতিমধুর গুঞ্জরণ তুলে পাথরের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে, রয়েছে দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষরাজি...।[৮৬]

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামি সভ্যতার উদ্যান ও বাগানগুলোতে এই আনন্দময় ভ্রমণ এই সভ্যতার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকেই দৃঢ় করে। ইসলামি সভ্যতার এসব উত্তরাধিকার আজ পর্যন্ত মানবিক ও পরিবেশগত উৎকর্ষের মাইলফলক হয়ে আছে। দ্বীনে ইসলাম ও মানবস্বভাবের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক বিদ্যমান, এসব বিষয় তারই অকাট্য প্রমাণ। কারণ মানবহৃদয় স্বাভাবিকভাবেই সবুজ রং এবং ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজি ও ফলরাশির প্রতি আকর্ষিত হয়।

---

৮৫. Belyounech (بليونش). সাবতাহ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে সাগরের কূল ঘেঁষে অবস্থিত একটি পাহাড়ি এলাকা।-অনুবাদক

৮৬. শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে ফাদলুল্লাহ উমারি, *মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার*, খ. ৩, পৃ. ১১৭, (হাসান আলি হাসান, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-মাগরিব ওয়াল-উন্দুলুস আসরুল মুরাবিতিন ওয়াল-মুওয়াহিহিদিন*, পৃ. ৪২৯ থেকে উদ্ধৃত।)

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি বাগানগুলোর অনন্যতা

জেমস ডিকি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামি বাগানগুলোর নকশা ও নির্মাণ ইসলামি স্থাপত্যকলার মর্যাদা রাখে। পাশ্চাত্যের অভিধা ও পরিভাষা ব্যবহার করে এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ তা কেবল পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অগ্রগতির ঘটনাপঞ্জির বাইরের বিষয় নয়, বরং তা বিভিন্ন চিন্তাগত ঐক্যসূত্রের ফল। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইসলামি শিল্প কোনোদিনই উর্বরতাসমৃদ্ধ পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সম্মোহনের নিচে চাপা পড়েনি, অথচ ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের মূল ভিত্তিই এটি।[৮৭]

ড. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি তার *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ* গ্রন্থে[৮৮] ইসলামি অনন্য বাগানসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনুপ্রেরণা

ইসলামি বাগানগুলো কুরআন ও সুন্নাহে জান্নাতের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে অনুপ্রেরণাজাত। গাছ, পানি, নালা, আসন, মজলিস, ঘ্রাণ ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনারও অনুকরণ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের যেসব আয়াত থেকে মুসলিমরা পার্থিব উদ্যান ও বাগান তৈরি করার জন্য 'আদর্শমূলক স্থানে'র চিন্তা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তার অন্যতম হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

---

৮৭. সালমা খাদরা জাইয়ুশি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, খ. ২, পৃ. ১৪৩৫। তাতে জেমস ডিকির আলোচনা (الحديقة الاندلسية دراسة في مدلولاتها الرمزية) শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৮. ইয়াহইয়া ওয়াযিবি, *আল ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৪ ও এর পরের পৃষ্ঠাগুলো।

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোনো উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৮৯]

মুসলিমরা এখানে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ করেছেন। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতে কারিমা স্পষ্টভাবে বলছে যে, বাগান ও উদ্যানের জন্য আদর্শ স্থান কেবল ভূমি থেকে উঁচু জায়গাতেই হতে পারে। আয়াতে 'রাবওয়া' শব্দটি এসেছে, এর অর্থ উঁচু জায়গা, উঁচু ভূমি। উঁচু জায়গায় গাছ রোপণ করলে তা গাছের শেকড়কে ভূমির অভ্যন্তরীণ পানির সংস্পর্শে আসতে দেয় না। কারণ ভূমির অভ্যন্তরীণ পানি গাছের বর্ধনকে বাধাগ্রস্ত করে। একইভাবে উঁচু জায়গা অতিরিক্ত পানি ভালোভাবে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে।

গাছের পরিচর্যার প্রতি গুরুত্ব ও মনোযোগ এত বেশি ছিল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছের গুঁড়িতে সোনার পাত বাঁধিয়ে দেওয়া হতো। খুমারাওয়াইহ ইবনে আহমাদ ইবনে তুলুন তার প্রাসাদের বাগানগুলোর এত বেশি যত্ন নিতেন যে খেজুরগাছের শেকড়কে সোনার গিলটি করা তামার পাত দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুসলিমরা এই বৃক্ষের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই নীতিটি পেয়েছেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ»

৮৯. সুরা বাকারা : আয়াত ২৬৫।

জান্নাতে প্রতিটি গাছেরই গুঁড়ি হবে স্বর্ণের।[৯০]

২. স্বর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামি স্থাপত্যকলা যে অনন্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত তাকে আমরা 'স্বর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি' বলে আখ্যায়িত করতে পারি। প্রতিকূল আবহাওয়ায় দুর্যোগ-কবলিত পরিবেশে পার্থিব বাগান ও উদ্যান তৈরিতে যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে উঠেছে। বাগান তৈরির উদ্দেশ্য ছিল এই পরিবেশকে আরও সুন্দর ও পরিপাটি করে তোলা। ইসলামি শিল্পকলা ও স্থাপত্যকলার উৎকর্ষ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের নকশা তৈরি ও নির্মাণের প্রবণতাকে আরও রুচিশীল, অভিজাত ও জাঁকজমকপূর্ণ করার চেষ্টা অব্যাহত থেকেছে, সেই সৌন্দর্য ও নান্দনিকতাকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য, কুরআন তাকে পৃথিবীর উদ্যানসমূহ বলে চিহ্নিত করেছে।

﴿فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٖ﴾

তারপর এর দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি...।[৯১]

৩. উদ্যানের ফটকগুলোতে ও দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ করা হয়েছে কুরআনের আয়াত বা হাদিসের অংশ বা অন্যান্য ইসলামি বাণী।

৪. বাড়িগুলোতে প্রচুর বাগান থাকত। আর এ বাগানগুলো হতো বাড়ির ভেতর-আঙিনায়, যাতে গোপনীয়তা যথার্থভাবে বজায় থাকে এবং বাড়িগুলোতে যেন বড় চত্বর, উদ্যান ও গণমাঠের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে।

৫. ইসলামি যুগে বাগানগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল গোপনীয়তা। এ কারণেই বাগানগুলো ঘেরাও দেওয়া থাকত উঁচু প্রাচীর দিয়ে বা চারপাশে থাকত খেজুরগাছ, যাতে অভ্যন্তরীণ দৃশ্য বাইরে থেকে দেখা না যায়।

বাগানের প্রতি ইসলামি ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পর্যবেক্ষণের দিকটি উল্লেখ করে এই অনুচ্ছেদ শেষ করাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যবেক্ষণ থেকে ইসলামি দর্শনের ও পাশ্চাত্য দর্শনের সারমর্ম স্পষ্ট

---

[৯০]. *তিরমিযি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : সিফাতুল জান্নাহ আন রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বাব : সিফাতু শাজারিল জান্নাহ, হাদিস নং ২৫২৫।

[৯১]. সুরা নামল : আয়াত ৬০।

হয়েছে; ইসলামি দর্শন সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার প্রতি আবেগ ও আগ্রহের দিকটি গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বস্তুগত দিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতাকে। এই পর্যবেক্ষণ আমাদের নয়, জেমস ডিকির। তার এই পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি 'ইসলামি বাগানচর্চার ঐতিহ্য হত্যা'র কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, (আন্দালুসীয়-আরব বাগানের মৃত্যুর কারণ হলো একটি অনুমেয় প্রস্তাব, যা জনসংখ্যাতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ স্থানে রয়েছে। আমরা যে অনুমেয় প্রস্তাব এখানে পেশ করছি, অর্থাৎ বাগানের নকশা ও নির্মাণশিল্প কৃষিবিজ্ঞানেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ এবং এরই ওপর বাগানচর্চা নির্ভরশীল ছিল তা যদি সত্য হয়,) তা হলে মোরিস্কোদের[৯২] বিতাড়ন অবশ্যই স্পেনে ইসলামি বাগানচর্চার ঐতিহ্যকে হত্যা করছিল, এমনকি (খ্রিষ্টান শক্তি কর্তৃক) গ্রানাডার দখলও (ইউরোপীয়) রেনেসাঁসের দ্বারা প্রবর্তিত রুচি ও ফ্যাশনের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। ইউরোপীয় রেনেসাঁস বাগানকে স্থাপত্যকলার সম্পূরক হিসেবে দেখেছে, যেখানে মুসলিমরা প্রাসাদকে বাগানের অনুগামী হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখিয়েছেন। এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংশ্লেষ ঘটানো বা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব ছিল না। (এ ছাড়া যেকোনো রূপে ইসলামিক আর্টের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যক্তিকে ইনকুইজিশন[৯৩]-এ নিযুক্ত লোকদের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলছিল।)[৯৪]

---

৯২. মোরিস্কো (Morisco) একটি স্প্যানিশ কাতালান শব্দ। স্পেনে ইসলামি শাসনব্যবস্থার পতনের পর খ্রিষ্টীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেনে তখন যেসব মুসলিম ছিল তারা মর্মন্তুদ নির্যাতনের শিকার হয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও স্প্যানিশ রাজপরিবার তাদের মৃত্যুর হুমকির মুখে খ্রিষ্টধর্মগ্রহণে বা স্বনির্বাসনে বাধ্য করে। বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রকাশ্যে ধর্মপালনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এসব মুসলিমকেই মোরিস্কো বলে আখ্যায়িত করা হয়।-অনুবাদক

৯৩. ইনকুইজিশন (the Inquisition) অর্থ নির্দয় ধর্মীয় বিচার। স্পেনের মুসলিমদের ইনকুইজিশনের মুখোমুখি করে নির্যাতন ও বিভিন্নভাবে হত্যা করা হতো।-অনুবাদক

৯৪. সালমা খাদরা জাইয়ুশি, আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস, খ. ২, পৃ. ১৪৩৫। এই অংশটি আমি মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি।-অনুবাদক

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ফোয়ারা

বাগানে পানির ব্যবহারে মুসলিম কৃষিবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও শিল্পীর দক্ষতার অসাধারণ নজির হলো ইসলামি বাগানগুলোতে ফোয়ারার বিস্তার।
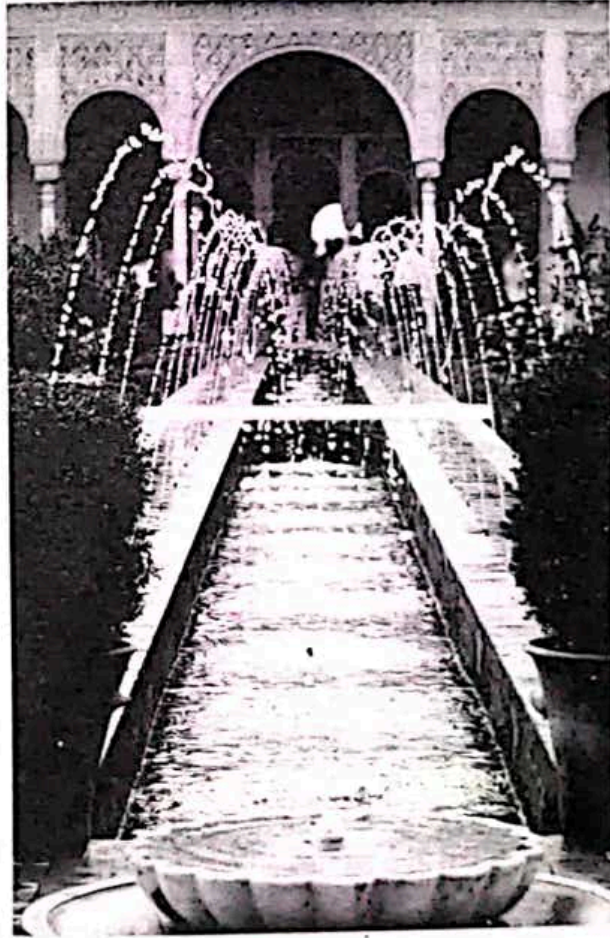
চিত্র নং-২৯
আন্দালুসের ফোয়ারা (গ্রানাডা)

মুসলিমদের বাগানগুলোতে পানিকে বিভিন্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছেঃ বৃক্ষরাজির ঘন ছায়াঢাকা কৃত্রিম জলাশয়রূপে; পানির পৃষ্ঠদেশের পরিবর্তন-সহায়ক ফোয়ারারূপে, ফলে পানি প্রতিবিম্বিত পৃষ্ঠদেশরূপে

কাজ করে না; বা উঁচু নলের সারিরূপে, যা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে এবং শ্রুতিমধুর কুলকুল ধ্বনি তোলে অথবা ঝরনারূপে।[৯৫]

আমরা লক্ষ করেছি, মুসলিমবিশ্বজুড়ে বাগানের বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক এবং আমরা আরও লক্ষ করেছি, ঘরবাড়ির ভেতর-আঙিনাতেও বাগানের বিস্তৃতি ছিল। তাই আমরা বলতে পারি, মুসলিম শহরগুলোর প্রত্যেক বাগানে ফোয়ারার সংখ্যা অনুমান করার জন্য আমাদের পক্ষে এই চিন্তাকে দ্বিগুণ করে নেওয়া সম্ভব। কারণ ফোয়ারার সংখ্যা এত বেশি যে তা গোনা সম্ভব নয়।
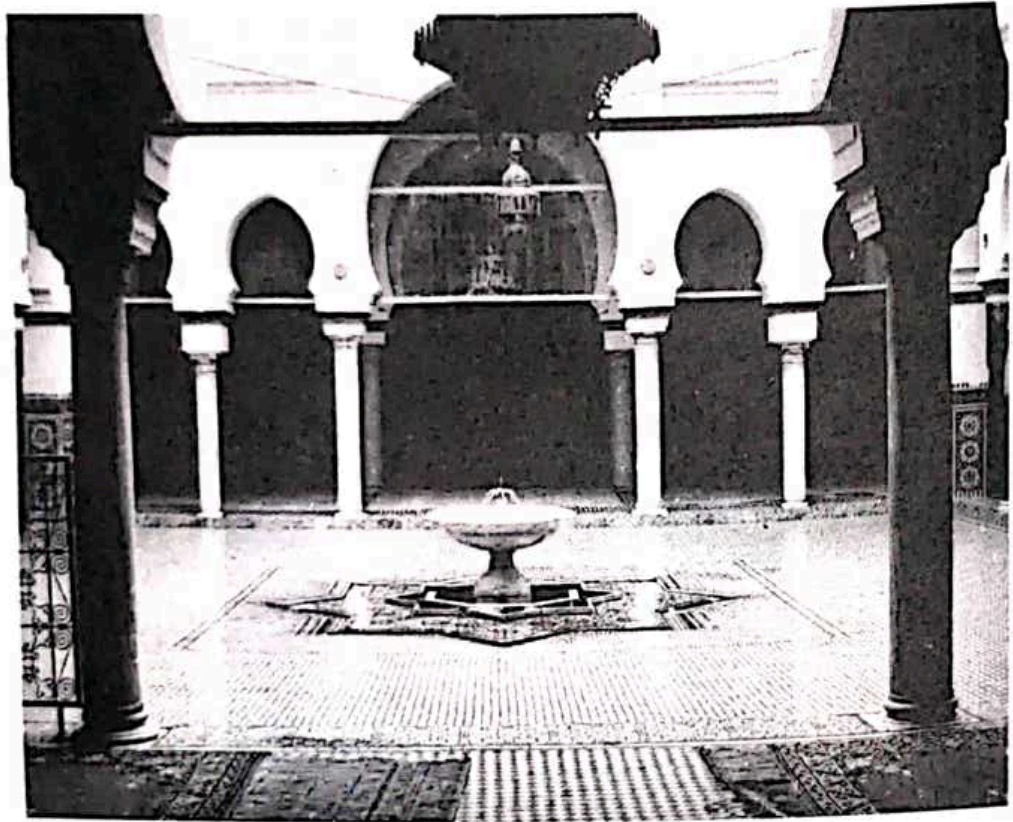
চিত্র নং-৩০
কারাউন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণের ফোয়ারা (মরক্কো)

মুসলিম সমাজের দরিদ্র ঘরগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন উইল ডুরান্ট। তিনি বলেছেন, তখনকার দিকে দরিদ্রদের ঘরগুলোও ছিল—এখনো যেমন রয়েছে—আয়তক্ষেত্রকার; মাটি দিয়ে সংযুক্ত ইটের কাঠামোতে তৈরি, ছাদে থাকত মাটির মিশ্রণ, উদ্ভিদের অংশ, গাছের ডাল, খেজুরগাছের

৯৫. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৭।

ডাল ও খড়। এগুলোর চেয়ে উন্নত এক শ্রেণির ঘর ছিল, সেগুলোর ভেতর দিকে থাকত উন্মুক্ত উঠান, পানির ছোট হাউজ, কখনো কখনো গাছও থাকত। মাঝে মাঝে এসব ঘরে থাকত একগুচ্ছ কাঠের খুঁটি, ঘরের কামরাগুলো ও উঠানের মাঝ বরাবর থাকত বারান্দা।[৯৬]

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, উসমানি খেলাফতের যুগে কেবল বেলগ্রেডেই[৯৭] ছিল ছয়শ পাবলিক ফোয়ারা।[৯৮]

গত কয়েক বছর ধরে মরোক্কান কর্তৃপক্ষ ফেজ শহরের প্রাচীন ফোয়ারাগুলোর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। যে পরিসংখ্যান বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ফেজের সড়কগুলোতে সত্তরটি পাবলিক ফোয়ারা পাওয়া গেছে। পুরোনো আবাসিক ভবন, মসজিদ ও মাদরাসার অভ্যন্তরীণ আঙিনায় পাওয়া গেছে প্রায় চারশ ফোয়ারা। ঐতিহাসিক উৎসগুলো নির্দেশ করে যে, এই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহরে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে এসব ফোয়ারা ছিল। পানির জন্য সব মানুষ এসব ফোয়ারার ওপর নির্ভরশীল ছিল; নিজেরা পানি পান করত, পশুপাখিদের পান করাতো এবং বাগানেও পানি সেচ দিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, প্রায় দশ শতাব্দী আগে ফেজ শহরে পানি-সরবরাহের যে জটিল সিস্টেম ছিল তার সঙ্গে এসব ফোয়ারার অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৯৯]

সেই সময় ফোয়ারা কেবল আভিজাত্য ও বিলাসিতার বিষয় ছিল না, বরং পানি ব্যবহারে ইসলামি সভ্যতার যে দর্শন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল এটি। এই দর্শনের মূলকথা হলো, ব্যবহারিক দিকগুলোর সঙ্গে আত্মিক ও অনুভূতিগত উপভোগের দিকগুলোর সমন্বয় সাধন।[১০০]

গ্রানাডার জান্নাতুল আরিফে ফোয়ারাগুলো থেকে পানি উচ্ছলিত ধারায় প্রবাহিত হতো। পানির হাউজের কিনারা-সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ দক্ষতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। ফোয়ারার উচ্ছলিত পানি নিচের হাউজে পড়ার সময় অর্ধবৃত্তাকার তরঙ্গ সৃষ্টি করত। এই শিল্পরীতি একটি ইসলামি সংযোজন,

---

৯৬. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ২৪১।
৯৭. সার্বিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।
৯৮. *জারিদাতুশ শারকিল আওসাত*, তারিখ : ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৮।
৯৯. *জারিদাতুশ শারকিল আওসাত*, তারিখ : ২৭ শে অক্টোবর, ২০০২।
১০০. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৭।

ইতিপূর্বে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।[১০১] পানির হাউজগুলোতে মাঝেমধ্যে নানা জাতের মাছ থাকত বা বিভিন্ন ধরনের পাখি থাকত, যেমন হাঁস। এসব হাউজের পাশে অবস্থিত ফোয়ারাগুলো পানির উপরিভাগে কীটপতঙ্গ জন্মাতে দিত না। এসব ফোয়ারা বাতাসে জলকণা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজেও ব্যবহৃত হতো, সম্ভবপর সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিটিয়ে দিয়ে বায়ুকে কোমল ও সজীব রাখত।[১০২]

পাবলিক ফোয়ারাগুলো প্রতীকী, নন্দনতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক–এই তিনটি দিকের সম্মিলন ঘটিয়েছিল। এগুলোতে পানির সবচেয়ে চমৎকার ব্যবহার চোখে পড়ত। এসব সৃজনশীল ও নান্দনিক কাজের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলো পাওয়া যেত মসজিদের চত্বরে। বলকান অঞ্চল যখন উসমানি খেলাফতের ছায়াতলে ছিল তখন সেখানে এসব নান্দনিক কাজের শ্রেষ্ঠ নমুনা তৈরি হয়েছে। যেমন : মুহাম্মাদ কুসকি পাশা মসজিদ[১০৩], হারতাদাউস বেগ মসজিদ, কাইনাইনিচে অবস্থিত সিনান পাশা মসজিদ, বাইচায় অবস্থিত সুলতান ইসমি মসজিদ, স্কপিয়েতে[১০৪] অবস্থিত মুস্তাফা পাশা মসজিদ, সারায়েভোতে[১০৫] গাজি খসরু বেগ (হুরসেভ বেগ) মসজিদ, ফোচায়[১০৬] অবস্থিত আলাজা মসজিদ (Aladža Mosque)– এগুলোর ফোয়ারাসমূহ। ফোয়ারাকে বিশ্বজুড়ে মুসলিম শহরগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, বিশেষ করে বলকানে। ফোয়ারাগুলোর পানি পানের উপযুক্ত, অজু ও গোসলের কথা তো বলাই বাহুল্য।[১০৭]

---

[১০১]. সালমা খাদরা জাইয়ুশি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, খ. ২, পৃ. ১৪৩৩।

[১০২]. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৭-২১৮।

[১০৩]. বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ার মোস্তার শহরে অবস্থিত। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।-অনুবাদক

[১০৪]. উত্তর মেসিডোনিয়ার রাজধানী স্কপিয়ের পুরোনো বাজারে অবস্থিত।-অনুবাদক

[১০৫]. বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ার রাজধানী।-অনুবাদক

[১০৬]. ফোচা (Foča) : বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ার একটি শহর।-অনুবাদক

[১০৭]. আবদুল বাকি খলিফা, *আল-আসারুত তারিখিয়্যাহ ফিল-বালকান*, *জারিদাতুশ শারকিল আওসাত*, তারিখ : ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৮।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য

আল্লাহ তাআলা মানুষ সুন্দর ও শোভনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোত্তম গঠনে ও শ্রেষ্ঠ অবয়বে মানুষের আকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে (দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে) সুন্দরতম গঠনে।[১০৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ○ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে (সেই আকৃতিতে) গঠন করেছেন।[১০৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে যে শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে দিয়েছেন তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সেগুলোকে আমি তার শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।[১১০]

---

১০৮. সুরা তিন : আয়াত ৪।

১০৯. সুরা ইনফিতার : আয়াত ৭-৮।

১১০. সুরা কাহফ : আয়াত ৭।

কুরআনুল কারিমে সুন্দর ও পরিপাটি থাকা এবং সাজ গ্রহণের নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিক বিশ্বে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের যা দান করেছেন তা উপভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন। যারা এর বিরোধিতা করে তাদের মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এই আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ○ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

হে বনি আদম, প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে[১১১], আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। বলে দিন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলে দিন, এইসব তাদের জন্য যারা পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে ঈমান আনে।[১১২] এইভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি।[১১৩]

ইসলাম মানুষকে সুন্দর ও পরিপাটি থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এর অর্থ এই যে, ইসলামের উদ্দেশ্য কেবল পরিবেশের ও স্বাস্থ্যগত সৌন্দর্য, যেমন : দেহ ও পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করা নয়, বরং এর চেয়েও বেশি চারিত্রিক মাধুর্য ও আচার-আচরণের সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উদ্দেশ্য। ইসলামের মানবিক সভ্যতায় এ দিকটি বাস্তবায়িত

---

১১১. হজ ও উমরার সময় কাফেররা উলঙ্গ হয়ে কাবার তাওয়াফ করত। এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধি মোতাবেক পোশাক পরে ইবাদত করতে।-অনুবাদক

১১২. আল্লাহপ্রদত্ত জীবিকা গ্রহণ করে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। এই হিসেবে দুনিয়ার সবকিছু অনুগত বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু কাফেরদের এইসব বস্তু থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। অবশ্য আখেরাতে তাদের কোনো অংশ থাকবে না।-অনুবাদক

১১৩. সুরা আরাফ : আয়াত ৩১-৩২।

হয়েছে ও পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং মানবিক সৌন্দর্য দুই প্রকারের :

১. বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং

২. অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক সৌন্দর্য।

এই পরিচ্ছেদে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পরিবেশ ও দৃশ্যমান বস্তুরাশির সৌন্দর্য নিয়ে আলোকপাত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : শরীরের সৌন্দর্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পোশাকের সৌন্দর্য

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ঘরবাড়ি, পথ ও শহরের সৌন্দর্য

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সুন্দর রুচিবোধ

প্রথম অনুচ্ছেদ

শরীরের সৌন্দর্য

এ ব্যাপারটি কারও অজানা নয় যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এবং এগুলোর ব্যাপারে গুরুত্বপ্রদান মানবসভ্যতার সবচেয়ে উজ্জ্বল একটি দিক। ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য বা বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে যা-কিছু বোঝায় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা।

বাস্তবতা এই যে, ইসলাম এই ক্ষেত্রে এক অলৌকিক জীবনধারার প্রবর্তন করেছে। এই জীবনধারায় শরীর, মন ও সমাজই সুরক্ষিত থাকে না কেবল, বরং গোটা মানবতাই সুরক্ষিত থাকে। এমনকি কুরআনুল কারিম নির্দেশনা দিচ্ছে যে,

﴿يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

যারা পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।[১১৪]

﴿يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন।[১১৫]

অর্থাৎ, যারা নোংরা-ময়লা ও অশুচিতা থেকে পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।[১১৬]

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন যে,

«اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ»

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[১১৭]

---

১১৪. সুরা বাকারা : আয়াত ২২২।

১১৫. সুরা তাওবা : আয়াত ১০৮।

১১৬. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ১, পৃ. ৫৮৮।

এই হাদিসের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম যা-কিছু বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য এই যে, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার জন্য ঈমানের যে সওয়াব তার অর্ধেক পর্যন্ত সওয়াব দেওয়া হবে।[১১৮]

এখানে একটি বিষয়ে সবার দৃষ্টি আর্কষণ করা সংগত মনে করি, ইসলামের এসব নির্দেশনা ছিল এমন যুগে যখন নোংরামি ও অপরিচ্ছন্নতা ছিল ইউরোপীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের লোকেরা তখন বছরে একবার বা দুইবারের বেশি গোসল করত না![১১৯] নোংরামি এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে দেহে ও কাপড়চোপড়ে লেগে থাকা ময়লা-আবর্জনাকে 'বরকত' মনে করা হতো এবং ভাবা হতো যে এসব ময়লা শরীরের শক্তিবর্ধক।

ঠিক এই সময়টাতে ইসলামি জীবনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, তা মুসলিমদের পবিত্রতা, ক্ষেত্রভেদে গোসলের আবশ্যকতা ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ, ক্ষেত্রভেদে গোসল ছাড়া তাদের শরীরের পবিত্রতা অর্জিত হবে না এবং অজু ছাড়া নামায হবে না। আর অজু দৈনিক পাঁচবার করতে হতে পারে।

জানাবাতের সময়[১২০] ও ঋতুস্রাব শেষে এবং অন্যান্য কিছু সময়ে গোসল আবশ্যক। দুই ঈদ, হজের জন্য ইহরাম বাঁধা ও অন্যান্য সময়ে গোসল মুস্তাহাব। জুমআর দিন গোসল ওয়াজিব (আবশ্যক) নাকি মুস্তাহাব—এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে প্রণিধানযোগ্য মত এই যে, জুমআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব। আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«غُسْلُ يَوْمِ الْـجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ»

---

১১৭. *মুসলিম*, কিতাব : তাহারাত, বাব : ফাদলুল অজু, হাদিস নং ২২৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২২৯৫৩।

১১৮. ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ*, খ. ৩, পৃ. ১০০।

১১৯. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫৪।

১২০. শরীরের এমন অবস্থা যখন শরয়ি ও ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে গোসল ফরয বা আবশ্যক।

জুমআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কর্তব্য হলো গোসল করা ও মিসওয়াক করা এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি ব্যবহার করা।[১২১], [১২২]

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই গোসলের মাঝখানে সর্বোচ্চ কতদিন সময় থাকবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর (আল্লাহ তাআলার) হক এই যে, প্রতি সাত দিনে একদিন সে গোসল করবে, সেদিন সে তার মাথা ও শরীর ধুয়ে নেবে।[১২৩]

কতিপয় ফকিহ বিভিন্ন প্রকারের গোসলের কথা বলেছেন, এমনকি তারা সতেরো প্রকারের গোসল নিয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে গোসলের গুরুত্বের ব্যাপারটি বোঝা যায়। ইসলাম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে আহ্বান জানিয়েছে, যেসব অঙ্গে রোগ-ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং যেগুলো বেশি বেশি নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে।

পবিত্রতার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি : এক. ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা; দুই. পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার নির্দেশ এবং তিন. পরিপাট্য ও সাজসজ্জার ব্যাপারে নির্দেশনা, এটা পরিচ্ছন্নতারও অধিক।

মুসলিমরা জানে যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে অবহেলা ও শিথিলতা দেখানো শাস্তির কারণ। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১২১]. এগুলোর বিধান ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত। দেখুন, ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৩৫; আল-মুনাবি, *ফাইদুল কাদির*, খ. ৪, পৃ. ৫৪১।

[১২২]. *বুখারি*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : আত-তিবু লিল জুমুআতি, হাদিস নং ৮৪০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : আত-তিব ওয়াস-সিওয়াক ইয়াওমাল জুমুআ, হাদিস নং ৮৪৬।

[১২৩]. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : হাল আলা মান লা ইয়াশহাদিল জুমুআ গুস্ল.., হাদিস নং ৮৫৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাবঃ আত-তিব ওয়াস-সিওয়াক ইয়াওমাল জুমুআ, হাদিস নং ৮৪৯।

ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কবর দুটিতে তাদের বাসিন্দাদের ওপর কী ঘটছে তা তিনি তার সঙ্গীদের জানালেন। তার বক্তব্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ»

নিশ্চয় এই দুইজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো বিষয়ে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তাদের একজন পেশাব থেকে নিজেকে পবিত্র রাখত না এবং অপর মানুষের গিবত (পরচর্চা) করে বেড়াত।[১২৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি লোককে দেখলেন যে, তার মাথার চুল উশকোখুশকো এবং দাড়ি অপরিপাটি। তিনি লোকটিকে 'বেরিয়ে যাও' বলে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। যেন তিনি তাকে চুল-দাড়ি ঠিক করে আসতে বললেন। লোকটি চলে গেল এবং চুল ও দাড়ি সুন্দর করে পরিপাটি করে আবার এলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ»

তোমাদের কারও শয়তানের মতো উশকোখুশকো মাথা নিয়ে আসার চেয়ে এভাবে (পরিপাটি হয়ে) আসাই কি ভালো না![১২৫]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীরের সেসব জায়গাও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন যেখানে ঘাম ও ময়লা জমে এবং রোগজীবাণুর জন্ম হয়। বরং তিনি এটিকে মানুষের স্বভাবজাত রীতি বা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১২৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-অজু, বাব : মিনাল কাবাইরি আল-লা ইয়াসতাতিরা মিন বাওলিহি, হাদিস নং ২১৩; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাহারা, বাব : আদ-দালিল আলা নাজাসাতিল বাওলি ওয়া উজুবিল ইসতিবরাই মিনহু, হাদিস নং ২৯২।

১২৫. মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুআত্তা*, ইয়াহইয়া লাইসি থেকে বর্ণিত, হাদিস নং ১৭০২।

«خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»

পাঁচটি বিষয় মানুষের স্বভাবজাত : খতনা করা, নাভির তলদেশের পশম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, বগলের পশম পরিষ্কার করা এবং মোচ ছোট রাখা।[১২৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তা বোঝা যায় নিম্নলিখিত হাদিস থেকে,

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»

যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদের জন্য প্রতিবার অজুর সময় মেসওয়াক করা বাধ্যতামূলক করে দিতাম।[১২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মেসওয়াক করার ব্যাপারে আমরা এত বেশি নির্দেশ পেতাম যে, আমাদের মনে হলো এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হবে।[১২৮]

এতকিছুর পর এ ব্যাপারে আমাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলামি সভ্যতার যুগে শহরগুলোর সব প্রান্তে গণগোসলখানা নির্মাণ করা হয়। যা এসব শহরের স্থাপত্যের দিকটি আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলে। জার্মান প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে এই ব্যাপারে ওই সময়ের ইসলামি সভ্যতা এবং ইউরোপের অবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আন্দালুসীয় ফকিহ তারতুশি ফিরিঙ্গিদের (ইউরোপের) দেশগুলো ভ্রমণকালে যেসব অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তা শুনলে গা শিউরে ওঠে। তিনি একজন মুসলিম, যার জন্য গোসল এবং দৈনিক পাঁচবেলা অজু করার বিধান রয়েছে। তারতুশি কী বলছেন শুনুন,

---

১২৬. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-লিবাস, বাব : কাসসুশ শারিব, হাদিস নং ৫৫৫০; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাহারা, বাব : খিসালুল ফিতরা, হাদিস নং ২৫৭।

১২৭. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : আস-সিওয়াক ইয়াওমাল জুমুআ, হাদিস নং ৮৪৭; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৮৪০।

১২৮. ইবনে আবি শাইবা তার *মুসান্নাফে* বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং ১৭৯৩।

তুমি কখনো এদের চেয়ে বেশি নোংরা কাউকে পাবে না। এরা নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে না, শীতল পানি দিয়ে বছরে বড়জোর একবার বা দুইবার গোসল করে। এরা এদের কাপড়চোপড় পরিধানের পর আর কখনো ধৌত করে না, এই অবস্থাতেই কাপড়গুলো জীর্ণ ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সিগরিড হুংকে আরও বলেছেন, নোংরামির এই ব্যাপারগুলো সংস্কৃতিমান ও রুচিশীল আরবদের পক্ষে বোধগম্য করা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং তারা নিতেও পারবে না। কারণ আরবদের জন্য শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা কেবল ধর্মীয় দিক থেকে আবশ্যক নয়, বরং গরম আবহাওয়ায় বসবাসের ফলেও তা অতি জরুরি। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাগদাদে হাজার হাজার গরম জলের গোসলখানা ছিল। গোসলখানাগুলোতে ছিল পর্যাপ্ত কর্মচারী। তারা আগন্তুকদের খেজুরগাছের ছোবড়া দিয়ে দলাইমলাই করত এবং চুল কেটে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিত।[১২৯]

আমরা বলতে পারি, গরম আবহাওয়ায় যে অবস্থা বিরাজমান থাকে তার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক, তবে নদীনালা ও পানির উৎস না থাকার বিষয়টি সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের সাপ্তাহিক ও দৈনিক শৃঙ্খলার ওপর কঠোর জোর না দেওয়ার জন্য একটি যৌক্তিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে। অন্যদিকে ইউরোপের পুরো অঞ্চলটা শীতপ্রধান নয়। উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এলাকাও রয়েছে। গোটা ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রচুর নদীনালা ও খালবিল। তারপরও তারা অপরিচ্ছন্নতাকে তাদের মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছিল এবং ময়লা-আবর্জনা ছিল গর্বের বিষয়।

ইসলাম কেবল পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা নয়, তারও অধিক পরিপাট্য ও সাজসজ্জা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশ করা হয়েছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি সুগন্ধি ভালোবাসেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

---

১২৯. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫৪।

* তোমাদের দুনিয়ার মধ্য থেকে আমার কাছে প্রিয় হলো নারী ও সুগন্ধি। আর নামাযে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা।[১৩০] *

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ—তাকে সুগন্ধি দেওয়া হলে তিনি তা ফিরিয়ে দিতেন না।[১৩১] বরং তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। বলেন,

«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ»

কাউকে সুগন্ধি (উপহার) দেওয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ, সুগন্ধি বহন করা সহজসাধ্য এবং ঘ্রাণও চমৎকার।[১৩২]

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি কালো চাদর বানানো হলো। তিনি তা পরিধান করলেন। পরে তার শরীর ঘামলে চাদর থেকে পশমের গন্ধ বের হলো। তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন।[১৩৩]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম আনাস ইবনে মালিক রা. তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এভাবে,

«وَلاَ مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

আমি এমন কোনো রেশমি বস্ত্র স্পর্শ করিনি যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের তালু থেকে নরম এবং এমন কোনো মিশক ও আম্বরের ঘ্রাণ গ্রহণ করিনি যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (শরীরের) ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম।[১৩৪]

---

১৩০. *নাসায়ি*, কিতাব : ইশরাতুন নিসা, বাব : হুব্বুন নিসা, হাদিস নং ৩৯৪০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৪০৬৯।

১৩১. *নাসায়ি*, কিতাব : জিনাত, বাব: আত-তিব, হাদিস নং ৫২৫৮। *মুসনাদে আহমাদ*, ১২১৯৭।

১৩২. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আলফায মিনাল-আদাব ও গাইরিহা, বাব : ইসতি'মালুল মিসক..., হাদিস নং ২২৫৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৯১।

১৩৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-লিবাস, বাব : *আস-সাওয়াদ*, হাদিস নং ৪০৭৪।

১৩৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : তিবু রায়িহাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া লিনি মাসসিহি ওয়াত-তাবাররুক বি-মাসহিহি, হাদিস নং ২৩৩০।

এসব কারণেই পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা মুসলিমদের কাছে একটি দ্বীনি বিষয়। এর বাস্তবায়ন করে তারা প্রতিদান ও সওয়াবের আশা করেন এবং তারা মনে করেন যে, এভাবে তারা তাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পোশাকের সৌন্দর্য

পরিধেয় বস্ত্র বা পোশাকের ব্যাপারেও ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোশাক যেমন তার মালিকের জন্য ভালো, তেমনই তার পাশে যারা রয়েছে তাদের জন্যও ভালো। বরং অপরিচিত ব্যক্তিরা যারা তাকে দেখে তাদের জন্যও ভালো।

কুরআনুল কারিম পোশাকের নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে পোশাক লজ্জাস্থান আবরিত রাখে এবং তা শোভাও।

মানুষের স্বভাবই এমন যে তা সবসময় শরীরের গোপনীয় অংশ ঢেকে রাখতে উদ্গ্রীব। তবে পশুপাখির মধ্যে এ ব্যাপারটি নেই। মানুষের এই স্বভাব কেবল সুন্দর বিষয় নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। আদম আ. ও তার স্ত্রী গাছের ফল খাওয়ার পর তাদের শরীর অনাবৃত হয়ে পড়ে। যখন হুঁশ ফিরে পান,

﴿طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾

জান্নাতের পাতা দ্বারা তারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলেন।[১৩৫]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আদি পিতা ও মাতা পাতা দিয়ে শরীরের এমন গোপনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করছিলেন যা প্রকাশিত হয়ে পড়লে মানুষ স্বভাবগত কারণেই লজ্জা পায়। মানুষের এই স্বভাবে বিপর্যয় ঘটলেই কেবল তারা নিজেদের নগ্ন ও উন্মোচিত করতে পারে।[১৩৬]

সুতরাং, পোশাক মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল স্বভাবগত বিষয় এবং জীবনযাপনের অতি আবশ্যক উপাদানগুলোর অন্যতম। তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নেয়ামতও বটে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের দৃষ্টি

---

[১৩৫]. সুরা আরাফ : আয়াত ২২।

[১৩৬]. সাইয়িদ কুতুব, *তাফসির ফি যিলালিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১২৬৯।

আকর্ষণ করেছেন যে, পোশাক যেমন বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে, উপরন্তু অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য গ্রহণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾

> হে বনি আদম, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ,[১৩৭] এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।[১৩৮]

শুরুর দিকে কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা পাই, ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾—'তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো।'[১৩৯] যেদিন কুরআন মানুষের জন্য প্রথম নাযিল হয়েছে সেদিন থেকেই ইসলাম মানুষের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, যেমন অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআন তাওহিদকে মানুষের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে, বলছে,

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

> এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো।[১৪০]

এখানে পবিত্রতা বাহ্যিকভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে যেমন জরুরি, তেমনই পাপাচার ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে জরুরি। ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, আয়াতটি অন্তরের পবিত্রতার পাশাপাশি সব ধরনের পবিত্রতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আরবরা পোশাক বলতে সব ধরনের পবিত্রতা বুঝে থাকে।[১৪১]

---

১৩৭. তাকওয়ার পরিচ্ছদ অর্থাৎ সৎকাজ ও আল্লাহভীতি।

১৩৮. সুরা আরাফ : আয়াত ২৬।

১৩৯. সুরা মুদ্দাসসির : আয়াত ৪।

১৪০. সুরা মুদ্দাসসির : আয়াত ৩-৪।

১৪১. ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, খ. ৮, পৃ. ২৬৩।

আল্লাহ তাআলা সাজসজ্জা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

> হে বনি আদম, প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না।[১৪২]

পরবর্তী আয়াতে যারা আল্লাহ যা-কিছু শোভনীয় করেছেন তা নিষিদ্ধ করতে চায় তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

> বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?[১৪৩]

কতিপয় আলেম আয়াতটি বোঝার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছেন। তারা শর্ত দিয়েছেন যে, শরীরের নাপাকি গোলাপজল দিয়ে ধৌত করতে হবে। যেমন ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি তার তাফসিরগ্রন্থে তাদের এরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আল্লাহর এই ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾—'তোমরা নামায কায়েম করো' বাণীতে আমাদের নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সালাত বা নামায বলতে দোয়া বোঝায়। তা তো করাই হয়, কারণ আদিষ্ট বিষয় আদায়ের দ্বারাই দায়িত্ব পালন করা হয়। এই দলিলের দাবি এই যে, নামাযের শুদ্ধতা সতর বা লজ্জাস্থান ঢাকার ওপর নির্ভরশীল নয়। (যেহেতু এই আয়াতে শুধু নামাযের কথা বলা হয়েছে, পোশাকের কথা বলা হয়নি।) তবে আমরা এই অর্থ (পোশাক পরিধানের বিধান) গ্রহণ করেছি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপর আমল করার জন্য,

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

---

১৪২. সুরা আরাফ : আয়াত ৩১।
১৪৩. সুরা আরাফ : আয়াত ৩২।

প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।[১৪৪]

পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত পর্যায় মেনে নিয়ে গোলাপজল দিয়ে ধোয়া পোশাক পরিধানের অর্থ হলো সাজ গ্রহণ বা শোভামণ্ডিত হওয়া। সুতরাং এমন পোশাক পরিধানই নামাযের শুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক।[১৪৫]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে ময়লা কাপড়ে দেখলেন। দেখে বললেন,

«أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟!»

এই লোক তার কাপড় ধোয়ার মতো কোনো পানি পায়নি?[১৪৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক পরিধান করতেন। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ নির্দেশও দিয়েছেন,

«الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ»

তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কারণ তা অধিকতর পবিত্র ও চমৎকার।[১৪৭]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতে দুটি অবস্থান রয়েছে যা নিয়ে চিন্তাভাবনা জরুরি, এমন ব্যক্তির অবস্থান যিনি সৌন্দর্য অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং এ ব্যাপারে এতটা উৎসাহী যে এই আশঙ্কাও করেন তা অহংকারের পর্যায়ে পড়ে কি না, আরেক ব্যক্তির অবস্থান যিনি সে ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»

যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

---

১৪৪. সুরা আরাফ : আয়াত ৩১।

১৪৫. ইমাম রাযি, *আত-তাফসিরুল কাবির*, খ. ১৪, পৃ. ২৩২।

১৪৬. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-লিবাস, বাব : গুসলুস সাওব ওয়াল-খুলকান, হাদিস নং ৪০৬২।

১৪৭. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০১৬৬, ২০২১৩, ২০২৩১।

তখন এক ব্যক্তি বলল, যে লোক পছন্দ করে যে তার পোশাক চমৎকার হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, সেও কি এই শ্রেণিতে পড়বে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ؛ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্য অস্বীকার করা ও মানুষকে অবজ্ঞা করা।[১৪৮]

ইসলাম একটি সূক্ষ্ম সমীকরণ প্রস্তুত করেছে, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রতি আকুলতা এবং একইসঙ্গে তা যেন আত্মার ওপর প্রভাব না ফেলে এবং অহংকারের দিকে ঠেলে না দেয় সে ব্যাপারে ব্যাকুলতা। অহংকার হলো অন্যদের তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা ও হেয়জ্ঞান করা এবং নিজেকে অন্যদের বিবেচনায় বড় মনে করা। আপনি সৌন্দর্যের প্রতিভূ হতে পারেন, এতে কোনো বাধা নেই, কারণ আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য ভালোবাসেন; কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অণু পরিমাণ অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ এক অণু অহংকারও আপনার জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবে।

তবে এই ব্যাপারে এতটা ভীতি ও সতর্কতা থাকা ঠিক নয় যা সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাকে পরিপূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। এখানে আমরা রাসুলের জীবনচরিতের দ্বিতীয় অবস্থানটি তুলে ধরছি। আবুল আহওয়াস আওফ তার পিতা মালিক ইবনে নাদলাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি জীর্ণ পোশাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তিনি বললেন, أَلَكَ مَالٌ؟–'তোমার কি ধনসম্পদ নেই?'

আমি বললাম, 'জি, আছে।'

তিনি বললেন, مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟–'কী কী ধনসম্পদ আছে?'

আমি বললাম, 'উট, ভেড়া-ছাগল, ঘোড়া, দাস-দাসী সবই আছে।' তখন তিনি বলেন,

«فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ»

---

১৪৮. *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : তাহরিমুল কিব্‌র ওয়া বায়ানুহু, হাদিস নং ৯১।

> আল্লাহ যখন তোমাকে মাল দিয়েছেন তখন তোমার গায়ে যেন আল্লাহর নেয়ামত ও বদান্যতার আলামত প্রকাশ পায়।[১৪৯]

ইসলাম এভাবে শিথিলতা ও কঠোরতা এবং অহংকার ও নোংরামির মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তিনি চান তার বান্দাদের গায়ে তার নেয়ামতের নিদর্শন থাকুক। কিন্তু তিনি যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার রয়েছে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। এ ব্যাপারটি আমরা জেনেছি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বক্তব্য থেকে। তিনি আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর পক্ষ থেকে দূত হিসেবে হারুরিয়্যা খারিজিদের[১৫০] সঙ্গে আলোচনা করতে এবং সত্যটাকে তাদের বুঝিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব পালনের জন্য তার কাছে থাকা শ্রেষ্ঠ পোশাকটি বাছাই করেছিলেন। ইমাম আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারুরিয়্যা খারিজিরা বিদ্রোহ করলে আমি আলি রা.-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, তুমি এই দলটির কাছে যাও এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করো। তখন ইয়ামেনের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করলাম।—আবু যুমাইল (সিমাক ইবনুল ওয়ালিদ আল-হানাফি) জানিয়েছেন, ইবনে আব্বাস ছিলেন সুদর্শন ও শুভ্রোজ্জ্বল মানুষ।—ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি তাদের কাছে এলাম। তারা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, তোমাকে স্বাগতম হে ইবনে আব্বাস। এই পোশাকটি কী? আমি বললাম, (এত সুন্দর ও দামি পোশাকের জন্য) তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরতে দেখেছি।[১৫১]

পোশাক-পরিচ্ছদ ও তার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এতটা বেশি ছিল যে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো মুসলমানের ময়লা কাপড়ে মসজিদে আসা, বিশেষ করে জুমআর নামাযে আসা অপছন্দ করতেন।

---

[১৪৯] [illegible], হাদিস নং ৫২২৪।

[১৫০] [illegible] নামের সঙ্গে সংগতি রেখে খারিজিদের এ [illegible]

[১৫১] [illegible], হাদিস নং ৪০৩৭।

এমনকি যারা সপ্তাহজুড়ে কাজ করে এবং কাজের ফলে জামাকাপড় ময়লা হয়ে যায় তিনি তাদের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। তারা যেন জুমআর নামাযের জন্য আলাদা পরিচ্ছন্ন পোশাক রাখে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জুমআ

«مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ؟»

তোমাদের কেউ যদি তার জুমআর দিনে দৈনন্দিন পরিধানের কাপড় দুটি ছাড়া ভিন্ন দুটি কাপড় পরে তাহলে সমস্যা কী?[১৫২]

ফকিহগণ কাপড়ে কোনো ধরনের নাপাকি (নাপাক বস্তু) লাগার দ্বারা কাপড়কে নাপাক বিবেচনা করেন। যেমন : পেশাব, পায়খানা, রক্ত। নাপাক দূর করা (ভালো করে ধোয়া) ব্যতীত এমন পোশাক পরে নামায সহিহ-শুদ্ধ হবে না। এমনকি নাপাকির পরিমাণ অল্প হলেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, যে কাপড়ে পেশাব বা পায়খানা লেগেছে এমন কাপড় পরে নামায পড়লে নামায পুনরায় পড়তে হবে, সেই নাপাকির পরিমাণ কম হোক বা বেশি।[১৫৩]

ইমাম মুনাবি এই প্রসঙ্গের একটি উপসংহার টেনেছেন এবং বলেছেন, পোশাক ও শরীরের পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি শরয়ি দিক থেকে যেমন, তেমনই বিবেক ও প্রথার দিক থেকেও জরুরি...। শাইখুল ইসলাম বুরহান ইবনে আবু শরিফ রহ.-এর পোশাক ও কাপড়চোপড় থাকত অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও শুভ্র; তা এতটা বেশি যে, তখনকার যুগে রাজা-নৃপতিরাও এত শুভ্র ও পরিপাটি পোশাক পরতেন না। পোশাকের সঙ্গে তাকে মনে হতো একটি আলোকখণ্ড।

পরিচ্ছন্নতা মানুষের চোখে সমীহ বাড়িয়ে দেয়, তাদের মনে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে। 'দরিদ্রদের' একটি শ্রেণি পরিচ্ছন্নতার দিকটি উপেক্ষা করে চলে, গুরুত্বই দেয় না। তাদের কারও কারও কাপড়চোপড় এতটাই নোংরা হয়ে পড়ে যে, বিবেক ও প্রথা উভয় দিক থেকে তার নিন্দা করা যায়। শয়তান তাদের কাছে পরিচ্ছন্নতার দিকটি অপ্রয়োজনীয় করে তোলে এবং

---

১৫২. *আবু দাউদ*, কিতাব : আস-সালাহ, বাব : আল-লুবসু লিল-জুমুআহ, হাদিস নং ১০৭৮; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১০৯৬।

১৫৩. দেখুন, *মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ*, পৃ. ৪১। তিনি ছাড়া অন্যান্য ইমাম ও ফকিহের মতও এটি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে দেয় না। শয়তান মন্ত্রণা দেয়, আগে অন্তর পরিষ্কার করো, তারপর পোশাক পরিষ্কার করা যাবে। শয়তান তো এদের কল্যাণ চায় না, বরং আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে যারা ওঠাবসা করে তাদের হক আদায় করতে দেয় না এবং মজলিসের সৌজন্য সে রক্ষা করতে পারে না, যেহেতু মজলিসে পরিচ্ছন্নতাই কাম্য। তারা যদি যাচাই করে দেখত তাহলে বুঝতে পারত যে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারই নিয়ামক। বর্ণিত হয়েছে যে, এ কারণে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক কখনো নোংরা হতো না। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শরীর থেকে সবসময় ঘ্রাণ বের হতো।[১৫৪]

---

১৫৪. মুনাবি, ফয়জুল কাদির, খ. ২, পৃ. ২৮৫।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বাড়িঘর, পথ ও শহরের সৌন্দর্য

বাড়িঘর, পথ ও শহর মিলে একটি পরিমণ্ডল তৈরি করে, যেখানে মানুষ বসবাস করে। আজকের যুগের মানবসভ্যতা এই পরিমণ্ডলকে 'পরিবেশ' নামে জানে।

এখানে একটি ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা এই পরিমণ্ডলের সৌন্দর্যকে পৃথিবীতে মানব-অস্তিত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সালিহ আ.-এর জবানিতে বলেন,

«هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»

> তিনি তোমাদেরকে ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন।[১৫৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন, অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের পৃথিবীতে আবাদকারী বানিয়েছেন, তোমরা পৃথিবীর মাটি আবাদ করবে এবং ফসল ফলাবে।[১৫৬]

যায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন, 'তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন' কথাটির অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বসবাসের জন্য তোমাদের যা-কিছু প্রয়োজন—ঘরবাড়ি নির্মাণ, গাছপালা রোপণ, বীজ বোনা ও ফসল ফলানো—এ সবকিছু করার নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন। এটাও বলা হয় যে, তিনি তোমাদের মনের মধ্যে গাছপালা রোপণ ও ফসল ফলানো এবং নদীনালা খনন ও অন্যান্য কাজের প্রেরণা জুগিয়েছেন।[১৫৭]

---

১৫৫. সুরা হুদ : আয়াত ৬১।

১৫৬. আবু হাইয়ান আন্দালুসি, *তাফসিরুল বাহরিল মুহিত*, খ. ৫, পৃ. ২৩৬।

১৫৭. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ৪, পৃ. ৩৩১।

মুসলিমদের অন্তরে প্রোথিত ঈমানের সঙ্গে পথের একটি সামান্য সৌন্দর্যের বিষয়কে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে ঈমানের একটি অংশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ»

ঈমান সত্তরটিরও বেশি বা ষাটটিরও বেশি শাখায় বিভক্ত, শ্রেষ্ঠ শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।[১৫৮]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর অর্থ হলো যা-কিছু পথচারীকে কষ্ট দেয় বা কষ্ট দিতে পারে তা সরিয়ে রাখা বা দূরে ফেলে দেওয়া। তা হতে পারে পাথর বা ইটের টুকরো, হতে পারে কাঁটা বা অন্যকিছু।

কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়ার সওয়াব সদকার সওয়াবের অনুরূপ। আবু হুরাইরা রা. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«يُمِيطُ الأَذٰى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সদকা।[১৫৯]

কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া বরং এমন একটি কাজ, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১৫৮. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু আদাদি শুআবিল ঈমান ওয়া আফদালুহা ওয়া আদনাহা, হাদিস নং ৫৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৯১৩; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ১৬৬।

১৫৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : মান আখাযা বির-রিকাব ওয়া নাহবিহি, হাদিস নং ২৮২৭।

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»

এক লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, সে পথের ওপর একটি কাঁটাযুক্ত ডাল পেল, ডালটি সে সরিয়ে দিলো। আল্লাহ তাআলা তার কাজটি কবুল করে নিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[১৬০]

*ইবনে মাজাহ*র বর্ণনায় রয়েছে,

«كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ، فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ»

পথের ওপর একটি গাছের ডাল পড়ে ছিল, মানুষকে তা কষ্ট দিচ্ছিল। একজন লোক তা সরিয়ে দিলো। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো।[১৬১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ কাজ,

«عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ»

আমার সামনে আমার উম্মতের আমলসমূহ পেশ করা হলো, ভালো আমলও, খারাপ আমলও। আমি তাদের ভালো কাজের মধ্যে রাস্তা থেকে 'কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া'-ও পেলাম।[১৬২]

প্রখ্যাত সাহাবি আবু বুরযাহ আসলামি রা. একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ভালো কাজের কথা জানতে চাইলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমাকে এমন কাজের কথা বলুন, যার দ্বারা

---

১৬০. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : মান আখাযাল গুসনা ওয়া-মা ইয়ুযিন নাসা ফিত-তারিকি ফা-রামা বিহি, হাদিস নং ২৩৪০; মুসলিম, কিতাব : আল-ইমারাহ, বাব : বায়ানুশ শুহাদা, হাদিস নং ১৯১৪।

১৬১. *ইবনে মাজাহ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক, হাদিস নং ২৬৮২।

১৬২. *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস-সালাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল বুসাকি ফিল-মাসজিদি ফিস-সালাতি ওয়া-গাইরিহা, হাদিস নং ৫৫৩।

উপকৃত হব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব ছিল এরূপ,

«اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْـمُسْلِمِينَ»

মুসলিমদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।[১৬৩]

আমরা আরও বেশি হতবাক হয়ে যাই যারা পথের এই বিধান লঙ্ঘন করে তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী শুনে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ»

যে লোক মুসলিমদের চলার পথে কষ্ট দেয়, তার ওপর তাদের অভিসম্পাত আবশ্যক হয়ে যায়।[১৬৪]

ভেবে দেখেছেন কি! 'চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া' প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে সাতটি দলিল এখনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সবগুলো দলিলই আমরা সন্নিবিষ্ট করেছি তা বোঝাচ্ছি না। আমরা কোনো ধর্মাদর্শ, কোনো নীতি ও দর্শনের কথা জানি না, যা পথের সৌন্দর্যের ব্যাপারে এই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছে। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, এরকম কিছু ঘটেছে (অন্য কোনো ধর্মাদর্শ বা দর্শন রাস্তার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে), তবুও কেউ কি বলতে পারবে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রাখা ও যত্নশীল হওয়া গুনাহ মাফের ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে?

এখানে আরও একটি কাহিনি অনুধাবন করা যাক। একজন নারী সাহাবি, তার সম্পর্কে এতটুকুই জানি যে তিনি মসজিদ পরিষ্কার করতেন। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খোঁজ করলেন, তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। যখন জানলেন এই নারী মারা গেছেন, তিনি তাঁর সাহাবিদের তিরস্কার করলেন। কারণ, তারা সেই নারীর ব্যাপারটিকে

---

১৬৩. মুসলিম, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : ইযালাতুল আযা আনিত-তারিক, হাদিস নং ২৬১৮।

১৬৪. তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৩০৫১।

তুচ্ছভাবে দেখেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার মৃত্যুসংবাদ জানাননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي... دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا. فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا»

> তোমরা আমাকে তার খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। সাহাবিরা মহিলাটির কবরটি দেখিয়ে দিলেন। নবীজি (তার কবরের কাছে গেলেন এবং) তার জানাযার নামায আদায় করলেন।[১৬৫]

ইসলামের ইতিহাস এই নারীকে স্মরণীয় করে রেখেছে এবং তিনি সুনানের (হাদিসের) গ্রন্থাবলিতে অমর হয়ে রয়েছেন। তার কীর্তি তেমন কিছু নয়, তিনি শুধু মসজিদের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নশীল ছিলেন। তাই তিনি–কেবল ইসলামি জীবনদর্শনে–অমরত্ব লাভের অধিকার পেয়েছেন; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে সাহাবিদের তিরস্কার করেছেন এবং মৃত্যুর পর তার জানাযার নামায পড়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের চলাফেরার জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ. قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»

> তোমরা লানতের দুটি কাজ থেকে বিরত থাকো। সাহাবিরা বললেন, সে দুটি কাজ কী, ইয়া রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন, মানুষের চলাচলের পথে বা তাদের (বিশ্রাম নেওয়ার) ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা।[১৬৬]

এই হাদিসের অর্থ এই যে, যে লোক মানুষের চলাচলের জায়গায় বা মানুষ যেখানে বসে ও বিশ্রাম নেয় সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে সে নিজের

---

১৬৫. *বুখারি*, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাব : কানসুল মাসজিদি ওয়ালতিকাতুল খিরাকি ওয়াল-কাযা ওয়াল-ঈমান; হাদিস নং ৪৪৬, *মুসলিম*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : আস-সালাতু আলাল-কাবর, হাদিস নং ৯৫৬। উদ্ধৃত হাদিসটি *মুসলিম* থেকে।

১৬৬. *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাহারাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিত-তাখাল্লি ফিত-তুরুকি ওয়ায-যিলাল, হাদিস নং ২৬৯।

অভিসম্পাত ডেকে আনে। ইমাম সুলাইমান খাত্তাবি[১৬৭] বলেছেন, লানতের দুটি কাজের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন দুটি বিষয় যা লানত টেনে আনে, মানুষকে লানত করতে উদ্বুদ্ধ করে ও আহ্বান জানায়।[১৬৮]

কোনো বিশেষ জায়গা হলে সেখানকার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বও ছিল অত্যধিক, যেমন মসজিদ। এমনকি এ ব্যাপারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْبُزَاقُ فِي الْـمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ। তার কাফফারা হলো তা (মাটির সঙ্গে) মিটিয়ে দেওয়া।[১৬৯]

ইহুদিরা তাদের বাড়িঘর-আঙিনা পরিষ্কার রাখত না। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের এ কথা বলে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন,

«طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا»

তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ির আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো, কারণ ইহুদিরা তাদের আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখে না।[১৭০]

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে,

«نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ أَنْتَنُ النَّاسِ»

তোমরা তোমাদের আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখো, কারণ ইহুদিরা সবচেয়ে নোংরা মানুষ।[১৭১]

---

[১৬৭]. আবু সুলাইমান খাত্তাবি (৩১৯-৩৮৮ হি./৯৩১-৯৯৮ খ্রি.) : হামদ ইবনে ইবরাহিম ইবনুল খাত্তাব বাসতি। ফকিহ ও মুহাদ্দিস। আফগানিস্তানের বাস্ত এলাকার অধিবাসী। যায়দ ইবনুল খাত্তাবের বংশধর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মাআলিমুস সুনান*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৭৩।

[১৬৮]. নববি, *আল-মিনহাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৬১।

[১৬৯]. *বুখারি*, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাব : কাফফারাতুল বুযাকি ফিল-মাসজিদ, হাদিস নং ৪০৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, বাব : আন-নাহয়ু আনিল বুযাকি ফিল-মাসজিদি ফিস-সালাত ওয়া গাইরিহা, হাদিস নং ৫৫২।

[১৭০]. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৪, পৃ. ২৩১।

[১৭১]. *তিরমিযি*, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আন-নাযাফাহ, হাদিস নং ২৭৯৯; *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৭৯০।

এই বিশেষ নির্দেশ প্রমাণ করে যে, ইসলামে সৌন্দর্যচর্চা একটি মৌলিক বিষয়, তা উষ্ণ পরিবেশের প্রভাবের ফল ছিল না—যেমনটি বিশ্বাস করেন কতিপয় পশ্চিমা গবেষক—এবং পূর্ববর্তী কোনো ধর্মাদর্শ বা জীবনাদর্শের প্রভাবও ছিল না।

ইসলাম নফল নামায ঘরে আদায় করতে উৎসাহিত করেছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا»
>
> তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করে, সে যেন তার কিছু নামায (সুন্নত ও নফল) বাড়িতেও আদায় করে। কারণ আল্লাহ তাআলা তার বাড়িতে আদায় করা কিছু নামাযের মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন।[১৭২]

এই হাদিসের দ্বারা ঘরগুলোও ভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মসজিদে পরিণত হয়েছিল। তাই ঘরগুলোর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ছিল অপরিহার্য, যাতে নামায শুদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে মসজিদ (নামায পড়ার নির্দিষ্ট জায়গা) বানিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ»

---

১৭২. *মুসলিম*, কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : ইসতিহবাবু রামই জামরাতিল আকাবাহ ইয়াওমান নাহরি রাকিবান.., হাদিস নং ১২৯৮।

১৭৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আস-সালাত, বাব : ইত্তিখাযুল মাসাজিদ ফিদ-দুর, হাদিস নং ৪৫৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০১৯৬; *তিরমিযি*, হাদিস নং ৫৯৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৭৫৯; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ১৬৩৪।

> এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কেউ তার গোসলখানায় পেশাব করল, অতঃপর সে সেখানেই অজু করল।[১৭৪]

এই হলো বাড়িতে বা পথে অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক কিছু হাদিস।

চারপাশের পরিমণ্ডল ও পরিবেশের ব্যাপারে কেবল নিষেধাজ্ঞাই আসেনি, বরং ইসলাম বৃক্ষরোপণের প্রতিও উৎসাহিত করেছে। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. وفي رواية مسلم: وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ... وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»
>
> যে মুসলিম একটি গাছ রোপণ করবে বা কোনো বীজ বপন করবে, তারপর তা থেকে কোনো পাখি বা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খাবে, এর জন্য সে সদকার সওয়াব পাবে।[১৭৫]

মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তা থেকে কিছু চুরি হলে সেটাও সদকা এবং কেউ তা নষ্ট করলেও সে সদকার সওয়াব পাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরং কিয়ামত সন্নিকট হলেও বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا»
>
> কিয়ামত এসে গেছে, এই সময়েও যদি তোমাদের কারও হাতে খেজুরের একটি চারাগাছ থাকে এবং সে তা রোপণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে যেন চারাটি রোপণ করে দেয়।[১৭৬]

---

[১৭৪]. *আবু দাউদ*, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : আল-বাউলু ফিল-মুস্তাহাম হাদিস নং ২৭, *নাসাঈ*, হাদিস নং ৩৬, *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩০৪।

[১৭৫]. *বুখারি*, কিতাব: আল-মুযারাআ, বাব: ফাদলুস যারা ওয়াল-গারাসি ইযা আকালা মিনহু, হাদিস নং ২৩২০।

বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোর প্রতি উৎসাহদান ও উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে শক্তিশালী কোনো হাদিস নেই। কারণ তা মুসলিম ব্যক্তির সৃষ্টিশীল ও কল্যাণসাধক ফিতরাত বা স্বভাবের পরিচায়ক, সে স্বভাবগত দিক থেকেই জীবন ও প্রাণ বিকাশে একজন উদার কর্মী। প্রবহমান প্রস্রবণের মতো। কখনো শুকায় না, কখনো থেমে যায় না। সে দিতেই থাকে, কাজ করতেই থাকে, এমনকি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত কাজ করে যায়। যদি কিয়ামত ঘটার উপক্রম হয় তাহলেও সে বৃক্ষরোপণ করে যাবে, বীজ বুনে যাবে। সে নিজে কিছুতেই তার রোপিত গাছের ফল খেতে পারবে না, সে ছাড়া পরে অন্য কেউ খেতে পারবে তাও নয়। কারণ মহাপ্রলয় তার দুন্দুভি বাজাচ্ছে অথবা এক্ষুনি তার শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। এখানে কর্মই কর্মের উদ্‌গাতা, কারণ তা একপ্রকারের ইবাদত এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জমিনের বুকে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্বপালনের প্রয়াস।[১৭৭]

ইসলামি ফিকহে ভূমিকে আবাদ করা-সংশ্লিষ্ট পরিভাষাটি মৃত জমিনে প্রাণ সঞ্চার করা নামে পরিচিত। মৃত জমিন হলো অনুর্বর পরিত্যক্ত ভূমি। এই ব্যাখ্যা নেওয়া হয়েছে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নবর্ণিত হাদিস থেকে,

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»

যে লোক পরিত্যক্ত ভূমিতে চাষাবাদ করল তা তার।[১৭৮]

ইসলাম একদিকে পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ দিয়েছে এবং যেকোনো ধরনের অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামি থেকে বিরত থাকতে বলেছে, অন্যদিকে বৃক্ষরোপণ করতে বলেছে। এ কারণেই ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমদের বাড়িঘর ও শহর সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার এককেটি টুকরো ছিল।

---

[১৭৬]. ইমাম বুখারি, *আল-আদাবুল-মুফরাদ*, হাদিস নং ৪৭৯।

[১৭৭]. ইউসুফ কারযাবি, *রিআয়াতুল বিআতি ফি শরিআতিল ইসলাম*, পৃ. ৬৩।

[১৭৮]. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-খারাজ, বাব : ইহইয়াউল মাওয়াত, হাদিস নং ৩০৭৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৪৩১০। উমর রা. থেকে ইমাম বুখারি মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং ২৩৩৫।
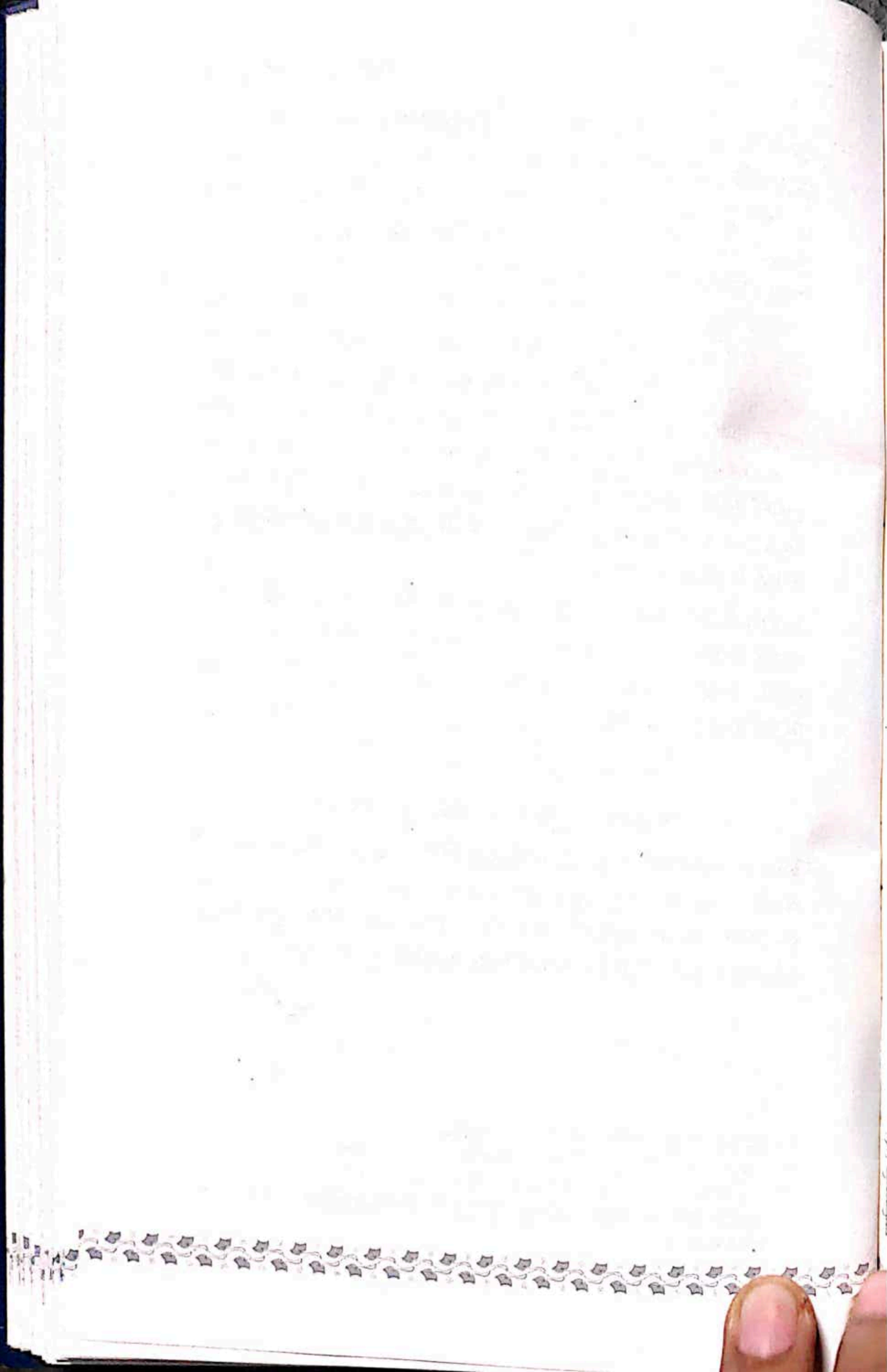
চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সুন্দর রুচিবোধ

রুচিবোধ বলতে বোঝায় স্বচ্ছ-নির্মল অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে, এর ফলে একজন ব্যক্তি অন্যদের অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যত্নশীল থাকে। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণের এটাই হলো আদবকেতা। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি সুন্দর বিদ্যা।

রুচিবোধের বিষয়টি যেমন বাহ্যিক হতে পারে তেমনই অভ্যন্তরীণ বা মানসিকও হতে পারে। এখানে রুচিবোধের কিছু বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব। এসব ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এসব নির্দেশ দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের আদর্শ ও নমুনা।

চলাচলের পথে ও কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

রহমান-এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।[১৭৯], [১৮০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

---

১৭৯. শান্তি কামনা করে, তর্কে লিপ্ত হয় না।-অনুবাদক

১৮০. সুরা ফুরকান : আয়াত ৬৩।

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর সংযত রাখো, নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।[১৮১]

ইবনে কাসির উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আওয়াজের ক্ষেত্রে গাধার সঙ্গে তুলনার কারণে তা নিষিদ্ধ ও চূড়ান্ত তিরস্কারের উপযুক্ত হওয়ার কথা। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»

নিকৃষ্ট উপমা দেওয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় (তবু বলতে হয়), যে দান করে ফিরিয়ে নেয় সে ওই কুকুরের মতো যে বমি করে আবার তা খায়।[১৮২], [১৮৩]

অন্যদের বিরক্ত না করার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

যারা ঘরের বাইরে থেকে আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে[১৮৪] তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।[১৮৫]

---

১৮১. সুরা লুকমান : আয়াত ১৮-১৯।

১৮২. *বুখারি*, কিতাব : আল-হিবাহ ওয়া ফাদলুহা, বাব : লা ইয়াহিল্লু লি-আহাদিন আন ইয়ারজিআ ফি হিবাতিহি ওয়া সাদাকাতিহি, হাদিস নং ২৪৭৯।

১৮৩. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ৬, পৃ. ৩৩৯।

১৮৪. বনু তামিমের একটি দল নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। তখন তিনি তাঁর কামরায় অবস্থান করছিলেন। তারা কামরার পেছন থেকে চিৎকার

এই আয়াত কিছু গ্রাম্য লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এদের দুর্ব্যবহার ও অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাঁর রাসুলের ওপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানাটা তাদের জন্য সংগত। প্রতিনিধি হিসেবে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তারা তাকে তার ঘরে, কোনো এক স্ত্রীর কামরায় পেল। আদবও দেখাল না, ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করল না যে, তিনি নিজ থেকে বাইরে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। বরং চিৎকার করে ডাকতে লাগল, মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ! বেরিয়ে এসো। তাই আল্লাহ তাদের বুদ্ধি-বিবেক নেই বলে নিন্দা করলেন। আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে কীভাবে আদব-তমিজ ও সম্মান দেখাতে হবে তা তারা বোঝেইনি। কারণ আদবকেতা ও সৌজন্যবোধ বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকেরই পরিচায়ক।[১৮৬]

৩. পথ ও রাস্তার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالْـجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بُدٌّ، نتحدَّث فيها. فقال: "إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْـمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قالوا: وما حقُّ الطريق يا رسول الله؟ قال: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْـمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْـمُنْكَرِ»

তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, আমাদের তো রাস্তার ওপর বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, রাস্তায় আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্যই হও তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, রাস্তার হক কী, ইয়া

করে তাকে ডাকতে থাকে। আয়াতটি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। এতে এবং এই সুরার আরও কিছু আয়াতে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।-অনুবাদক

[১৮৫]. সুরা হুজুরাত : আয়াত ৪।

[১৮৬]. আস-সাদি, *তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান (তাফসিরে সা'দি)*, পৃ. ৭৯৯।

রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন, দৃষ্টি নিচু রাখা, কাউকে (পথচারীকে) কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজে নিষেধ করা।[১৮৭]

৪. আতিথ্যগ্রহণ ও অনুমতিগ্রহণের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। তা-ই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[১৮৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ؛ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»

অনুমতি চাইবে তিন বার; অনুমতি দিলে তো ভালোই, অন্যথায় ফিরে আসবে।[১৮৯]

৫. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচারে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ»

---

১৮৭. *বুখারি*, আবু সাইদ আল-খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আফনিয়াতুদ দুর ওয়াল-জুলুসি ফিহা ওয়াল-জুলুসি আলাস-সুউদাত, হাদিস নং ২৩৩৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-লিবাস ওয়ায-যিনাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল-জুলুসি ফিত-তুরুকাত ওয়া ই'তাউত তারিকি হাক্কাহু, হাদিস নং ১১৪।

১৮৮. সুরা নুর : আয়াত ২৭।

১৮৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-ইসতিযান, বাব : আত-তাসলিম ওয়াল-ইসতিযান সালাসান, হাদিস নং ৫৮৯১; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আল-ইসতিযান, হাদিস নং ৩৪।

তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা-কিছু দান করবে তার বিনিময়ে প্রতিদান পাবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও তার বিনিময়েও।[১৯০]

সাইয়িদা আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم فَيَضَع فَاه على مَوضِع فِيَّ»

আমি ঋতুমতী অবস্থায় পানি পান করতাম, তারপর তা (পানির পাত্রটি) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিতাম, তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ লাগিয়েই পান করতেন। আমি ঋতুমতী অবস্থায় হাড়ের গোশত খেতাম, তারপর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই খেতেন।[১৯১]

৬. **হাঁচি দেওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :**

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তাঁর হাত বা কাপড় মুখের ওপর রাখতেন এবং এভাবে হাঁচির আওয়াজ ছোট করতেন।[১৯২]

৭. **হাঁচিদাতার সঙ্গে আচরণে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :**

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الاخَرَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ»

---

১৯০. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : হাজ্জাতুল বিদা, হাদিস নং ৪১৪৭; *মুসলিম*, কিতাব: আল-ওয়াসিয়্যাহ, বাব : আল-ওয়াসিয়্যাতু বিস-সুলুস, হাদিস নং ১৬২৮।

১৯১. *মুসলিম*, কিতাব : আল-হায়দ, বাব : জাওয়াযু গুসলি রা'সি যাওজিহা ওয়া তারজিলিহি.., হাদিস নং ৩০০; *নাসায়ি*, হাদিস নং ২৮২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৫৬৩৫।

১৯২. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফিল-উতাস, হাদিস নং ৫০২৯; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৪৫।

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দুই লোক হাঁচি দিলো। তিনি তাদের একজনের জবাব দিলেন, আরেকজনের জবাব দিলেন না। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই লোক আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, আর ওই লোক আলহামদুলিল্লাহ বলেনি।[১৯৩]

হাই তোলার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ»

হাই আসে শয়তানের থেকে, তাই তোমাদের হাই আসলে সে যেন তা যথাসম্ভব রোধ করে।[১৯৪]

ঘ্রাণের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ- فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا»

কেউ এই গাছ—অর্থাৎ রসুন—খেয়ে থাকলে সে যেন মসজিদে আমাদের সঙ্গে না মেশে।[১৯৫]

মুসলিমের রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা গন্ধের কারণে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[১৯৩]. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, আল-হামদু লিল-আতিসি, হাদিস নং ৫৮৬৭; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যুহ্দ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : তাশমিতুল আতিস ওয়া কারাহাতুত তাসাউব, হাদিস নং ২৯৯১।

[১৯৪]. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খাল্ক, বাব : সিফাতু ইবলিস ওয়া জুনুদিহি, হাদিস নং ৩১১৫; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যুহ্দ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : তাশমিতুল আতিসি ওয়া কারাহাতুত তাসাউব, হাদিস নং ২৯৯৪।

[১৯৫]. *বুখারি*, কিতাব : সিফাতুস সালাত, বাব : মাজাআ ফিসসুমিন নিয়্যি ওয়াল-বাসাল ওয়াল-কুররাস, হাদিস নং ৮১৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, বাব : নাহ্য়ু মান আকালা সুমান আও বাসালান আও কুররাসান আও নাহওয়াহা, হাদিস নং ৫৬৪। হাদিসটি *বুখারি* থেকে উদ্ধৃত।

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا»

যে লোক এই সবজি (রসুন) খাবে, সে যেন এর গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।[১৯৬]

১০. মুসাফাহার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও সঙ্গে মুসাফাহা করতেন, অপর লোক রাসুলুল্লাহর হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তার হাত ছেড়ে দিতেন না।[১৯৭]

১১. সফর থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

কোনো পুরুষ সফর থেকে ফিরে এসে হুট করে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না। কারণ সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখতে পারে, যা তার পছন্দ নয়। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً، وَلا تَغْتَرُّوهُنَّ»

হে লোকেরা, তোমরা (সফর থেকে ফিরে এসে) রাতেরবেলা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে (তাদের জানান না দিয়ে) সাক্ষাৎ করো না এবং তাদের আত্মপ্রবঞ্চনায় ফেলো না।[১৯৮]

১২. বসার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বসতে নিষেধ করেছেন।[১৯৯]

এই হলো সুন্দর রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশের কিছু ক্ষেত্র, এসব ব্যাপারে ইসলাম গভীর ও সূক্ষ্ম নির্দেশনা দিয়েছে। পাশাপাশি ব্যাখ্যাও রয়েছে।

---

[১৯৬]. *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, বাব : নাহ্য়ু মান আকালা সুমান আও বাসালান আও কুররাসান আও নাহওয়াহা, হাদিস নং ৫৬১।

[১৯৭]. *তিরমিযি* : সিফাতুল কিয়ামা ওয়ার-রাকায়িক ওয়াল-ওয়ারা, হাদিস নং ২৪৯০; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৭১৬।

[১৯৮]. *দারিমি*, বাব : তাজিলু উকুবাতি মান বালাগাহু আনিন নাবিয়্যি হাদিসুন ফালাম ইয়ুআযযিমহু, হাদিস নং ৪৪৪; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ১৮৪৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৭৭৯৮।

[১৯৯]. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদব, বাব : আর-রাজুলু ইয়াজলিসু বাইনার রাজুলাইনি বিগাইরি ইযনিহা, হাদিস নং ৪৮৪৪; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৫২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৬৯৯৯।

কখনোই কোনো মতবাদের উদ্‌গাতা, কোনো ধর্মাদর্শের প্রবর্তক বা কোনো আইন-প্রণেতা এসব বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। এটাই আল্লাহ তাআলার বিধান ও মানুষের বিধানের মধ্যে পার্থক্য, ইসলাম এবং অন্যান্য মতাদর্শ ও দর্শনের মধ্যকার ভিন্নতা। এভাবে পার্থক্য সূচিত হয় আমাদের সভ্যতার ও অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য

ইসলামি সভ্যতা চরিত্র ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বের চর্চা করেছে। ইসলামের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো জীবনাদর্শে এসব দেখা যায়নি। উত্তম চরিত্র, সহৃদয়তা, কোমলতা, মিষ্ট ও সুন্দর কথাবার্তা ইত্যাদি চারিত্রিক সৌন্দর্যের অন্তর্গত। মুচকি হাসিতেও সদকার সওয়াব মেলে! সুন্দর আচরণেও পুণ্য রয়েছে! ক্রোধ সংবরণ এবং যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের ক্ষমা করায় ইহসান বা মানবিকতার একটি স্তর এবং এতে আল্লাহর ভালোবাসা মেলে!

এগুলোই মানবচরিত্রের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার উৎকৃষ্ট প্রকাশ; আচার-আচরণের সৌন্দর্য, কথাবার্তার সৌন্দর্য, অন্য মানুষের ক্ষেত্রে মানবিকতার সৌন্দর্য, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের সৌন্দর্য এগুলোই।

এ পরিচ্ছেদে সৌন্দর্যের এই দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে এখানে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি, উজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দর কথা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্বচ্ছ মন ও মানবপ্রেম

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : উত্তম চরিত্র

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অনুপম রুচিবোধ

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুচকি হাসি, উজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দর কথা

মুচকি হাসি... গোটা বিশ্বের মানবিক ভাষা। সর্বোচ্চ সৌজন্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। গ্রহণীয়তা, স্বচ্ছতা, সহৃদয়তা, মানবিক প্রেম—সবই বোঝানো যায় মুচকি হাসি দিয়ে।

ভাষা-পণ্ডিতদের বক্তব্য অনুযায়ী মুচকি হাসি হলো, হাসির মৃদু প্রকাশ ও চেহারার উজ্জ্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ আনন্দের ফলে দাঁত প্রকাশিত হওয়া। কেবল আনন্দের বিষয় বোঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল।[২০০]

উজ্জ্বল ও সহাস্য চেহারা কেবল মানুষেরই হয়ে থাকে, অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে তা পাওয়া যায় না।[২০১] সুতরাং মুচকি হাসি মানবিক আচরণ ও চরিত্রের অন্যতম সৌন্দর্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মুচকি হাসি; গোটা দিন, গোটা জীবন তিনি মুচকি হেসেছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি মুচকি হাসতেন। তাঁর সাহাবিগণের সঙ্গে কৌতুক করতেন, হাস্যরস করতেন, কিন্তু জীবনে কখনো তিনি সত্য ব্যতীত অসত্য বলেননি। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ»

---

২০০. সুরা আবাসা : আয়াত ৩৮-৩৯।

২০১. যুবাইদি, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, (ض ح ك) মূল ধাতু, খ. ২৭, পৃ. ২৪৯-২৫০।

> আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।[২০২]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي»

> আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আমাকে তাঁর কাছে আসতে বাধা দেননি। তা ছাড়া যখনই তিনি আমাকে দেখতেন মৃদু মুচকি হাসতেন।[২০৩]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। তিনি যখন মুচকি হাসতেন, শুভ্র মেঘের দানার মতো (তাঁর দাঁতগুলো) জ্বলজ্বল করত।[২০৪]

এই প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ বলেছেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। বরং সবই ছিল মুচকি হাসি। মাড়ির দাঁত প্রকাশ পাওয়া ছিল তাঁর হাসির চূড়ান্ত। হাসির কিছু ঘটলে তিনি হাসতেন। অর্থাৎ আশ্চর্যজনক কিছু বা দুর্লভ কিছু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির দর্শন বর্ণনা করে ইবনুল কাইয়িম আরও বলেন, হাসির কয়েকটি কারণ রয়েছে। এই গেল একটি। আরেকটি হলো আনন্দের হাসি। আনন্দদায়ক কিছু দেখলে বা আনন্দের সংবাদ শুনলে মানুষ এই হাসি হাসে। তৃতীয় হলো ক্রোধের হাসি। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রচণ্ড ক্রোধের সময় এই হাসি হেসে থাকে। এখানে হাসির কারণ হলো ক্রোধের কারণ নিয়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বিস্ময়বোধ এবং প্রতিপক্ষের ওপর তার ক্ষমতা অধিক এবং সে তার হাতের মুঠোয় এই অনুভূতি। হাসি এ কারণেও হতে পারে যে, অত্যধিক ক্রোধের সময়ও সে

---

২০২. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-মানাবিক, বাব : বাশাশাতুন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাদিস নং ৩৬৪১। *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৭৪০।

২০৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আত-তাবাসসুমু ওয়াদ-দিহ্‌ক, হাদিস নং ৫৭৩৯; *মুসলিম*, কিতাব : ফাদায়িলুস সাহাবাহ, বাব : ফাদায়িলু জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা., হাদিস নং ২৪৭৫।

২০৪. তিরমিযি, *আশ-শামায়িল*, পৃ. ২০।

নিজেকে সংযত রাখছে, যে তাকে রাগাচ্ছে তাকে পাত্তা দিচ্ছে না এবং তার প্রতি কোনো মনোযোগই দিচ্ছে না।[২০৫]

এ ব্যাপারটিরই জোরালো সমর্থন লক্ষ করি আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে। তিনি বলেন,

«كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَالَ أَنَسٌ: فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»

আমি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হাঁটছিলাম। তখন তিনি নাজরানে প্রস্তুতকৃত মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত ছিলেন। এক গ্রাম্য লোক তাঁকে কাছে পেয়ে তাঁর চাদর ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিলো। আমি লক্ষ করলাম, চাদর জোরে টানার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুইন বলল, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর যে সম্পদ তোমার কাছে রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দাও। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[২০৬]

এই মানবিক সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কেবল আদর্শ ব্যক্তি হয়েই ক্ষান্ত থাকেননি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বরং তিনি এই ব্যাপারে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। আবু যর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২০৫. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, খ. ১, পৃ. ১৮২-১৮৩।

২০৬. *বুখারি*, কিতাব : আল-খুমুস, বাব : মা কানা লিন-নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ুতিল মুআল্লাফাতা কুলুবুহুম..., হাদিস নং ২৯৮০; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যাকাত, বাব: ই'তাউ মান ইয়াসআলু বি-ফুহশিন ও গিলযাহ, হাদিস নং ১০৫৭।

«تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»

তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসাও তোমার জন্য সদকা।[২০৭]

এর অর্থ এই যে, অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুচকি হাসা, চেহারা উজ্জ্বল ও হাস্যময় রাখা। এতে তেমনই পুণ্য রয়েছে, যেমন সদকায় পুণ্য রয়েছে।[২০৮]

এসব সৌজন্যমূলক কাজ খুবই সহজ ও সাধারণ। চিন্তাও করতে হয় না, চেষ্টাও করতে হয় না, কিন্তু তা মানুষের ওপর জাদুকরী প্রভাব ফেলে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যা-কিছু আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলকে সন্তুষ্ট করে এটিও তার একটি। আবু যর গিফারি রা. আরও বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ تَحْقِرَن مِنَ الْـمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ»

কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি তা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও।[২০৯] অর্থাৎ সহাস্য, সুন্দর, স্বাভাবিক উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে।

মুচকি হাসি ও উজ্জ্বল চেহারা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশের প্রথম পথ। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, কল্যাণ ও মমতা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এতে সমাজে নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক প্রেম অনুভূত হয়। এরকম সমাজই ইসলামে কাম্য ও প্রার্থিত। এর জন্যই শরিয়ত প্রবর্তিত হয়েছে। এসব সাধারণ বিষয়গুলোও ঈমানের অংশ। মুমিন তিনিই, যিনি মানুষের কাছে প্রিয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[২০৭]. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : সানায়িউল মারুফ, হাদিস নং ১৯৫৬। তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরিব। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৭৪, ৫২৯। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান। *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮৯১।

[২০৮]. মুবারকপুরি, *তুহফাতুল আহওয়াযি বি-শারহি জামিয়িত তিরমিযি*, খ. ৬, পৃ. ৭৫-৭৬।

[২০৯]. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : ইসতিহবাবু তালাকাতিল ওয়াজহি ইনদাল লিকা, হাদিস নং ১৪৪; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৫৯৯৭; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৬৮।

«الْـمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»

মুমিন তো সে-ই, যে মানুষকে ভালোবাসে এবং মানুষও তাকে ভালোবাসে। যে মানুষকে ভালোবাসে না এবং মানুষ যাকে ভালোবাসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ মানুষ।[২১০]

হাদিসটি কেবল এই ব্যাপারে উৎসাহ জোগাচ্ছে না যে মুমিন সবাইকে ভালোবাসবে এবং সকলের প্রিয় হবে, বরং ভালোবাসার বিপরীত ব্যাপারগুলোকে (হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা) নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, উপর্যুক্ত সৌজন্যমূলক বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়, এগুলো বাহুল্যও নয়, বরং জরুরি।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সুন্দর কথাবার্তা সকল মানুষের জন্য হবে এবং সকলের সঙ্গে হবে। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে নির্দেশনাদান করে বলেন, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾—'মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে।'[২১১]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[২১২]

---

২১০. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯১৮৭; *হাকিম*, হাদিস নং ৫৯।

২১১. সুরা বাকারা : আয়াত ৮৩।

২১২. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মান কানা ইয়ুমিনু বিল্লাহি ওয়াল-ইয়াওমিল আখিরি ফালা ইয়ুযি জারাহু, হাদিস নং ৫৬৭২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আল-হাসসু আলা ইকরামিল জার ওয়াদ-দায়ফ ওয়া লুযুমিস সামতি, হাদিস নং ৪৭।

এই হাদিসের টীকায় ইবনে হাজার আসকালনি রহ. বলেন, হাদিসটির মূলকথা এই যে, যে লোক ঈমান ধারণ করে সে অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতাময় হবে, কল্যাণকর কথা বলবে, খারাপ কথা থেকে চুপ থাকবে, উপকারী কাজ করবে, ক্ষতিকর কাজ পরিত্যাগ করবে।[২১৩]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾—'মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে'[২১৪] এ আয়াতের তাফসিরে সদালাপ বা সুন্দর কথাবার্তার সারমর্ম তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় আদব ও শিষ্টাচারকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশেষজ্ঞগণ বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা হয় দ্বীনি বিষয়ে হবে, নতুবা দুনিয়াবি বিষয়ে হবে। দ্বীনি বিষয়ে কথাবার্তা হলে সেটা হয়তো ঈমানের প্রতি দাওয়াত হবে এবং তা হবে অমুসলিমদের সঙ্গে; অথবা আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলাম মানার প্রতি দাওয়াত হবে এবং তা হবে ফাসেকদের (পাপাচারীদের) সঙ্গে।

- ঈমানের প্রতি দাওয়াত হলে সেটা অবশ্যই নরম ও সুন্দর কথাবার্তার সঙ্গে হতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা মুসা ও হারুন আ.-কে নির্দেশ দিয়েছেন,

  ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾

  তোমরা তার সঙ্গে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।[২১৫]

আল্লাহ তাআলা তাদের দুইজনকে তাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং ফেরাউনের চূড়ান্ত কুফরি, ঔদ্ধত্য ও খোদাদ্রোহিতা সত্ত্বেও তার সঙ্গে নম্র-কোমল ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

---

২১৩. ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারি*, খ. ১০, পৃ. ৪৪৬।

২১৪. সুরা বাকারা : আয়াত ৮৩।

২১৫. সুরা তহা : আয়াত ৪৪।

যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।[২১৬]

- ফাসেক ও পাপাচারীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুন্দর কথাবার্তা বিবেচ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ﴾

আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করেন হিকমত[২১৭] ও সদুপদেশের দ্বারা।[২১৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ﴾

মন্দ প্রতিহত করুন উৎকৃষ্টের দ্বারা, ফলে আপনার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।[২১৯]

দুনিয়াবি বিষয়ে কথাবার্তা হলে এটা অবশ্যই জানা কথা যে, কোমল ভাষা ও নম্র ব্যবহারের দ্বারা যদি কোনো উদ্দেশ্য বা কাজ হাসিল করা যায় তাহলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন সংগত ও সুন্দর নয়।

তাহলে প্রমাণিত হলো যে, দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় আদব ও শিষ্টাচার আল্লাহ তাআলার এই বাণী, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾–'মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে'[২২০]-এর অন্তর্ভুক্ত।[২২১]

এসব শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মুসলিমকে মুচকি হাসি, চেহারার উজ্জ্বলতা ও উত্তম কথাবার্তা সব ক্ষেত্রেই সুন্দর হতে হবে।

---

২১৬. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯।

২১৭. যাবতীয় বিষয়কে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।-অনুবাদক

২১৮. সুরা নাহল : আয়াত ১২৫।

২১৯. সুরা ফুসসিলাত : আয়াত ৩৪।

২২০. সুরা বাকারা : আয়াত ৮৩।

২২১. ফখরুদ্দিন রাযি, *আত-তাফসিরুল কাবির*, খ. ৩, পৃ. ৫৬৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

স্বচ্ছ মন ও মানবপ্রেম

মুচকি হাসি, চেহারার খোশভাব ও কোমল কথাবার্তার নির্দেশনাদানের ক্ষেত্রে ইসলাম একটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তা এই যে, এসব কাজ হতে হবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে; লৌকিকতা, অভিনয়, ভণিতা বা কপটতাবশত নয়।

এখানেই অন্যান্য সবকিছু থেকে ইসলাম ও তার শিক্ষা ব্যতিক্রম। কারণ তা কোনো লাভজনক সংস্থা বা কোম্পানি নয় যে, বেশি বেশি ক্লায়েন্ট (খরিদ্দার) পাওয়ার চেষ্টায় এসব করে। ইসলাম বরং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন যে, যার মন পরিষ্কার, অন্তর স্বচ্ছ সে শ্রেষ্ঠ মানুষ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে নিম্নরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

«قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ. قَالُوْا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ النَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মানুষ উত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার অন্তর নিষ্কলুষ এবং যে সত্যভাষী। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো 'সত্যভাষী' বুঝি, কিন্তু 'নিষ্কলুষ অন্তর' কী? তিনি বললেন, নির্মল ও পবিত্র অন্তঃকরণ, যা পাপ করেনি, জুলুম করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত।[২২২]

---

২২২. *ইবনে মাজাহ*, কিতাব আয-যুহ্দ, বাব : আল-ওয়ারা ওয়াত-তাকওয়া, হাদিস নং ৪২১৬।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন, তবে তাকে নয় যার অন্তরে তার ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রয়েছে। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন,

«تُفْتَحُ أَبْوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ويَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بينهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! أَنْظِرُوا هٰذَينِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোনোকিছু শরিক করে না। কিন্তু এমন ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হয়, এই দুজনকে আপস করার অবকাশ দাও, এই দুজনকে আপস করার অবকাশ দাও।[২৫৩]

এমনকি যাদের মন স্বচ্ছ, অন্তর পবিত্র তারাই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْـجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْـمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْـحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»

জান্নাতে প্রথম যে দল প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না এবং পায়খানা করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে সোনার, তাদের চিরুনি হবে সোনা ও রুপার, তাদের ধূপদানিতে থাকবে

---

২৫৩ *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : আন-নাহয়ু আনিশ শাহনা ওয়াত-তাহাজুর, হাদিস নং ২৫৬৫।

সুগন্ধ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম হবে মিশকের মতো সুবাসিত। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দুজন স্ত্রী, সৌন্দর্যের ফলে গোশতের পেছনে তাদের পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ থাকবে না, কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের হৃদয় হবে একটিমাত্র হৃদয়। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করবে।[২২৪]

মানুষের প্রতি কুধারণা থেকে মনকে পবিত্র রাখতে হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন,

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا»

তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না, কারও পেছনে লেগো না এবং পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না। তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে থেকো।[২২৫]

সৃষ্টিজগতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার যে ফিতরাত তা এই যে, তিনি সবকিছু সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করেছেন। সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো মনের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা।

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

এটাই আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সুষম।[২২৬]

এ কারণেই মনের মধ্যে যদি হিংসা-বিদ্বেষ-কলুষতা থাকে তাহলে তা মনকে ক্লান্ত করে দেয়।

---

২২৪. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালকি, বাব : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া আন্নাহা মাখলুকাহ, হাদিস নং ৩০৭৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জান্নাতু ওয়া সিফাতু নাইমিহা ও আহলিহা, বাব : আওয়ালু যুমরাতিন তাদখুলুল জান্নাতা আলা সুরাতিল কামার লাইলাতাল বাদ্‌র..., হাদিস নং ২৮৩৪।

২২৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মা ইয়ুনহা আনিত-তাহাসুদি ওয়াত-তাদাবুর, হাদিস নং ৫৭১৭; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয যান্ন ওয়াত-তাজাসসুস ওয়াত-তানাফুস ওয়াত-তানাজুশ ওয়া নাহবিহা, হাদিস নং ২৫৬৩।

২২৬. সুরা নামল : আয়াত ৮৮।

ইমাম ইবনে হাযম রহ. এ ব্যাপারটিই পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি অধিকাংশ মানুষকে দেখেছি–তবে আল্লাহ যাদের রক্ষা করেন তাদের কথা ভিন্ন এবং তাদের সংখ্যা খুব কম–দুনিয়াতে তারা নিজেদের জন্য অনিষ্ট, দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি ত্বরান্বিত করে এবং এমন বড় বড় পাপ করে, যার ফলে আখেরাতে জাহান্নামের আগুন আবশ্যক হয়ে পড়ে, অথচ এগুলোর দ্বারা তারা মূলত কোনো উপকারই লাভ করতে পারে না। তাদের নিয়ত ও মনোবাসনা অত্যন্ত খারাপ; মানুষের জন্য তারা ধ্বংসাত্মক মূল্যবৃদ্ধি[২২৭] কামনা করে, এমনকি ছোটদের জন্যও, যাদের কোনো অপরাধ নেই তাদের জন্যও; তারা যাদের অপছন্দ করে তাদের জন্য কামনা করে ভয়াবহ বিপদ। অথচ তারা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, তাদের কুৎসিত মনোবাসনা তারা যা চাচ্ছে তার কিছুই এনে দেবে না অথবা তার 'ঘটা' অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে না। যদি তারা তাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ করত, তাদের মনোবাসনা হতো চমৎকার, তাহলে তারা মনে শান্তি পেত, অন্তরে স্বস্তি আসত। এর ফলে তারা ভালো ভালো কাজ করারও সুযোগ পেত। সৎকাজের জন্য উত্তম প্রতিদানও পরকালের জন্য তুলে রাখতে পারত। যদিও তা তাদের কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয়ে পিছিয়ে দিত না এবং তার 'ঘটা'-কে বাধাগ্রস্ত করত না। এই যে অবস্থার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে তার চেয়ে বড় ক্ষতি ও লোকসান আর কী হতে পারে এবং যার প্রতি আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে তার চেয়ে বড় কল্যাণ ও সৌভাগ্য কী হতে পারে![২২৮]

মনের স্বচ্ছতার চেয়েও মহৎ ব্যাপার হলো... মানুষের প্রতি ভালোবাসা বা মানবপ্রেম। তা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার স্থান ছিল হৃদয়ের স্বচ্ছতারও উপরে। তাঁর অলংকারপূর্ণ ভাষায় এই ভালোবাসার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে; তিনি নিজের ও তাঁর দাওয়াতের প্রেক্ষিতে মানুষের অবস্থান তুলে ধরেছেন চমকপ্রদ ভাষায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২২৭. জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে দুর্ভিক্ষে মরুক!-অনুবাদক

২২৮. ইবনে হাযম, *রাসায়িলু ইবনে হাযম*, খ. ১, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

«إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا»

আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালাল, ফলে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল, তখন পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে পড়ে সেগুলো তাতে পড়তে লাগল। ওই লোক তখন পতঙ্গ ও প্রাণীদের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য টানতে লাগল। কিন্তু সেগুলো লোকটিকে পরাজিত করে দিয়ে আগুনে পুড়ে মরল। আমি তোমাদের কোমরে ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি, অথচ তারা তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।[২২৯]

হৃদয়ে প্রভাব-সঞ্চারী এক চিত্র! যেন তা এক যুদ্ধ... এই যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে প্রতিহত করছেন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে; কিন্তু তারা তাঁকে পরাস্ত করে, তাঁকে ডিঙিয়ে গিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এটা কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া নয়, কেবল দায়িত্বপালন নয়, কেবল কল্যাণকামনা নয়... এটা যুদ্ধ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন, মানুষের কোমর ধরে রেখেছেন, কিছু মানুষ তাঁকে পরাস্ত করে আগুনে পতিত হচ্ছে।

ইমাম বুখারি নিম্নবর্ণিত হাদিস বর্ণনা করেছেন,

«أنه كانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: "الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

---

২২৯. *বুখারি*, কিতাব : আর-রিকাক, বাব : আল-ইনতিহা আনিল-মাআসি, হাদিস নং ৬১১৮; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাদায়িল, বাব : শাফকাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলা উম্মাতিহি ওয়া মুবালাগাতুহু ফি তাহযিরিহিম মিম্মা ইয়াদুররুহুম, হাদিস নং ২২৮৪।

এক ইহুদি বালক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করত। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখার জন্য এলেন। তিনি বালকটির শিয়রে বসলেন এবং বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। বালকটি তার বাবার দিকে তাকাল, সে কাছেই ছিল। বাবা বলল, আবুল কাসিম যা বলছেন তা শোনো। ফলে বালকটি ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন এ কথা বলতে বলতে যে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।[২৩০]

কত মহান এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!!

ওহুদের যুদ্ধে তিনি আহত হলেন, আহত হয়ে নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন,

«رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»

হে আমার প্রতিপালক, আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তারা অজ্ঞ।[২৩১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ দিনটিতে যা ঘটেছিল তা এই যে, তিনি মানুষের (কাফেরদের) ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি মমতাশীল ও দয়াপরায়ণ ছিলেন। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহুদ যুদ্ধের চেয়ে কঠিন দিন কি আপনার জীবনে কখনো এসেছিল? তিনি যা বললেন তা নিম্নরূপ—

«لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ

---

২৩০. *বুখারি*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : ইযা আসলামাস সাবিয়্যু ফামাতা হাল ইয়ুসাল্লা আলাইহি ওয়া হাল ইয়ুরাদু আলাস-সাবিয়্যিল ইসলাম, হাদিস নং ১২৯০।

২৩১. *বুখারি*, কিতাব : ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দিন ওয়াল-মুআনিদিন ওয়া কিতালুহুম, বাব : ইযা আররাদায যিম্মিয়্যু বি-সাব্বিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া লাম ইয়ুসাররিহ, হাদিস নং ৬৫৩০; *মুসলিম*, আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : গাযওয়াতু উহুদ, হাদিস নং ১৭৯২।

الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: ذٰلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

আমি তোমার কওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা তো হয়েছিই। তাদের থেকে সবচেয়ে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি আকাবার দিন, যখন আমি নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কালালের কাছে পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম সে ব্যাপারে সে আমাকে সাড়া দেয়নি। ফলে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম, কারনুস সাআলিব পর্যন্ত পৌঁছার আগে আমার দুশ্চিন্তা লাঘব হয়নি। এখানে এসে আমি আমার মাথা উপরের দিকে তুললাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সেদিকে তাকালাম, দেখলাম তার মধ্যে জিবরাইল আ.। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার নিবেদনের প্রেক্ষিতে তারা যে প্রত্যুত্তর দিয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তা শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিযুক্ত) ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। এদের ব্যাপারে আপনার মন যা চায় আপনি এই ফেরেশতাকে নির্দেশ দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি যা চাইবেন তা-ই হবে। আপনি চাইলে আমি এদের ওপর আখশাবাইন চাপিয়ে দেবো। জবাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, আল্লাহ তাদের থেকে এমন জাতি তৈরি করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।[২৩২]

---

২৩২. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খাল্‌ক, বাব : ইযা কালা আহাদুকুম আমিন ওয়াল-মালায়িকাতু ফিস-সামা ফাওয়াফাকাত ইহদাহুমাল উখরা, হাদিস নং ৩০৫৯; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মমতা কেবল মানুষের প্রতি নয়, অন্য প্রাণীদের প্রতিও ছিল। যা-কিছুর মধ্যে প্রাণ রয়েছে তার সেবা করাও যে ভালো কাজ তার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قالوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ"»

একদিন এক লোক চলার পথে প্রচণ্ড পিপাসার্ত হলো। একটি কূপ দেখতে পেয়ে সে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। লোকটি উপরে উঠে এসে দেখতে পেল, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসার কারণে ভেজা মাটি চেটে খাচ্ছে। তখন (মনে মনে) লোকটি বলল, এ কুকুরটির তেমনই পিপাসা পেয়েছে যেমনটা আমার পেয়েছিল। সে আবার কূপের মধ্যে নামল এবং তার মোজা ভরতি করে পানি এনে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ লোকটির এই কাজ কবুল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রাণিমাত্রের সেবার মধ্যেই সওয়াব রয়েছে।[২৩৩]

এ সকল শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ইসলাম অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য নির্মাণ করেছে। মানুষের মধ্যে একদলকে করে তুলেছে সহৃদয়, মমতাময়, সজীব-কোমল মৃদু বাতাসের মতো; কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, মানুষের জন্য নয়, বরং গোটা জীবজগতের জন্য।

ওয়াস-সিয়ার, বাব : মা লাকিয়ান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিন আযাল-মুশরিকিন ওয়াল-মুনাফিকিন, হাদিস নং ১৭৯৫।

২৩৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আল-আবারু আলাত-তুরুকি ইযা লাম ইয়ুতাআযযা বিহা, হাদিস নং ২৩৩৪।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

উত্তম চরিত্র

উত্তম চরিত্র এমন একটি গুণ, মানবজাতি যার অনুসন্ধানে বহু যুগ ব্যয় করেছে; প্রাচীন দার্শনিকদের বিকাশকাল থেকেই উত্তম চরিত্রের পিছু ছুটেছে মানবজাতি এবং তাদের মনে হয়েছে যে তারা এই গুণটির গলায় লাগাম পরিয়ে ফেলতে পেরেছে। তারা লিখেছে পবিত্র নগর (Virtuous City) ও এরকম অন্যান্য কল্পিত জিনিস সম্পর্কে। পরে তাদের মনে হয়েছে যে এগুলো দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। ফলে বর্তমান বিশ্ব এই গুণটির নাম দিয়েছে 'মানবতা'।

পাশ্চাত্য অর্থে 'মানবতা' ইসলামি অভিধানে 'রহমত' বা 'দয়া' বলতে যা বোঝায় তার কাছাকাছি। আর ইসলামে 'দয়া' তার সবদিক নিয়ে উত্তম চরিত্রের একটি অংশমাত্র। কারণ উত্তম চরিত্র কথাটি 'দয়া' থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা সত্যের সমর্থন সবই উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। হারিস মুহাসিবি রহ. বলেছেন, উত্তম চরিত্রের নিদর্শন হলো আল্লাহর ওয়াস্তে কষ্টসহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, ক্রোধ সংবরণ করা, সত্যনিষ্ঠদের সত্যের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা, ক্ষমা করা এবং ভুলপথ এড়িয়ে চলা।[২৩৪]

ইমাম গাযালি রহ. বলেছেন, উত্তম চরিত্র কষ্ট প্রতিহত করা নয়, বরং কষ্ট সহ্য করা।[২৩৫]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের প্রশংসা করেছেন তাঁর উত্তম চরিত্রের কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

নিশ্চয় আপনি মহৎ চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।[২৩৬]

---

২৩৪. হারিস মুহাসিবি, *আদাবুন নুফুস*, পৃ. ১৫৩।
২৩৫. ইমাম গাযালি, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খ. ১, পৃ. ২৬৩।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে উত্তম চরিত্রকে ঈমানের তফাত ও কমবেশির মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন; অর্থাৎ যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো তার ঈমানই পরিপূর্ণ। ইমাম বাযযার আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَكْمَلَ الْـمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَإِنَّ حُسْنَ الْـخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ»

ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। উত্তম চরিত্রের মর্যাদা নামায ও রোযার মর্যাদার পর্যায়ে পৌঁছে।[২৩৭]

এ কারণেই কিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিরাই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় হবে এবং মজলিসে তাঁর সবচেয়ে কাছে বসবে যাদের চরিত্র উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا»

তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র উত্তম তারাই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে এবং আমার সবচেয়ে কাছে বসবে।[২৩৮]

কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় উত্তম চরিত্র সবকিছুর চেয়ে ওজনে ভারী হবে,

«مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْـمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْـخُلُقِ»

---

২৩৬. সুরা কালাম : আয়াত ৪।

২৩৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আদ-দালিলু আলা যিয়াদাতিল ঈমান ওয়া নুকসানিহি, হাদিস নং ৪৬৮২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১১৬২। তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৩৯৬।

২৩৮. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : মাআনিল আখলাক, হাদিস নং ২০১৮; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৮২।

কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী বস্তুটি হবে উত্তম চরিত্র।[২৩৯]

উত্তম চরিত্র মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে,

«أَكْثَرُ مَا يُدخِلُ النَّاسَ الْـجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْـخُلُقِ، وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ»

আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র—এই দুটি জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে। মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে দুটি জিনিস—জিহ্বা ও লজ্জাস্থান।[২৪০]

বরং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে তাঁর দায়িত্ব কী তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছেন এই হাদিসে,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।[২৪১]

যে রিসালাত জীবনেতিহাসের মধ্য দিয়ে তার পথরেখা অঙ্কন করেছে, যে রিসালাতের অধিকারী তার আলো ছড়িয়ে দিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন এবং সেই আলোর চারপাশে মানুষকে সমবেত করেছেন, তা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিকে শক্তিশালী করতে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তাদের চোখের সামনে পরিপূর্ণতার দিগন্তকে আলোকিত করে তুলেছে, যাতে তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা সেদিকে ধাবিত হতে পারে।[২৪২]

চরিত্রের সৌন্দর্য হলো যা জীবনকে নান্দনিকতায় রঙিন করে তোলে এবং যেখানে মানুষের সঙ্গে আচারব্যবহারের ভিত্তি হয় দয়া, সততা ও কল্যাণ। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এই পথে চলতে গিয়েই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট ও যন্ত্রণা স্বীকার করেছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। চরিত্রের সৌন্দর্য রক্ষার্থেই

---

২৩৯. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়া আস-সিলাহ, বাব : হুসনুল খুলুক, হাদিস নং ২০০৩।

২৪০. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯০৮৫; বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৪৭১৮।

২৪১. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৯৩৯; আল-হাকিম, হাদিস নং ৪২২১; বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ২১৩০১।

২৪২. মুহাম্মাদ গাযালি, *খুলুকুল মুসলিম*, পৃ. ৭।

ফরয বিধান ফরয করা হয়েছে এবং সুন্নত বিধানগুলো সুন্নত করা হয়েছে।

যেসব অকাট্য দলিল এই তাৎপর্য ব্যক্ত করেছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾

নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।[২৪৩]

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।[২৪৪]

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যাতে তোমরা খোদাভীতি অবলম্বন করতে পারো।[২৪৫]

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

যে লোক (রোযা রাখা অবস্থায়) মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়েনি, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন নেই।[২৪৬]

﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

---

২৪৩. সুরা আনকাবুত : আয়াত ৪৫।

২৪৪. সুরা তওবা : আয়াত ১০৩।

২৪৫. সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৩।

২৪৬. *বুখারি*, কিতাব : আস-সাওম, বাব : মান লাম ইয়াদা কাওলায যুর ওয়াল-আমালা বিহি ফিস-সাওম, হাদিস নং ১৮০৪; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৩৬২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ৭০৭।

তার জন্য হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহবিবাদ সংগত নয়।[২৪৭]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تؤذي جِيرَانَهَا. قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ»

একবার জনৈক লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, অমুক মহিলা অধিক নামায পড়া, রোযা রাখা ও দান-সদকা করার ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করেছে। তবে সে তার মুখের দ্বারা তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামি। লোকটি পুনরায় বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, অমুক মহিলা—যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রোযা রাখে, দান-সদকাও কম করে এবং নামাযও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরো বিশেষ। তবে সে তার মুখের দ্বারা আপন প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জান্নাতি।[২৪৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»

পানাহার ত্যাগ করা প্রকৃত রোযা নয়, প্রকৃত রোযা হলো অনর্থক কাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। কেউ তোমাকে গালি

প্রকৃত রোযার স্বরূপ

---

[২৪৭]. সুরা বাকারা : ১৭৯।

[২৪৮]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯৬৭৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৭৩০৪। তিনি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। যাহাবি তার সঙ্গে একমত। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৮৫৮।

দিলে বা তোমার সঙ্গে মূর্খের মতো আচরণ করলে, তুমি বলো, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।[২৪৯]

নিচের হাদিসটিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে ও কেন তিনবার কসম খেয়েছেন তা লক্ষ করুন এবং চিন্তা করুন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা বোধ করে না।[২৫০]

এই হাদিসে এমন ব্যক্তি থেকে ঈমান নাকচ করা হয়নি যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, বরং এমন ব্যক্তি থেকে ঈমান নাকচ করা হয়েছে যার অনিষ্টের ব্যাপারে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা বোধ করে না। এই বক্তব্য মূলত উত্তম চরিত্রগুণ সম্পর্কে, অনিষ্ট সম্পর্কে নয়। কারণ এক প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীকে নিরাপদ মনে করবে কি করবে না তা সাধারণত নৈতিক ও চারিত্রিক একটি ব্যাপার। এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে লোক প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় তাকে উদ্দেশ করেননি, বরং এমন লোককে উদ্দেশ করেছেন যার চরিত্র তার প্রতিবেশীকে নিরাপত্তা বোধ করতে দেয় না, ফলে তারা তার অনিষ্টের ব্যাপারে আশঙ্কা করে।

মানবেতিহাসে এটা অভূতপূর্ব বাঁকবদল, এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো দেখা যায়নি, মানুষের চিন্তায়ও আসেনি। হ্যাঁ, তা হলো আল্লাহর দ্বীন, আসমান থেকে প্রেরিত ওহি।

---

২৪৯. *হাকিম*, হাদিস নং ১৫৭০। তিনি বলেছেন, এই হাদিস ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি বা ইমাম মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেননি। বাইহাকি, *আস-সুনানুল-কুবরা*, হাদিস নং ৮০৯৬; *ইবনে খুযাইমা*, হাদিস নং ১৯৯৬।

২৫০. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসমু মান লা ইয়া'মানু জারুহু বাওয়ায়িকুহু, হাদিস নং ৫৬৭০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু তাহরিমি ইযাইল-যার, হাদিস নং ৪৬।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের এক ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন যে নামায পড়ত, দানখয়রাত করত, রোযা রাখত; কিন্তু তার চরিত্র ভালো ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন যে, সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য নয়, বরং জাহান্নামে প্রবেশের জন্য। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ. قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا. وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا. وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জানো দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের মধ্যে সেই তো দরিদ্র যার টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তিই (সবচেয়ে) দরিদ্র হবে, যে দুনিয়া থেকে নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওইসব লোকও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারও নামে অপবাদ রটিয়েছে, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে প্রহার করেছে। সুতরাং এই হকদারকে তার সওয়াব থেকে হক প্রদান করা হবে, ওই হকদারকে তার সওয়াব থেকে হক প্রদান করা হবে। এভাবে হকদারদের পাওনা পরিশোধ করার আগে যদি তার সওয়াব নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তাদের গুনাহসমূহ ওই ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২৫১]

২৫১. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয যুল্‌ম; হাদিস নং-২৫৮১, *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৪১৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮০১৬।

না, সে চারিত্রিক গুণ অর্জন করতে পারেনি। শিশুরা কখনো কখনো নামাযের কার্যগুলো অনুশীলন করে, নামাযের কথাগুলো আওড়ায়, অভিনেতারা কখনো কখনো বিনয় প্রকাশে ও গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় কাজ করতে সক্ষম হয়; কিন্তু শিশুদের ভাঙাচোরা অনুশীলন এবং অভিনেতার অভিনয়ের বাইরে এসে কিছু কাজ বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে কোনো ভূমিকা রাখে না।[২৫২]

এসব শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ইসলামি সভ্যতা জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, জীবনকে নান্দনিকতায় ভরিয়ে তুলেছে। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীরা বলেছেন, সচ্চরিত্র মানুষ নিজে সুখে ও স্বস্তিতে থাকে, অন্যরাও তার থেকে নিরাপদ থাকে। অসচ্চরিত্র লোকের কারণে মানুষ বিপদে পড়ে এবং সে নিজেও থাকে যন্ত্রণায়-দুর্দশায়।[২৫৩]

---

২৫২. মুহাম্মাদ গাযালি, *খুলুকুল মুসলিম*, পৃ. ১১।
২৫৩. মাওয়ারদি, *আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ-দ্বীন*, পৃ. ২৫২।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অনুপম রুচিবোধ

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, রুচিবোধ বলতে বোঝায় স্বচ্ছ-নির্মল অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে, যার ফলে একজন ব্যক্তি অন্যদের অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যত্নশীল থাকে। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণের এটাই হলো আদবকেতা। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি সুন্দর বিদ্যা।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সুন্দর রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটে তার কিছু নমুনা তুলে ধরেছি। ইসলামি সভ্যতা এসব রুচিশীলতার প্রবর্তন করেছে। এখন আমরা কিছু শিরোনাম উল্লেখ করব যেগুলো ইসলামি সভ্যতায় চারিত্রিক সৌজন্য ও রুচিবোধের সৌন্দর্য প্রকাশ করে।

অন্যদের অনুভূতিকে আহত না করার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয়:

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে সরাসরি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত থাকতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, مَا بَالُ أَقْوَامٍ–'লোকদের কী হলো...।'[২৫৪]

---

২৫৪. ইমাম *বুখারি* হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—
আয়িশা রা. বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ, সফরে রোযা ভাঙলেন) এবং তা করার জন্য অন্যদেরও অনুমতি (রুখসত) দিলেন। তা সত্ত্বেও কিছু লোক রোযা ভাঙা থেকে বিরত থাকল। এই খবর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌছল। ফলে তিনি খুতবা দিলেন, প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, 'সে-সকল লোকের কী হলো যারা আমি যে কাজ করি তা থেকে বিরত থাকে? আল্লাহর কসম, তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি জানি এবং তাদের চেয়ে তাঁকে বেশি ভয় করি।' (সুতরাং যে কাজ করতে আমি দ্বিধা করি না সে কাজ করতে সে দ্বিধা করবে কেন?) *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মান লাম ইয়ুওয়াজিহুন নাসা বিল-ইতাব, হাদিস নং ৬১০১। উদাহরণ হিসেবে আরও দেখা যেতে পারে, *বুখারি*, কিতাব, কিতাব আল-বুয়ু, বাব : ইযা ইশতারাতা শুরুতান ফিল-বাইয়ি লা তাহিল্লু, হাদিস নং ২০৬০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইত্‌ক, ইন্নামাল ওয়ালাউ লিমান আ'তাকা, হাদিস নং ১৫০৪।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ»

যখন তোমরা তিনজন একসঙ্গে থাকবে তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে চুপে চুপে কথা বলবে না—অন্য লোকদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত। এটা এ জন্য যে, তা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে।[২৫৫]

বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ এবং মানুষকে যথোপযুক্ত মর্যাদাদানে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

উবাদা ইবনে সামিত রা. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا»

যে লোক আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[২৫৬]

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ»

যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[২৫৭]

---

২৫৫. *বুখারি*, বাব : ইযা কানু আকসারা মিন সালাসাতিন ফালা বা'সা বিল মুসাওয়াতি ওয়াল-মুনাজাতি, হাদিস নং ৫৯৩২; কিতাব : আস-সালাম, বাব : তারহিম মুনাজামুসাররাতি-ইসনাইনি দুনাস-সালিসি বিগাইরি রিদাহু, হাদিস নং ৩৮।

২৫৬. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : রহমাতুস সিবয়ান, হাদিস নং ১৯১৯। তিনি বলেছেন, এটা গরিব হাদিস। *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৪৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৬৭৩৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৪২১।

২৫৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : শুকরুল মারুফ, হাদিস নং ৪৮১১; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৯৫৪; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৪৯৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৩৪০৭।

কারও বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

বেড়াতে যাওয়া-সংক্রান্ত আয়াতে দুটি শর্ত দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾

> হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।[২৫৮]

কারও বাড়িতে বা ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রার্থনা ইসলামের রুচিশীলতার একটি দিক। কিন্তু এই আয়াত মানুষের অভ্যন্তরীণ সৌজন্যবোধের কথাও বলছে, সেটা হলো ইসতিনাস বা যাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে তাদের আগ্রহ বোঝার চেষ্টা করা। এটি অনুমতি প্রার্থনার চেয়ে সূক্ষ্ম ব্যাপার। এর অর্থ এই যে, বাড়ির মালিক বা লোকদের আগ্রহ ও অভিপ্রায় কী–মেহমানদের বেড়াতে যাওয়া নাকি না যাওয়া–সেটা অবহিত হওয়া ও অনুধাবন করা। গিয়ে সরাসরি অনুমতি চাওয়ার চেয়ে এতে বেশি সৌজন্যবোধ প্রকাশ পায়।[২৫৯]

অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে আরেকটি রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এটা করেছিলেন। একজন আনসারি সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। দাওয়াতে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে একজন লোক গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ির মালিককে বললেন,

«إِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فقال: لا، بل قد أَذِنْتُ لَهُ»

---

২৫৮. সুরা নুর : আয়াত ২৭।

২৫৯. আবু হাইয়ান, *তাফসিরুল বাহরিল মুহিত*, খ. ৬, পৃ. ৪৪৫, ৪৪৬।

এই লোকটাও আমাদের সঙ্গে এসেছে। তুমি তাকে অনুমতি দিতে চাইলে অনুমতি দিতে পারো। আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক তাহলে সে ফিরে যাবে। মেযবান বললেন, না, আমি তাকে অনুমতি দিলাম।(২৬০)

খাদেম ও পরিচারকদের ডাকার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي. كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي»

তোমাদের কেউ যেন কখনো 'আমার বান্দা', 'আমার বাঁদি' না বলে। কারণ তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের নারীরা সবাই আল্লাহর বাঁদি। বরং তোমাদের বলা উচিত : আমার গোলাম (বেটা), আমার জারিয়া (বেটি), আমার খাদেম, আমার খাদেমা ইত্যাদি।(২৬১)

নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

আসরাম নামের একটি লোক ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী? লোকটি বলল, আমি আসরাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তুমি বরং যুরআহ।(২৬২), (২৬৩)

---

২৬০. *বুখারি*, কিতাব : আল-বুয়ু, বাব : আস-সাহুলাহ ওয়াস-সামাহহি ফিশ-শিরা ওয়াল-বায়.., হাদিস নং ১৯৭৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আশরিবাহ, বাব : মা ইয়াফআলুদ-দাইফ ইযা তাবিআহু গাইরু মান দাআহু.., হাদিস নং ২০৩৬।

২৬১. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ইত্ক, বাব : কারাহিয়্যাতুত তাতাউল আলার-রাকিক ওয়া কাওলিহি : আবদি ওয়া আমাতি, হাদিস নং ২৪১৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আলফায মিনাল আদাব ওয়া গাইরিহা, বাব : হুকমু ইতলাকি লাফযিল-আবদ ওয়াল-আমাত, হাদিস নং ২২৪৯।

২৬২. আসরাম অর্থ কাটা বা কর্তিত। একই ধাতু থেকে সারিম, যার অর্থ কর্তিত ফসল বা যে-ভূমির ফসল কর্তন করা হয়েছে। শব্দটি কুলক্ষণযুক্ত ও হতাশাজনক। আর 'যুরআহ' অর্থ ফসল ও শস্য। এতে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।-অনুবাদক

২৬৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাগয়িরুল-ইসমিল কাবিহ, হাদিস নং ৪৯৫৪।

এক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? লোকটি বলল, 'হায্‌ন'। তিনি বললেন, তোমার নাম সাহ্‌ল।[২৬৪], [২৬৫]

স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

এই প্রসঙ্গে কিছু কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাহ্যিক রুচিবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি। এখানে আমরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রা. থেকে উম্মে যারআ-এর গল্প শোনার পর তার সঙ্গে কেমন সৌজন্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা উল্লেখ করব। উম্মে যারআ-এর গল্প নামে একটি প্রসিদ্ধ গল্প আছে। গল্পটি অনেক লম্বা। নবীজি মনোযোগ দিয়ে তা শুনলেন কিন্তু বিরক্ত হলেন না। অথচ তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের নেতা, তাঁর মাথায় বিভিন্ন চিন্তা ও সমস্যা ঘুরপাক খায়। গল্প শোনা শেষে তিনি এমন মন্তব্য করলেন যা শুনতে আয়িশা রা. ভালোবাসেন। তা ছাড়া এমন মন্তব্য ছিল সর্বোচ্চ রুচিবোধের প্রকাশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«يَا عَائِشَةُ، كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ، إِلا أَنَّ أَبَا زَرْعٍ طَلَّقَ، وَأَنَا لا أُطَلِّقُ»

হে আয়িশা, আমি তোমার জন্য তেমনই যেমন ছিলেন উম্মে যারআর জন্য আবু যারআ। তবে আবু যারআ উম্মে যারআকে তালাক দিয়েছিল, আমি তোমাকে তালাক দেবো না।[২৬৬]

মুশকিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার পক্ষ থেকে খাদ্যভরতি একটি পাত্র এলো। আয়িশা রা. সেই পাত্র উলটে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেললেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী আয়িশার সঙ্গে কেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করেছিলেন তা

---

[২৬৪]. হায্‌ন অর্থ: কঠোর, শক্ত; সাহ্‌ল অর্থ: কোমলতা, নম্রতা।-অনুবাদক

[২৬৫]. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসমুল হায্‌ন, হাদিস নং ৫৮৩৬; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৫৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৭২৩।

[২৬৬]. *বুখারি*: কিতাব; আন নিকাহ, বাব; হুসনুল মুআশারাতি মাআল আহলি, হাদিস নং ৪৮৯৩। *মুসলিম*: কিতাব; ফাদায়িলুস সাহাবা, বাব; যিকরু হাদিসি উম্মে যারআ, হাদিস নং ২৪৪৮।

এখানে উল্লেখযোগ্য। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ. ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ»

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনো স্ত্রীর ঘরে ছিলেন। এ সময় উম্মুল মুমিনিনদের অপর একজন বড় পাত্রে করে খাবার পাঠালেন। (এতে রাগ করে) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ঘরে ছিলেন তিনি খাদেমের হাতে আঘাত করলেন, ফলে পাত্রটি পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের টুকরোগুলো একত্র করলেন, তারপর তাতে যে খাদ্য ছিল তা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন, তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। খাদেমকে তিনি আটকে রাখলেন, যতক্ষণ না তিনি যার ঘরে ছিলেন তার থেকে একটি আস্ত পাত্র আনা হলো। তিনি আস্ত পাত্রটি তাকে দিলেন যার পাত্র ভাঙা হয়েছিল এবং ভাঙাটি তার ঘরে রেখে দিলেন যিনি তা ভেঙেছিলেন।[২৬৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদেমের সামনে তাঁর স্ত্রী আয়িশা রা.-কে ধমক দিলেন না, কোনো কড়া কথা বলে তার ব্যক্তিত্ববোধকে আহত করলেন না; বরং 'তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত

---

২৬৭. *বুখারি*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : আল-গাইরাহ, হাদিস নং ৪৯২৭; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৫৬৭; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৯৫৫; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২০৪৬।

হয়েছেন'[২৬৮] বলে তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন। লক্ষ করুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দচয়নেও আয়িশা রা.-এর প্রতি মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে; তিনি বলেছেন 'তোমাদের মা', অথচ 'এই মেয়ে তো ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে' বা 'আয়িশা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে' এরকম কিছু বলেননি।

এ ছাড়াও আরও বহু বিষয় রয়েছে যেখানে ইসলামি সভ্যতা সুন্দর রুচিশীলতা ও চারিত্রিক সৌজন্যের প্রবর্তন ঘটিয়েছে। ইসলামের আগে বা পরে কোনো জীবনদর্শনেই এসব ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিল না। ইসলামি সভ্যতার মানবিকতা, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বেরই পরিচায়ক এসব বিষয়।

---

২৬৮. একটি আরবীয় বাগধারা। এ কথা বলে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা-সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়।-অনুবাদক
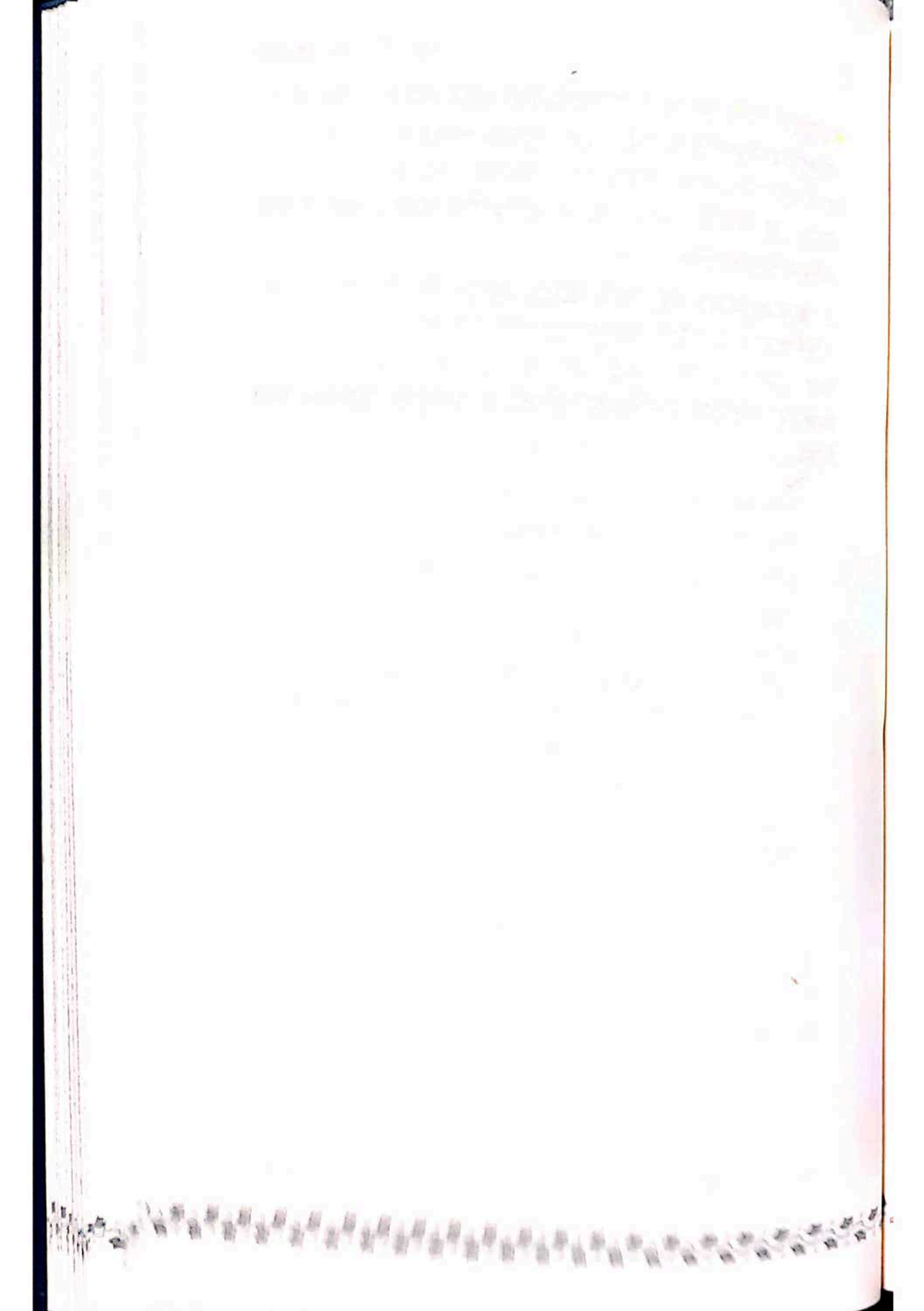
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাম, পদবি ও শিরোনামের সৌন্দর্য

মুসলিমদের মনমানস ও গোটা আবেগ-অস্তিত্বে ইসলামের সৌন্দর্যচেতনার ধারণা বদ্ধমূল ছিল। ফলে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সৌন্দর্যের আবিষ্কার ঘটে, পাশাপাশি বিদ্যমান নানান সৌন্দর্যে তাদের সংযোজনের মাধ্যমে সেগুলোর পূর্ণতা লাভ হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের কিছু অবদান মানবসভ্যতাকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের আরও চমৎকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের এই সৌন্দর্যচেতনা মানবজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। মোটকথা, ইসলামি সভ্যতায় এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়, নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যচেতনার মাধ্যমেই কেবল যেগুলোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

নিম্নবর্ণিত দুটি অনুচ্ছেদে আমরা উপর্যুক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : নাম ও উপাধির সৌন্দর্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরোনামের নান্দনিকতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

নাম ও উপাধির সৌন্দর্য[২৬৯]

যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল তাদের নামের সৌন্দর্যের ব্যাপারেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহী ও উদ্গ্রীব ছিলেন। বিশুদ্ধ অনেক বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, কারও নাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সমস্যার কারণে পছন্দনীয় না হলে তিনি তা পালটে আরও ভালো নাম রাখতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةُ»

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আসিয়া' (অবাধ্য) (নামক এক নারীর) নাম পরিবর্তন করে বলেন, তোমার নাম জামিলা (সৌন্দর্যের অধিকারী)।[২৭০]

তিনি যাহম ইবনে মাবাদ সাদুসির যাহম (চাপ) নাম পরিবর্তন করে তার নতুন নাম রাখেন বাশির (সুসংবাদদাতা)।[২৭১]

আলি রা. প্রথমে তার পুত্র হাসানের নাম রাখেন হারব (যুদ্ধ), নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন হাসান (উত্তম, সুদর্শন)। এরপর আলি রা. তার পুত্র হুসাইনের জন্মের

---

২৬৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আবু ইয়ালা বাইদাবি রচিত *হুসনুল মামুল বি-যিকরি মান গাইয়ারা আসমাআহুমুর রাসুল* গ্রন্থটি অধ্যয়নের পরামর্শ দেবো।

২৭০. *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসতিহবাবু তাগয়িরিল ইসমিল কাবিহ ইলাল হাসান..., হাদিস নং : ২১৩৯; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৫২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৮৩৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৪৬৮২।

২৭১. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : আল-মাশয়ু বাইনাল কুবুরি ফিন-নাল, হাদিস নং ৩২৩০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০৮০৭; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৭৭৫।

পর তারও নাম রাখেন হারব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন হুসাইন (উত্তম, সুদর্শন)।[২৭২]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরাম (কর্তিত) নাম পরিবর্তন করে রাখেন যুরআ (ফসল ও শস্য)। আবুল হাকাম (মহাবিচারক, যা আল্লাহর একটি নাম) নাম পরিবর্তন করে রাখেন আবু শুরাইহ (শুরাইহের পিতা; শুরাইহ ছিল সেই ব্যক্তির বড় ছেলের নাম)। তদ্রূপ আস (অবাধ্য), আযিয (মহাপরাক্রমশালী), আতালাহ (কঠোর), শয়তান (কল্যাণ বঞ্চিত; ইবলিসের নাম), আল-হাকাম (মহাবিচারক), গুরাব (কাক), হুবাব (সাপ) নামগুলোও পরিবর্তন করে ভিন্ন নাম রাখেন। শিহাব (উল্কা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) নাম পরিবর্তন করে রাখেন হিশাম (বদান্যতা)। হারব (যুদ্ধ) নাম পরিবর্তন করে রাখেন সালাম (শান্তি)। মুদতাজি (শায়িত) নাম পালটে রাখেন মুনবায়িস (উত্থিত)।

আফিরা (অনুর্বর ভূমি) নামক স্থানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন খাদিরা (সবুজ-শ্যামল ভূমি)। শিবুদ দলালাহ (বিভ্রান্তকারী গিরিপথ) নাম পরিবর্তন করে রাখেন শিবুল হুদা (পথপ্রদর্শনময় গিরিপথ)। বনু যিনয়াহ (জিনার বংশধর) গোত্রের নাম পালটে রাখেন বনু রিশদাহ (বৈধ বংশধর)। বনু মুগবিয়াহ (বিভ্রান্তকারীর বংশধর) গোত্রের নাম পরিবর্তন করে রাখেন বনু রিশদাহ (পথপ্রাপ্তের বংশধর)।[২৭৩]

ইমাম বুখারি রহ. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (সাইদের) দাদা হাযন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? সে বলল, হাযন (কঠোর)। তিনি বললেন, না, তোমার নাম সাহল (কোমল), কিন্তু সে বলল, আমার বাবা আমার যে নাম রেখেছেন সেটা আমি পালটাব না। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রা. বলেন, এরপর থেকে আমাদের মধ্যে কঠোরতাভাব থেকেই যায়।[২৭৪]

---

[২৭২]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৬৯; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮২৩; *বাইহাকি*, হাদিস নং ১১৭০৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৯৫৮।

[২৭৩]. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআদ*, খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

[২৭৪]. বুখারি, কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাহউইলুল ইসমি ইলা ইসমিন আহসানা মিনহু, হাদিস নং ৫৮৩৬।

নিজে নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে নাম নির্বাচনের ব্যাপারে নির্দেশনাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

«أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا : حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا : حَرْبٌ وَمُرَّةٌ»

আল্লাহ তাআলার কাছে আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আবদুর রহমান (দয়াবানের বান্দা) অত্যন্ত পছন্দনীয় নাম। (মানুষের নামসমূহের মাঝে) হারিস (অর্জনকারী) ও হাম্মাম (কর্মোদ্যোগী) অত্যন্ত বাস্তবসম্মত নাম এবং হারব (যুদ্ধ) ও মুররাহ (তিক্ত) অত্যন্ত মন্দ নাম।[(২৭৫)]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন জায়গার নামও পরিবর্তন করেছেন। যেমন, তিনি যখন হিজরত করেন তখন মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব (তিরস্কার, ভর্ৎসনা), তিনি তা পরিবর্তন করে তাইবাহ (উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) নাম রাখেন।[(২৭৬)]

যেসব জায়গার নাম মন্দ হতো তিনি সেগুলো অপছন্দ করতেন। সেগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়াও তিনি অপছন্দ করতেন। যেমন, একটি যুদ্ধে যাওয়ার সময় দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রমকালে তিনি পাহাড় দুটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবিগণ বললেন, ফাদিহ (লজ্জাদানকারী) ও মুখযি (অপমানকারী)। ফলে তিনি এ পথ অতিক্রম করলেন না।[(২৭৭)]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন, কেউ তাঁর কাছে দূত পাঠালে যেন এমন কাউকে পাঠায় যার নাম ভালো। তিনি বলেছেন,

«إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا؛ فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الاسْمِ»

---

২৭৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফি তাগয়িরিল আসমা, হাদিস নং ৪৯৫০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৯০৫৪; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮১৪।

২৭৬. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, হাদিস নং ৪৩১৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : আল-মাদিনাতু তানফি শিরারাহা, হাদিস নং ১৩৮৫।

২৭৭. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআদ*, খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

> যখন তোমরা আমার কাছে কোনো বার্তাবাহক পাঠাবে, এমন কাউকে পাঠাবে যার চেহারা-সুরত ভালো, নাম সুন্দর।[২৭৮]

ইসলামের ইতিহাসে খলিফা, সুলতান, উজির ও আমিরদের উপাধিগুলো ছিল এমন আঙ্গিকে, যেখানে সৌন্দর্য ও শক্তির সমন্বয় ঘটত। পক্ষান্তরে পূর্বকালে—অর্থাৎ প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর—নৃপতিদের উপাধি ছিল প্রতাপ ও পরাক্রমসর্বস্ব; ভীতি ও আতঙ্ক সঞ্চারই ছিল সেসব উপাধির উদ্দেশ্য। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের উপাধি নিষিদ্ধ করেছে। যেমন হাদিসে এসেছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ»

> আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত ঘৃণিত নাম বলে বিবেচিত হবে কোনো ব্যক্তির জন্য নির্বাচিত মালিকুল আমলাক (রাজাধিরাজ) নাম।[২৭৯]

এ কারণেই বিভিন্ন মুসলিম খলিফা ও সুলতান (বিনয়প্রদর্শনপূর্বক) এমনসব উপাধি ধারণ করেছেন যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার নামের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে। অষ্টম আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয়প্রাপ্ত) এই ধারার সূচনা করেন। তারপর অন্যরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যেমন : মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (আল্লাহর ওপর ভরসাকারী), মুসতায়িন বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী), মুনতাসির বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যে জয়লাভকারী), মুকতাদির বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যে শক্তিশালী), মুসতানসির বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী), মুসতাসিম বিল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থী), মুসতাদিউ বি-নুরিল্লাহ (আল্লাহর আলোয় আলোকিত), নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ (আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী) ইত্যাদি।

পাশাপাশি উজির, আমির, আলেম ও সেনাপতিদের মধ্যে নিম্নরূপ উপাধি চালু ছিল : নুরুদ্দিন (দ্বীনের আলো), নাজমুদ্দিন (দ্বীনের তারকা),

---

২৭৮. তাবারানি, *আল-আওসাত*, খ. ৭, পৃ. ৩৬৭; ইবনে হাজার আসকালানি, *আল-মাতালিবুল আলিয়া*, খ. ১১, পৃ. ৬৮৫, হাদিস নং ২৬৫৮।

২৭৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আবগাদুল আসমা ইলাল্লাহ, হাদিস নং ৫৮৫২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাহরিমুত তাসাম্মি বি-মালিকিল আমলাক ওয়া মালিকিল মুলুক, হাদিস নং ২১৩৪।

শামসুদ্দিন (দ্বীনের সূর্য), জিয়াউদ্দিন (দ্বীনের আলো), শিহাবুদ্দিন (দ্বীনের অগ্নিশিখা), বদরুদ্দিন (দ্বীনের চাঁদ), সাইফুদ্দিন (দ্বীনের তরবারি), সালাহুদ্দিন (দ্বীনকে যথাযথ স্থানে স্থাপনকারী), কল্বুদ্দিন (দ্বীনের হৃদয়), হুসামুদ্দিন (দ্বীনের ধারালো তরবারি), সদরুদ্দিন (দ্বীনের বক্ষ), ফখরুদ্দিন (দ্বীনের গর্ব), ইযযুদ্দিন (দ্বীনের মর্যাদা), রুকনুদ্দিন (দ্বীনের খুঁটি) ইত্যাদি।

মোটকথা, নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার পরিচয় প্রদান ছিল ইসলামি সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি এর মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়, এই সভ্যতা মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও ছোট-বড় সকল বিষয়কেই তার সৌন্দর্যের আচ্ছাদনে ঢেকে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শিরোনামের নান্দনিকতা

এই দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মানুষ তারাই যারা দ্বীন সম্পর্কে অধিক জানেন, তথা আলেম-উলামা। ফলে আমরা দেখি, ইসলামি সভ্যতার আলেমগণের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি এমন অনন্য অনুভূতি বিদ্যমান ছিল, অন্যান্য সভ্যতার জ্ঞানী লোকেরা যে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হননি।

মুসলিম আলেম ও মনীষীদের রচিত ফিকহ, সিরাত, হাদিস, আকিদা, জীবনচরিত, স্তরবিন্যাসভিত্তিক জীবনচরিত ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাবলির মাধ্যমে আমরা মানবেতিহাসের ব্যাপারে অবগত হতে পারছি। বস্তুত এসব গ্রন্থের শিরোনামও সৌন্দর্যের একেকটি টুকরো হয়ে উঠেছে। (মানবসভ্যতার যুগযাত্রায় আগে এমনটি কখনো দেখা যায়নি।)

ইসলামি সভ্যতার আলেম ও মনীষীগণ তাদের রচনাবলির শিরোনামেও নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটানোর প্রতি যত্নবান ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তারা শিরোনামে শব্দ-বাক্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তারা দু-ভাগবিশিষ্ট অন্ত্যমিলযুক্ত শিরোনাম তৈরি করতেন, যেগুলোর একটি অপরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, ফলে উচ্চারণের সময় একটি চমৎকার ধ্বনিসুষমার সৃষ্টি হতো। এমন শিরোনামের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আমরা এখানে তার কিছু উল্লেখ করব। যেমন :

الصارم المسلول على شاتم الرسول (*আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল*)। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের শিরোনাম। এতে তিনি সে-সমস্ত লোকের বিধান বর্ণনা করেছেন, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়।

ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওযিয়্যাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) গুনাহের প্রকারভেদ ও তার ক্ষতি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার শিরোনাম : الجواب

الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (*আল-জাওয়াবুল কাফি লি-মান সাআলা আনিদ-দাওয়ায়িশ শাফি*)।

আন্দালুসীয় গ্রানাডা শহরের ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব (মৃ. ৭৭৬ হি.), যার নাম الإحاطة في أخبار غرناطة (*আল-ইহাতাহ ফি আখবারি গারনাতাহ*)।

তার সামসময়িক হাকিমুত তারিখ (ইতিহাস-প্রাজ্ঞ) ইবনে খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি.) তার ইতিহাসগ্রন্থের নাম রেখেছেন العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (*আল-ইবার ওয়া-দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি ফি তারিখিল আরাবি ওয়াল-বারবারি ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিশ শানিল আকবার*)।

মিশরীয় ইতিহাসবিদ মাকরিযি (মৃ. ৮৪৫ হি.) কায়রোর স্থাপত্য ও নকশাশৈলী বর্ণনা করে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (*আল-মাওয়ায়িযু ওয়াল-ইতিবার বি-যিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*)।

কালকাশান্দি (মৃ. ৮২১ হি.) রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আইনকানুন সম্পর্কে আলোচনা করে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম مآثر الإنافة في معالم الخلافة (*মাআসিরুল ইনাফাহ ফি মাআলিমিল খিলাফা*)।

হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর মধ্যে আমরা পাই, ইবনে হাজার আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.) কর্তৃক রচিত فتح الباري شرح صحيح البخاري (*ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি*) এবং ইমাম নববি (মৃ. ৬৭৬ হি.) কর্তৃক রচিত المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (*আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*)। আরও পাই শামসুল হক আজিমাবাদি (মৃ. ১৩২৯ হি.) কর্তৃক রচিত عون المعبود شرح سنن أبي داود (*আউনুল মাবুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ*) এবং আবদুর রহমান মুবারকপুরি (মৃ. ১৩৫৩ হি.) কর্তৃক রচিত تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (*তুহফাতুল আহওয়াযি শারহু জামিয়িত তিরমিযি*)।

আকিদা এবং সে বিষয়ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা পাই ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসি (মৃ. ৪৫৬ হি.) কর্তৃক রচিত الفصل في الملل والأهواء والنحل (*আল-ফাসলু ফিল-মিলাল ওয়াল-আহওয়ায়ি ওয়ান-নিহাল*), হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালি (মৃ. ৫০৫ হি.) কর্তৃক রচিত الاقتصاد في الاعتقاد (*আল-ইকতিসাদ ফিল-ইতিকাদ*); ইমাম আশআরি (মৃ. ৩২৪ হি.) কর্তৃক রচিত الإبانة عن أصول الديانة (*আল-ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ*)।

তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঘটে যাওয়া বিরোধ সম্পর্কে পাই ইমাম ইবনে হাজার হাইতামির (মৃ. ৯৭৩ হি.) গ্রন্থ تطهير الجنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان مع المدح الجلي وإثبات الحق لعلي (*তাতহিরুল জানানি ওয়াল-লিসান আন সালবি মুআবিয়া ইবনি আবি সুফয়ান মাআল মাদহিল জালি ওয়া ইসবাতিল হাক্কি লি-আলি*)।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোর মুসলিম আলেম ও মনীষীগণও তাদের রচিত গ্রন্থাবলিতে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

তাদের রচিত গ্রন্থাবলির শিরোনামে আরও একটি দিক সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে। বস্তুত তারা কেবল সাংগীতিক ধ্বনির ক্ষেত্রেই গুরুত্বারোপ করেননি, বরং সেখানে শব্দের অর্থগত নান্দনিক চিত্রও ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন, তাদের গ্রন্থাবলির জন্য চয়নকৃত শিরোনামের মাঝে রয়েছে সোনা-রুপা, মণি-মুক্তা, তারকা-চাঁদ-সূর্য, সাগর-নদী-নালা, বৃক্ষ-ডালপালা, ফুল-ফল ইত্যাদি নান্দনিক শব্দের ব্যবহার। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এ সমস্ত নান্দনিক শব্দ সেসব গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলোতে নিরেট তাত্ত্বিক আলোচনা ও একাডেমিক কথাবার্তা স্থান পেয়েছে; আর স্বভাবতই এ ধরনের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাঠখোট্টা ও নিরস প্রকৃতির হওয়া। এতৎসত্ত্বেও রচয়িতাদের সেই সৌন্দর্যচেতনা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুগুলোতেও ইসলাম যার প্রকাশ ঘটাতে চায়, তার প্রভাবে এসব কাঠখোট্টা আলোচনার চেহারাতেও সৌন্দর্যের ইসলামি আভিজাত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করব। যথা :

সোনা ও মণিমুক্তা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে তারিখুত তাবারির পরে সবচেয়ে বড় বিশ্বকোষ হলো মাসউদি (মৃ. ৩৪৬ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ مروج الذهب ومعادن الجوهر (সোনার বাগিচা ও জহরতের খনিরূপী গ্রন্থ)।

ইমাম আবদুর রহমান সাআলিবির (মৃ. ৮৭৫ হি.) তাফসিরগ্রন্থের নাম الجواهر الحسان في تفسير القرآن (কুরআন ব্যাখ্যায় সুদর্শন মাণিক্যের সমারোহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ইমাম ইবনে আবদুর বার (মৃ. ৪৬৩ হি.) একটি অনন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম الدرر في اختصار المغازي والسير (সংক্ষিপ্তসার যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় মণিমাণিক্যের সমারোহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

আবদুল কাদির কুরাশি (মৃ. ৭৭৫ হি.) হানাফি মাজহাবের মনীষীদের জীবনচরিতমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (হানাফি আলেমদের স্তরবিন্যাসমূলক চরিতাভিধানে মণিমাণিক্যের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

মামলুকি শাসনামল সম্পর্কে ইতিহাস লিখেছেন আবু বকর দাওয়াদারি (মৃ. ৭১৩ হি.)। তার গ্রন্থের শিরোনাম চমৎকার : كنز الدرر وجامع الغرر (মাণিক্যের ভান্ডার ও সমুজ্জ্বল নিদর্শন একীভূতকারী গ্রন্থ)।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি হিজরি অষ্টম শতকের মনীষীদের নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন, যার নাম الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (অষ্টম শতাব্দীর মনীষীদের চরিতাভিধানে সুপ্ত মণি-মুক্তার সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (মৃ. ৯১১ হি.) কুরআনের তাফসির লিখে তার গ্রন্থের নাম দিয়েছেন الدر المنثور في التفسير بالمأثور (বর্ণনামূলক তাফসির রচনায় ছড়ানো-ছিটানো মণি-মুক্তার সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইবনুল ইমাদ হাম্বলি (মৃ. ১০৮৯ হি.) ইতিহাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম شذرات الذهب في أخبار من ذهب (বিগতদের চরিত বর্ণনায় টুকরো-টুকরো সোনা একত্রকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সুয়ুতির অন্য একটি গ্রন্থের নাম اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (জাল হাদিস রচনায় বানোয়াট মণি-মুক্তার পরিচয় প্রদানকারী গ্রন্থ)।

সামিন হালাবির (মৃ. ৭৫৬ হি.) উলুমুল কুরআন বিষয়ে একটি গ্রন্থের নাম الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (সুরক্ষিত গ্রন্থের আলোচনায় সযত্নে রক্ষিত মোতিমালা প্রকাশকারী গ্রন্থ)।

আলাউদ্দিন মুত্তাকি হিন্দি (মৃ. ৯৭৫ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (সুন্নতের ওপর আমলকারীদের ধনভান্ডার)।

হানাফি মাজহাব বিষয়ে আবুল বারাকাত নাসাফি (মৃ. ৭১০ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম كنز الدقائق (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলির ভান্ডার নির্দেশক গ্রন্থ)।

মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি (মৃ. ১৯৬৮ খ্রি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (শাইখানের[২৮০] গ্রন্থে একাত্মভাবে বর্ণিত হাদিসের উল্লেখে মণি-মুক্তা ও প্রবালের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

আলোক, আকাশ, তারা-নক্ষত্র ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

কালকাশান্দি সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিশ্বকোষ রচনা করে তার নাম দিয়েছেন صبح الأعشى في صناعة الإنشا ([দাপ্তরিক] রচনাকার্যে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্নের জন্য প্রভাত সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইবনে তাগরি বারদি (মৃ. ৮৭৪ হি.) ইতিহাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (কায়রো ও

---

২৮০. এখানে শাইখান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমাম বুখারি রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.। মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি রচিত গ্রন্থের নামটির মর্ম হচ্ছে, যে-সমস্ত হাদিস উভয় ইমাম নিজেদের গ্রন্থ তথা *বুখারি* ও *মুসলিমে* বর্ণনা করেছেন, সেগুলো চিহ্নিত করে গ্রন্থ রচনা।-সম্পাদক

মিশরের রাজন্যদের চরিত রচনায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমারোহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

শামসুদ্দিন শিরবিনি (মৃ. ৯৭৭ হি.) কুরআনুল কারিমের যে তাফসির রচনা করেছেন তার নাম السراج المنير (সমুজ্জ্বল প্রদীপ-তুলনীয় গ্রন্থ)।

কুরআনের কেরাত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন আবু হাফস সিরাজুদ্দিন নাশশার (মৃ. ৯৩৮ হি.), যার নাম البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (মুতাওয়াতির দশ কেরাত বর্ণনায় সমুজ্জ্বল চাঁদের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

শাফিয়ি মাজহাবের ওপর *'আল-ফাতহুল আযিয ফি শারহিল ওয়াজিয'* নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম আবুল কাসিম রাফিয়ি (মৃ. ৬২৩ হি.), এই গ্রন্থে যেসব হাদিস ও আসার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর তাখরিজ (সূত্রনির্দেশ) করতে বড় ধরনের প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি.)। তিনি তার এই প্রচেষ্টার নির্যাস তথা গ্রন্থের নাম রেখেছেন البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (শরহুল কাবির গ্রন্থে উল্লেখিত হাদিস ও আসারের সূত্রনির্দেশে সমুজ্জ্বল চাঁদের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি (মৃ. ৪৭৮ হি.) উসুলুল ফিকহ বিষয়ে *'আল-ওয়ারাকাত'* নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন ইমাম শামসুদ্দিন মারিদিনি (মৃ. ৮৭১ হি.)। তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ওয়ারাকাত পুস্তিকার শব্দ বিশ্লেষণে আলোকিত নক্ষত্রমালা একত্রকারী গ্রন্থ)।

ইমাম ইবনুল কাইয়াল (মৃ. ৯২৯ হি.) সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে যাদেরকে অমূলকভাবে 'ইখতিলাতসম্পন্ন' (অর্থাৎ, তারা হাদিস একটির সঙ্গে অপরটি গুলিয়ে ফেলতেন) বলা হয়েছে, তাদের নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম الكواكب النيرات في معرفة من رمي بالاختلاط من الرواة الثقات (সিকাহ বর্ণনাকারীদের মাঝে যাদের ইখতিলাতসম্পন্ন বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় প্রদানে জ্যোতির্ময় তারকামালার সমাবেশ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি উসুলুল ফিকহকে কাব্যগ্রন্থ আকারে সংকলন করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (জামউল জাওয়ামি গ্রন্থের কাব্যবিন্যাসে আলোঝলমল তারকার উদয় সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সুয়ুতির আরেকটি গ্রন্থের নাম البدور السافرة في أمور الآخرة (আখেরাতের বিষয়াবলি আলোচনায় সুস্পষ্ট চাঁদের সমাবেশ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম শামসুদ্দিন সাফফারিনি (মৃ. ১১৮৮ হি.) তার আকিদা বিষয়ক গ্রন্থের আকর্ষণীয় এক নাম রেখেছেন, لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (আদ-দুররাতুল মুদিয়্যাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় মনোরমরূপে আলোকদীপ্ত ও আসারি আকিদার দুর্বোধ্য বিষয়াবলি সুস্পষ্টকারী গ্রন্থ)।

সমুদ্র-নদী-নালা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

আমাদের ইসলামি সভ্যতায় ইলম ও জ্ঞানের প্রাচুর্য-গভীরতা বোঝানোর জন্য 'সমুদ্র' শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। জীবনচরিতের গ্রন্থাবলিতে বহু আলেম ও মনীষী ব্যক্তিকে 'সমুদ্র' বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। যেমন, 'অমুক ইলমের সমুদ্র' বা 'অমুকের চারপাশ থেকে ইলমের ধারা উৎসারিত হয়'। এ ছাড়াও এ জাতীয় নানান নান্দনিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'ইলমের প্রস্রবণ' বা 'ইলমের ঝরনা' ইত্যাদি। এ ধরনের প্রাকৃতিক উপমার মাধ্যমে মূলত সেসব বস্তুর গভীরতা ও বিস্তৃতির অর্থটি উপমিত ব্যক্তির মাঝে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থেও এমন উপমাময় শিরোনাম ব্যবহার করে গ্রন্থের মূল বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন :

ইমাম ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ হালাবি (মৃ. ৯৫৬ হি.) হানাফি মাজহাব বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার নান্দনিক শিরোনাম দেন : ملتقى الأبحر (সাগরসমূহের মিলনস্থলসদৃশ গ্রন্থ)।

আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শায়িখ যাদাহ (মৃ. ১০৭৮ হি.) এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন এবং তার নাম দেন مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (মুলতাকাল আবহুর গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নদনদীর সমাবেশসদৃশ গ্রন্থ)।

ইমাম বদরুদ্দিন ইবনে জামাআহ (মৃ. ৭৩৩ হি.) হাদিসশাস্ত্র বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম রাখেন المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (উলুমুল হাদিসের সংক্ষিপ্তসার প্রচেষ্টায় তৃষ্ণানিবারক ঝরনাসদৃশ গ্রন্থ)।

আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে তাগরি বারদি তার সমকালীন মনীষীদের জীবনচরিত সংকলন করে তার নাম দিয়েছেন المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত গ্রন্থের পর [বৈষয়িক] পরিপূর্ণতাদানকারী ও নির্মল ঝরনাতুল্য গ্রন্থ)।

ইমাম যাইনুদ্দিন ইবনে নুজাইম হানাফি (মৃ. ৯৭০ হি.) হানাফি মাজহাব বিষয়ক গ্রন্থ *'কানযুদ দাকায়িক'*-এর ব্যাখ্যা রচনা করে, তার নাম দিয়েছেন البحر الرائق شرح كنز الدقائق (কানযুদ দাকায়িক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নির্মল সমুদ্রতুল্য গ্রন্থ)।

ইমাম আবু হাইয়ান আন্দালুসি কুরআনের তাফসির রচনা করে তার নাম দিয়েছেন البحر المحيط (মহাসাগর)। এই একই নামে ইমাম বদরুদ্দিন যারকাশিও (মৃ. ৭৯৪ হি.) উসুলুল ফিকহের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

শাইখ শানকিতির (মৃ. ১৩৯৩ হি.) তাফসিরগ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে এই নামে : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (শাইখ শানকিতির তাফসির-মজলিস থেকে প্রাপ্ত স্বচ্ছ, সুমিষ্ট বিষয়াবলি একীভূতকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সমরকন্দির একটি তাফসিরগ্রন্থ রয়েছে এই নামে, بحر العلوم (ইলমের সাগর)।

বাগান, ফুল, ফল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

ইমাম ইবনে হিব্বান (মৃ. ৩৫৪ হি.) উপদেশ বিষয়ক ও আল্লাহর প্রতি হৃদয় গলানো-উপযোগী যে গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম, روضة العقلاء ونزهة

الفضلاء (জ্ঞানীগুণীদের জন্য বাগিচায় বিচরণ ও প্রমোদভ্রমণের অনুভূতি সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সুহাইলি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম, الروض الأنف (অবিচরিত বাগান)।

উপদেশমূলক ইবনুল জাওযির একটি গ্রন্থের নাম, بستان الواعظين ورياض السامعين (উপদেশদানকারী এবং উপদেশ শ্রবণকারীদের জন্য বাগানসদৃশ গ্রন্থ)।

নুরি সাম্রাজ্য ও সালাহি সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন শিহাবুদ্দিন আবু শামাহ (মৃ. ৬৬৫ হি.)। তিনি সেই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন, الروضتين في أخبار الدولتين (দুই সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় দুই বাগিচা সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম নববি (মৃ. ৬৭৬ হি.) রচিত একটি গ্রন্থে তিনি ইসলামি আমলসমূহের ফজিলত ও ইসলামি শিষ্টাচারসমূহ একত্র করার চেষ্টা করেছেন। তার এই গ্রন্থের নাম, رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (নবীসর্দারের বাণী উল্লেখে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য বহু বাগিচাসমন্বিত গ্রন্থ)।

এ ছাড়া শাফিয়ি মাজহাব বিষয়ে রচিত তার গ্রন্থের নাম, روضة الطالبين وعمدة المفتين (তালেবে ইলমের জন্য বাগানস্বরূপ এবং ফতোয়া প্রদানকারীদের জন্য খুঁটিতুল্য গ্রন্থ)।

আবু আবদুল্লাহ হিময়ারি (সম্ভাব্য মৃ. ৯০০ হি.) ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ লিখে তার নাম দিয়েছেন, الروض المعطار في خبر الأقطار (অঞ্চলসমূহের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় সুবাসিত বাগান সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

আল্লাহর প্রতি মনগলানো উপদেশভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ। তার গ্রন্থের নাম, روضة المحبين ونزهة المشتاقين ([আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের] প্রেমিকদের জন্য বাগানস্বরূপ ও [তাঁদের প্রতি] উৎসাহীদের জন্য প্রমোদভ্রমণের অনুভূতি সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

এরূপ আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম ইবনুল জাযারি (মৃ. ৮৩৩ হি), যার নাম, الزهر الفاتح في من تنزه عن الذنوب والقبائح (গুনাহ ও মন্দাচার থেকে পবিত্রদের জন্য মুকুলিত পুষ্পের ন্যায় গ্রন্থ)।

খিজির আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লিখেছেন হাফিজুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি। গ্রন্থটির নাম, الزهر النضر في أخبار الخضر (খিজিরের বর্ণনায় সজীব পুষ্পতুল্য গ্রন্থ)।

ইমাম সুয়ুতি আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে নিয়ে যে পুস্তিকা রচনা করেছেন তার নাম, الروض الأنيق في فضل الصديق (সিদ্দিকের মর্যাদা বর্ণনায় মনোরম বাগিচা সৃষ্টিকারী পুস্তিকা)।

মরক্কোর মিকনাস শহরের ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন ইবনে গাজি মিকনাসি (মৃ. ৯১৯ হি.)। তিনি তার নাম দিয়েছেন, الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون (মিকনাসা যাইতুনের ইতিহাস রচনায় প্রচুর ফল-ফুলবিশিষ্ট বাগানসদৃশ গ্রন্থ)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস (মৃ. ৯৩০ হি.) ইতিহাস বিষয়ে যে গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম, بدائع الزهور في وقائع الدهور (যুগ-যুগের ঘটনা বর্ণনায় অপূর্ব ফুলমালায় পূর্ণ গ্রন্থ)।

আহমাদ মাক্কারি (মৃ. ৭৫৮ হি.) আন্দালুসের ইতিহাসের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (আন্দালুসের তাজা ডালপালা থেকে ছড়ানো সুবাসময় গ্রন্থ)।

হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীতে মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে কান্নান (মৃ. ১১৫৩ হি.) খলিফা ও সুলতানদের রীতিনীতি ও আইনকানুনের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين (খলিফা ও সুলতানদের আইনকানুনের উল্লেখে জেসমিন ফুলে সুশোভিত বহু বাগানতুল্য গ্রন্থ)।

মুহাম্মাদ সিদ্দিক খান কনৌজি (মৃ. ১৩০৭ হি.) কর্তৃক রচিত শিয়া যায়দি মাজহাবের ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থের নাম, الروضة الندية شرح الدرر البهية (দুরারুল বাহিয়্যা গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাজা বাগানসদৃশ গ্রন্থ)।

উস্তাদ সাইয়িদ কুতুব তাফসিরগ্রন্থ রচনা করে তার নাম রাখেন, في ظلال القرآن (কুরআনের ছায়ায়)।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এমনকি শিরোনামে নান্দনিকতা চর্চার এই আধিক্য এ কথা প্রমাণ করে যে, ইসলামি জ্ঞানীগুণী সকলে এ ক্ষেত্রে প্রায় সর্বসম্মত মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। পাশাপাশি এটি জগদ্‌বাসী সবার মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করে যে, ইসলামি সভ্যতার মনীষীরা সৌন্দর্যচেতনায় ভাস্বর ছিলেন। বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহর সৌন্দর্যচেতনার দীপ্তিই তাদের অন্তরকে এ ক্ষেত্রে আলোকিত করে তুলেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ডোভা : একটি নান্দনিক ইসলামি শহরের নমুনা

খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কর্ডোভা উন্নতি ও অগ্রগতির দিক দিয়ে ইউরোপের সব শহর থেকে এগিয়ে ছিল। বাস্তবিক অর্থে কর্ডোভা ছিল পৃথিবীর বিস্ময় ও আশ্চর্যের কেন্দ্র। ঠিক সেরূপ, বলকান রাষ্ট্রগুলোর চোখে ভেনিস ছিল যেরূপ। উত্তর দিক থেকে যে-সকল পর্যটক আসতেন তারা সেই শহর (কর্ডোভা) সম্পর্কে এমন কথা শুনতেন, যার দ্বারা তাদের মনে শহরটি সম্পর্কে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগত। যেমন, সেই শহরে রয়েছে সত্তরটি গ্রন্থাগার, নয়শ গণগোসলখানা ইত্যাদি। লিওন, নাভার (Navarre), বার্সেলোনা ইত্যাদি শহরের নৃপতিদের যদি শল্যচিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, দরজি অথবা সংগীতজ্ঞের প্রয়োজন হতো, তবে তারা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য কর্ডোভারই দ্বারস্থ হতেন।[২৮১] একজন ব্রিটিশ গবেষক হিজরি চতুর্থ শতকের (খ্রিষ্টীয় দশম শতক) আন্দালুসীয় কর্ডোভার সভ্যতা ও উন্নতিকে এভাবেই চিত্রায়িত করেছেন। এই গবেষকের নাম জন ব্রান্ডি ট্রেন্ড (John Brande Trend 1887-1958)।

জ্ঞানবিজ্ঞান এবং মূল্যবোধ ও আভিজাত্যের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে যে ইসলামি মানবিক সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, তারই সুফলে উদিত হয় কর্ডোভা নামক নক্ষত্র। ইতিহাসের সে সময়ে মুসলিমদের সভ্যতা ও ইসলামের গৌরব-মর্যাদা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হলো কর্ডোভা।

---

২৮১. *The Legacy of Islam*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত, আরবি অনুবাদ, تراث الإسلام (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন : জারজিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ২৭।

অর্থাৎ হিজরি চতুর্থ শতক এবং খ্রিষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, যখন গোটা ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

কর্ডোভা–বহুদিন যাবৎ এই নামটি বিশেষ এক ধ্বনি ও প্রভাব নিয়ে সকল মুসলমানের কানে বাজত, বরং উত্থান ও মানবসভ্যতার উন্নয়নে বিশ্বাসী প্রতিটি ইউরোপীয় ব্যক্তিও এই নামের ঝংকারে আন্দোলিত হতো। আহমাদ মাক্কারি বলেন, আন্দালুসের কোনো আলেম নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করেছেন (কবিতাটি বাহরুল বাসিত নামক ছন্দে রচিত),

بِأَرْبَعٍ فَـاقَـتِ الأَمْصَارَ قُرْطُبَـةٌ ☆ مِنْهُنَّ قَنْطَرَةُ الْوَادِي وَجَـامِعُهَا

هَـاتَانِ ثِنْتَـانِ وَالزَّهْـرَاءُ ثَـالِثَـةٌ ☆ وَالْعِلمُ أَعْظَمُ شَيْءٍ وَهُوَ رَابِعُهَا

চার জিনিসে সর্ব শহরের ওপর কর্ডোভার মহত্ত্ব,
গোয়াদেল কুইভার [২৮২] সেতু ও কর্ডোভা জামে মসজিদ সেথায় অন্যতম;
এ দুই ছাড়িয়ে তৃতীয় স্থানে আছে সুশোভিত ফুলের বাগান,
চারে আসে ইলম ও জ্ঞানবিজ্ঞান, যা কর্ডোভার শ্রেষ্ঠ সোপান।[২৮৩]

নিচের অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা এক সৌন্দর্যখচিত নগরী কর্ডোভা সম্পর্কে জানতে পারব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : এক নজরে কর্ডোভার ভূগোল ও ইতিহাস

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : কর্ডোভায় অবস্থিত সভ্যতার নিদর্শন

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কর্ডোভা : এক আধুনিক শহর

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-সাহিত্যিকদের চোখে কর্ডোভা

---

২৮২. 'গোয়াদেল কুইভার' স্পেনের একটি নদীর নাম। নদীটির আরবি নাম আল-ওয়াদিউল কাবির, বর্তমান উচ্চারণটি তার অপভ্রংশ।-অনুবাদক

২৮৩. মাক্কারি, নাফহুত তিব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতিব, খ. ১, পৃ. ১৫৩।

প্রথম অনুচ্ছেদ

এক নজরে কর্ডোভার ভূগোল ও ইতিহাস

কর্ডোভা স্পেনের দক্ষিণ অংশে গোয়াদেল কুইভার নদীর তীরে অবস্থিত। *আল-মাওরিদ আধুনিক বিশ্বকোষ* কর্ডোভার ইতিহাস বর্ণনা করে বলে, যতদূর জানা যায়, কর্ডোভা নগরীর গোড়াপত্তন করেছে কার্থেজীয়রা। পরে তা পর্যায়ক্রমে রোমান ও ভিজিগোথ (Visigoth) শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়।(২৮৪)

এরপর ৯৩ হিজরিতে (৭১১ খ্রিষ্টাব্দে) জগদ্‌বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি তারিক ইবনে যিয়াদ কর্ডোভা জয় করেন। ওই সময় থেকে কর্ডোভা নগরী নতুন পথে যাত্রা শুরু করে এবং সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে থাকে। একটি বৈশ্বিক সভ্য নগরীরূপে কর্ডোভা-নক্ষত্রের আলো দিন দিন উজ্জ্বল হতে থাকে। বিশেষ করে দামেশকে আব্বাসিদের হাতে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর (১৩৮ হিজরিতে/৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) আবদুর রহমান দাখিল(২৮৫) (মৃ. ১৭২ হি.) যখন আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

আন্দালুসে (৩১৬ হিজরিতে খেলাফত ঘোষণার পর) প্রথম উমাইয়া খলিফা আবদুর রহমান নাসির (মৃ. ৩৫০ হি.) এবং তারপর তার পুত্র হাকাম মুসতানসির বিল্লাহর (মৃ. ৩৬৬ হি.) যুগে কর্ডোভা তার উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার শিখরে পৌঁছে। বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বে নতুন মুসলিম খেলাফত শাসনের জন্য কেন্দ্রস্থল হিসেবে আবদুর রহমান কর্তৃক কর্ডোভাকে রাজধানী ঘোষণার কারণে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তিনি এই নগরীকে জ্ঞানবিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি আলোকবর্তিকারূপে গড়ে তোলেন। এমনকি কর্ডোভা নগরী একই মহাদেশে অবস্থিত বাইজান্টাইনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে, প্রাচ্যে

---

২৮৪. *মাওসুআতুল মাওরিদিল হাদিসাহ* (১৯৯৫)।

২৮৫. উপাধি : সাকরে কুরাইশ (কুরাইশের ঈগল)।

আব্বাসি খলিফাদের রাজধানী বাগদাদের সঙ্গে এবং আফ্রিকায় কায়রাওয়ান ও কায়রোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি অর্জন করে। অবশেষে কর্ডোভা এমন এক পর্যায়ে পৌছে যায় যে, ইউরোপীয়রা একে 'বিশ্বের মধ্যমণি' নামে আখ্যায়িত করে!

বড় বড় বিষয়ের পাশাপাশি উমাইয়া খলিফারা কর্ডোভার সার্বিক জীবনযাত্রার প্রতিও মনোনিবেশ করেছিলেন। যেমন : কৃষি, শিল্প, দুর্গনির্মাণ, অস্ত্রাগার তৈরি ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন খাল খনন এবং নর্দমা তৈরি করেন। আন্দালুসে এমন নানা জাতের গাছ ও ফলের আমদানি করেন, ইতিপূর্বে যেগুলো সেখানে রোপণ করা হতো না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কর্ডোভায় অবস্থিত সভ্যতার নিদর্শন

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিশেষত কর্ডোভা নগরী এবং ব্যাপকভাবে গোটা আন্দালুসের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতা নির্দেশক নানা নিদর্শন সম্পর্কে জানব। বস্তুত মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের অবদান কী, এর মাধ্যমে আমরা সে ব্যাপারেও কিছুটা আঁচ করতে পারব।

কর্ডোভার সেতু

সেখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ছিল কর্ডোভা-সেতু, যা গোয়াদেল কুইভার নদীর ওপর অবস্থিত। এটি 'জিসর' (সেতু) নামে, তদ্রূপ 'কানতারাতুদ দাহর' (যুগের সেতু) নামেও পরিচিত। সেতুটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় চারশ মিটার, প্রস্থ চল্লিশ মিটার এবং উচ্চতা ত্রিশ মিটার!

উমর ইবনে মুযাফফার ইবনুল ওয়ারদি (মৃ. ৭৪৯ হি.) এবং শরিফ ইদরিসি (মৃ. ৫৫৯ হি.) কর্ডোভা-সেতুর ব্যাপারে বলেন, এই সেতু তার নির্মাণশৈলী ও মজবুতি—উভয় দিক থেকেই সকল সেতুর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করে।[২৮৬]

এই সেতুর খিলান-সংখ্যা ছিল সতেরোটি, একেকটি খিলান থেকে অপর খিলানের দূরত্ব ছিল বারো মিটার। প্রতিটি খিলানের (এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে) প্রশস্ততা ছিল বারো মিটার এবং (নিজস্ব) প্রস্থ ছিল প্রায় সাত মিটার। নদীর জলসীমা থেকে খিলানগুলোর উচ্চতা ছিল পনেরো মিটার।[২৮৭]

উপর্যুক্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা ছিল এমন একটি সেতুর যা নির্মিত হয়েছিল হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে (১০১ হিজরি)। অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দশ বছর

---

২৮৬. ইবনুল ওয়ারদি, *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব*, পৃ. ১২; ইদরিসি, *নুযহাতুল মুশতাক*, খ. ২, পৃ. ৫৭৯।

২৮৭. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৪৮২।

পূর্বে![২৮৮] সেটা ছিল এমন একসময়, যখন মানুষের নিকট ঘোড়া-গাধা-খচ্চর ছাড়া পরিবহনব্যবস্থার আর কোনো মাধ্যম ছিল না। এ ছাড়া নির্মাণকাজের জন্য উন্নতমানের পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি ও উপাদানও ছিল না। ফলে এই কাঠামোতে নির্মিত সেতুটি হয়ে উঠেছিল ইসলামি সভ্যতার এক মহাগৌরবের বিষয়।

কর্ডোভার জামে মসজিদ

আল-জামিউল কাবির মসজিদটিকে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান কর্ডোভার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্প্যানিশ ভাষায় এর নাম মেজকুইটা (Mezquita)। এ শব্দটি মসজিদ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। এই মসজিদ আন্দালুসের সবচেয়ে বিখ্যাত মসজিদ ছিল (বস্তুত এ কারণেই এটি এখন খ্রিষ্টান ক্যাথিড্রালরূপে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে)। পাশাপাশি এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ হওয়ারও গৌরব অর্জন করে। ১৭০ হিজরি মোতাবেক ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু করেন আন্দালুসীয় উমাইয়া শাসক আবদুর রহমান দাখিল এবং নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন তার পুত্র প্রথম হিশাম। পরবর্তীকালে আন্দালুসের সব সুলতান ও খলিফাই আয়তন ও সৌন্দর্যে মসজিদটিকে সমৃদ্ধ করেন। ফলে এটি কর্ডোভার সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সে সময়ের সবচেয়ে বড় মসজিদও।

আর-রাওযুল মিতার গ্রন্থকার আবু আবদুল্লাহ হিময়ারি (সম্ভাব্য মৃ. ৯০০ হি.) মসজিদটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, কর্ডোভায় ছিল বিখ্যাত জামে মসজিদ। সুপ্রশস্ত আয়তন, মজবুত নির্মাণ, অপূর্ব শৈলী এবং নিখুঁত কাঠামোর দিক থেকে এটি ছিল গোটা দুনিয়ার সর্বোল্লেখযোগ্য মসজিদ। মারওয়ানি খলিফাগণ মসজিদটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তারা বার বার এর আয়তন বৃদ্ধি ও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে মসজিদটির চূড়ান্ত নিখুঁত রূপ পরিদৃষ্ট হয়। এর দিকে তাকালে চক্ষু বিস্ফারিত হতো, বর্ণনার মাধ্যমে এর সৌন্দর্য প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

---

২৮৮. এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল সামহ ইবনে মালিক খাওলানির হাতে, যিনি উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর পক্ষ থেকে আন্দালুসের গভর্নর ছিলেন।

কারুকার্য ও নকশায় এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মুসলিমদের কোনো মসজিদই এই মসজিদের সমকক্ষ ছিল না।
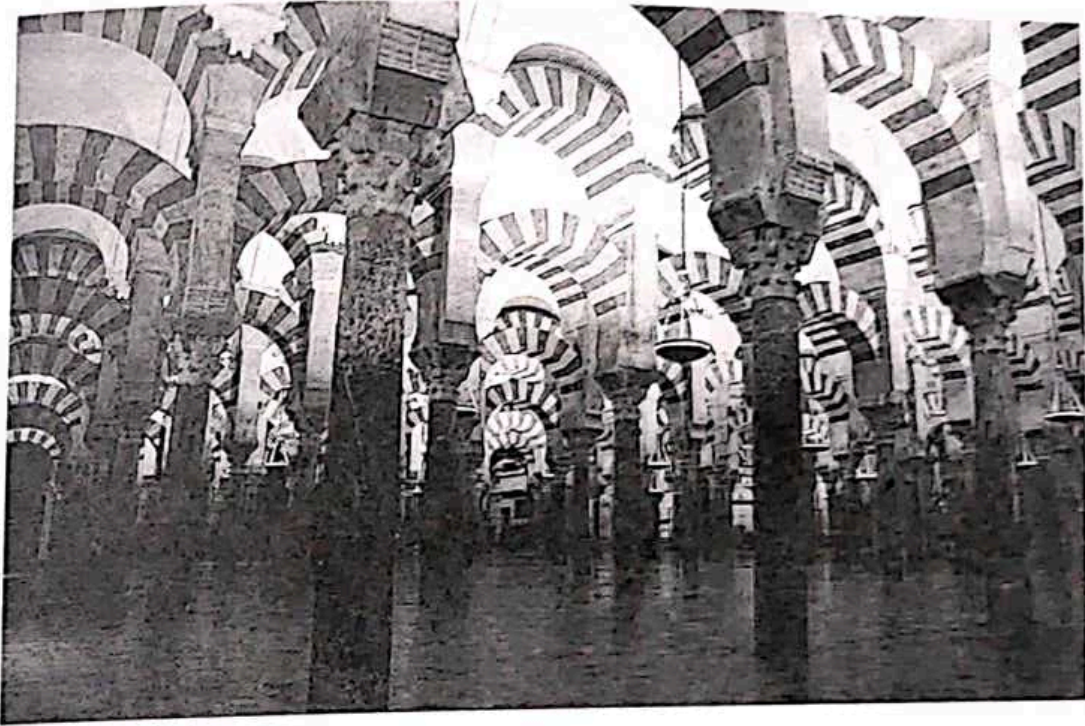
চিত্র নং-৩১
স্তম্ভ, কর্ডোভা জামে মসজিদ

মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ছিল একশ আশি 'বা'[২৮৯]। এর অর্ধেক ছিল ছাদযুক্ত অংশ এবং অপর অর্ধেক ছিল ছাদহীন চত্বর। ছাদযুক্ত অংশের খিলান-সংখ্যা ছিল চৌদ্দটি। ভবনসমূহের ছাদযুক্ত অংশের স্তম্ভ, ছোট-বড় গম্বুজগুলোর স্তম্ভ, বড় মিহরাবের ও তার আশপাশের স্তম্ভ—সব মিলিয়ে স্তম্ভের সংখ্যা ছিল এক হাজার। মসজিদটিকে আলোকিত করার জন্য ছিল একশ তেরোটি বাতির ঝাড়। সবচেয়ে বড় ঝাড়টি এক হাজার বাতি ধারণ করতে পারত, সবচেয়ে ছোট ঝাড়টির ধারণক্ষমতা ছিল বারোটি।

মসজিদে যেসব কাঠ ব্যবহৃত হয়েছিল তার সবই ছিল তরতুশা[২৯০] পাইন গাছের কাঠ। ঘরের ওপরের বিমগুলোর প্রস্থ ছিল এক বিঘত বাই তিন আঙুল কম এক বিঘত। দৈর্ঘ্যে প্রতিটি বিম ছিল সাঁইত্রিশ বিঘত। প্রতিটি বিমের মাঝে ছিল এক বিমের পুরুত্ব পরিমাণ দূরত্ব। মসজিদের ছাদে ছিল

---

২৮৯. ১ 'বা' = প্রসারিত দুই বাহুর পরিমাণ।-অনুবাদক

২৯০. তরতুশা (Tortosa) : তৎকালীন আন্দালুসের ও বর্তমানে স্পেনের একটি শহর। এ শহরে জন্মানো গাছের দিকে সম্পৃক্ত করে এই কাঠকে তরতুশি বলা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য ও নকশা, যেগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির কোনো মিল ছিল না। নকশা ও কারুকার্য বসানোর বিন্যাস ছিল যথাযথ। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, সুরমা ইত্যাদি নানা রঙের মিশেলে সেগুলো অপরূপ ছিল। মসজিদটির অনন্য শোভা চোখ ধাঁধিয়ে দিত। এর অনুপম নকশা ও এতে বিভিন্ন রঙের শৈল্পিক ব্যবহার চিত্তকে মোহিত করত। ছাদের একেকটি প্রস্তরফলকের প্রশস্ততা ছিল তেত্রিশ বিঘত, এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটির দূরত্ব ছিল পনেরো বিঘত এবং প্রতিটি খুঁটির মাথা ও ভিত্তিমূলটি ছিল মার্বেল পাথরের।

এই জামে মসজিদের যে মিহরাব ছিল তার (সৌন্দর্যের) বর্ণনা দেওয়া কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এর নিখুঁত নকশা ও কারুকার্য মানুষকে হতবুদ্ধি করে দিত। মিহরাবে সোনার পাত ও স্ফটিকের মোজাইক ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলো দা গ্রেট কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট মুসলিম শাসক আবদুর রহমান নাসির লি-দ্বীনিল্লাহকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। মিহরাবের দুইপাশে চারটি স্তম্ভ ছিল। দুটি স্তম্ভ সবুজ রঙের, অপর দুটি যুরযুরি[২৯১] পাখির রংবিশিষ্ট; সম্পদের মাধ্যমে এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মিহরাবের শিরোভাগে ছিল মার্বেল পাথরের ব্লক, পাথরের একটি টুকরোতে সোনা ও নীলকান্তমণির[২৯২] চুমকি এবং নানা ধরনের রং ব্যবহার করে অলংকরণ করা হয়েছিল। মিহরাবটিকে ঘিরে ছিল কাঠের বেষ্টনী, এতে খোদিত ছিল অভূতপূর্ব সব নকশা। মিহরাবের ডান দিকে ছিল মিম্বার, পৃথিবীতে এমন শৈল্পিক রীতিতে নির্মিত মিম্বার আর একটিও নেই। মিম্বারটিতে ব্যবহৃত হয়েছিল আবলুস কাঠ, বক্সকাঠ (boxwood) এবং কয়লাকাঠ। কথিত আছে, মিম্বারটি তৈরি করতে সাত বছর সময় লাগে। জোগালেদের[২৯৩] হিসাব ছাড়াই ছয়জন মিস্ত্রি প্রধানরূপে এর নির্মাণকার্য সম্পন্ন করে!

মিহরাবের উত্তর পাশে ছিল একটি ঘর। সেখানে বিভিন্ন ধরনের আসবাব ও সোনা, রুপা, কীলক দিয়ে নির্মিত পট ছিল। পটগুলোতে রমজানের

---

২৯১. الزُّرْزُور (Starling) হলো প্যাসারিফর্মিস বর্গের পাখি। আকারে চড়ুই থেকে বড়। পালকগুলো সবুজাভ-বেগুনি। অথবা হালকা উজ্জ্বল বেগুনি। অথবা তা কোমল সাদা পাথর। রুসেট বা হলুদও হতে পারে। হতে পারে হালকা ধাতব রঙের।

২৯২. উজ্জ্বল নীল রঙের পাথর; আরবি শব্দ লাজাবর্দ; azurite বা lapis lazuli।-অনুবাদক

২৯৩. জোগালে, যে ব্যক্তি নির্মাণসামগ্রী হাতের কাছে এনে দিয়ে রাজমিস্ত্রিকে সাহায্য করে।-সম্পাদক

সাতাশ তারিখে মোমবাতি জ্বালানো হতো। এই সংরক্ষণাগারে একটি মুসহাফ (কুরআন মাজিদ) ছিল। এটি এত ভারী ছিল যে, তা তুলতে দুজন লোকের প্রয়োজন হতো। এতে উসমান ইবনে আফফান রা.-এর মুসহাফের চারটি পাতাও ছিল, যা তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন। সেখানে তার রক্তের ফোঁটার চিহ্ন ছিল। প্রতিদিন সকালে এ মুসহাফটি বের করা হতো। মসজিদের দায়িত্বশীল লোকদের একটি দল কাজটির তদারকি করত। মুসহাফের জন্য অদ্ভুত সব নকশা খচিত চমৎকার একটি গিলাফ এবং তা রাখার জন্য একটি তেপায়া ছিল। (মুসহাফ বের করার পর) ইমাম সাহেব অর্ধেক হিযব[২৯৪] পড়তেন, তারপর মুসহাফটি যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো।

মিহরাব ও মিম্বারের ডানদিকে একটি দরজা ছিল। মসজিদের দুই দেয়ালের ছাদের নিচে বিদ্যমান এই পথ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করা যেত। ছাদবিশিষ্ট এই পথের দুই পাশে আটটি দরজা ছিল, চারটি দরজা প্রাসাদ থেকে বন্ধ করা যায় এবং বাকি চারটি দরজা বন্ধ করা যায় মসজিদ থেকে। মসজিদটির বিশটি ফটক ছিল। ফটকের পাল্লাগুলো ছিল পিতল দ্বারা আস্তৃত এবং এগুলোর ওপরে ছিল পিতলের তৈরি তারা। প্রতিটি ফটকে ছিল অত্যন্ত মজুবত দুটি কড়া। ফটকের ওপরের দেয়ালগাত্রে ছিল মসৃণ লাল ইটের তৈরি নানা প্রকারের বুদ্‌বুদ-চিহ্ন। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের নকশা ও কারুকার্যও ছিল।

মসজিদের উত্তর পাশে ছিল দৃষ্টিনন্দন অভূতপূর্ব নির্মাণশৈলীর এক মিনার। অসাধারণ কাঠামোর তুলনাহীন এক সৃষ্টি। গোটা মিনারটির উচ্চতা ছিল একশ হাত (প্রতি হাতের পরিমাণ ছিল তিন বিঘত করে)। যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আজান দিতেন তার উচ্চতা ছিল আশি হাত। আর সেখান থেকে এর চূড়া পর্যন্ত ছিল আরও বিশ হাত। দুটি সিঁড়ি দিয়ে এই মিনারের চূড়ায় ওঠা যেত। পশ্চিম দিক থেকে একটি সিঁড়ি, পূর্ব দিক থেকে আরেকটি সিঁড়ি। মিনারটির নিচ থেকে সিঁড়িগুলো আলাদা, তবে চূড়ায় গিয়ে সিঁড়ি দুটি একত্রে মিলিত হয়েছিল। মিনারটির চূড়া আস্তর করা হয়েছিল কাযযান (ছোট ছোট কোমনীয় পাথর) দিয়ে।

---

[২৯৪]. কুরআনে রয়েছে ত্রিশ পারা, প্রতি পারা দুই হিযবে বিভক্ত। অর্থাৎ কুরআনে মোট ষাট হিযব রয়েছে।-অনুবাদক

ভূমিসংলগ্ন অংশ থেকে চূড়া পর্যন্ত মিনারটিকে বিভিন্ন রকমের কারুকার্য ও চারুলিপি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

মিনারটির চতুষ্পার্শ্বে ছিল খিলানের দুটি সারি। খিলানগুলো মার্বেল পাথরের বন্ধনীর ওপর গোলাকারে নির্মিত ছিল। (মিনারের ছিল) বন্ধ চার দরজাবিশিষ্ট একটি ঘর। ঘরটিতে প্রতিদিনই দুইজন মুয়াজ্জিন রাত্রিযাপন করতেন। মিনারের চূড়ায় ছিল তিনটি সোনার আপেল, দুটি রুপার আপেল এবং আইরিস ফুলের পাতা। এখানকার সবচেয়ে বড় আপেলটিতে ষাট রিতল পরিমাণ তেল ধরত। ষাটজন লোক প্রতিনিয়ত মসজিদটির খাদেম হিসেবে কাজ করতেন। আর তাদের জন্য ছিলেন একজন তত্ত্বাবধায়ক।[২৯৫]

চিত্র নং-৩২
মেহরাবের সামনে খিলান

---

[২৯৫]. হিময়ারি, *আর-রওযুল মিতার ফি খবারিল আকতার*, খ. ১, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭।

এরই কাছাকাছি বর্ণনা দিয়েছেন ইবনুল ওয়ারদি তার *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব* গ্রন্থে।

মসজিদ চত্বরে প্রচুর পরিমাণে কমলা ও আনার গাছ ছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্ডোভায় আগত মানুষজন ক্ষুধার্ত হলে এসব গাছ থেকে ফল খেতে পারত।

কিন্তু এ কারণে হৃদয়ে বেদনার ঝড় ওঠে এবং দুই চোখ অশ্রুতে প্লাবিত হয় যে, আন্দালুসের পতনের পরপরই মসজিদটি ক্যাথিড্রালে রূপান্তরিত হয় এবং খ্রিষ্টানদের গির্জার অনুষঙ্গ হয়ে যায়—যদিও নামটি অক্ষত থাকে। ইসলামি বৈশিষ্ট্য আড়াল করার জন্য সুউচ্চ মিনারটিকে টাওয়ারের রূপ দেওয়া হয়। তার চূড়ায় টাঙিয়ে দেওয়া হয় গির্জার ঘণ্টা। মসজিদটির মজবুত প্রাচীরগুলোতে এখনো কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ রয়েছে, যা অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার পরিচায়ক। এটি বর্তমানে গোটা বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান।

কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ডোভা জামে মসজিদের ভূমিকা কেবল ইবাদত-বন্দেগির ওপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তখনকার দিনে এটি ছিল বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম এবং ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্র। এই জ্ঞানকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপীয় দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী এর জ্ঞানবিস্তার অব্যাহত থাকে।

কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের সব শাখার পঠনপাঠন ছিল। এখানে পাঠদানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মনোনীত করা হতো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে সমানভাবে বিদ্যার্থীরা এখানে জ্ঞান অর্জন করতে আসত। মুসলিম বিদ্যার্থী যেমন ছিল, তেমনই ছিল অমুসলিম বিদ্যার্থীও। পাঠদান ও জ্ঞানচর্চার আসরগুলো মসজিদের অর্ধেকটারও বেশি দখল করে রাখত। শিক্ষকদের জন্য মোটা অঙ্কের বেতনভাতা ছিল, যেন তারা পাঠদান ও লেখালেখির জন্য আত্মনিবেদন করতে পারেন। ছাত্রদের জন্যও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। গরিবদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হতো।

সে সময়কার পরিবেশে জ্ঞানচর্চার এরকম উন্নত ব্যবস্থা জ্ঞানচর্চামূলক সমাজ গঠনে লক্ষণীয় ভূমিকা রাখে। কর্ডোভা শহর মুসলিমদের জন্য তো

বটেই, গোটা বিশ্বের জন্য সর্ব শাখায় অসংখ্য জ্ঞানীগুণীর জন্ম দেয়। উদাহরণ হিসেবে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যায় : আবুল কাসিম যাহরাবি (৩২৫-৪০৪ হি./৯৩৬-১০১৩ খ্রি.), তিনি ছিলেন খ্যাতিমান শল্যবিদ, চিকিৎসক, ভেষজবিজ্ঞানী ও ওষুধ প্রস্তুতপ্রণালিতে বিশেষজ্ঞ। আরও আছেন (বহুশাস্ত্রজ্ঞ) ইবনে বাজাহ (১০৮৫-১১৩৮ খ্রি.); (চিকিৎসাবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক) ইবনে তুফাইল (১১০৫-১১৮৫ খ্রি.); চক্ষুবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ গাফিকি (মৃ. ১১৬৬ খ্রি.); ইবনে আবদুল বার (৯৭৮-১০৭১ খ্রি.); ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.); শরিফ ইদরিসি (১১০০-১১৬৫ খ্রি.); আবু বকর ইয়াহইয়া ইবনে সাদুন ইবনে তাম্মাম আযদি (১০৯৩-১১৭২ খ্রি.); আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ কাজি কুরতুবি নাহবি (মৃ. ৩৪৫ হি.); হাফেয কুরতুবি; আবু জাফর কুরতুবি (৫২৮-৫৯৬ হি.) এবং আরও অনেকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কর্ডোভা : এক আধুনিক শহর

কর্ডোভা সমাজ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের অবগতির ওপর ভিত্তি করে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরি চতুর্থ শতকের (খ্রিষ্টীয় দশম শতকের) মাঝামাঝি সময়ে কর্ডোভা একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছিল, যাকে এই তৃতীয় সহস্রাব্দের আন্তর্জাতিক শহরগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। বস্তুত এতে বিস্ময়বোধ করার কিছু নেই। কেননা, জনমানুষের শিক্ষার জন্য সেখানে বিদ্যালয়ের বিস্তার ঘটেছিল। অসংখ্য ব্যক্তিগত ও গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি পৃথিবীর মধ্যে কর্ডোভাতেই তখন সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ ছিল! এ ছাড়া শহরটি পরিণত হয়েছিল সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের সম্মিলন ঘটেছিল এ শহরে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটি ছিল নেতৃস্থানীয় শহর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বিনা খরচে পড়াশোনা করতে পারত। শাসকরা নিজেদের অর্থ থেকে তাদের খরচ বহন করত। তাই এ দাবিতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তথাকার জনগোষ্ঠী সকলেই সাক্ষর ছিল। কর্ডোভায় এমন একটি লোকও পাওয়া যেত না, যে ভালোভাবে পড়ালেখা জানত না।[২৯৬] অথচ সেই সময়ে ইউরোপে মুষ্টিমেয় ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া সম্ভ্রান্ত লোকেরাও অশিক্ষিত ছিল!

উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, কর্ডোভা নগরীতে সে সময় শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিগত বিপ্লবই সংঘটিত হয়নি, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রশাসনিক অবকাঠামোগত বিপ্লবও। তখন রাষ্ট্রে তৈরি হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নত প্রশাসনব্যবস্থা। যার মধ্যে ছিল আমিরশাসিত প্রদেশব্যবস্থা ও মন্ত্রিপরিষদ। বিচারব্যবস্থা, পুলিশবিভাগ, 'হিসবাহবিভাগ' ও অন্যান্য বিভাগেরও বিকাশ ঘটে।

---

২৯৬. মুহাম্মাদ মাহির হাম্মাদাহ, *আল-মাকতাবাত ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৯৯।

এ ছাড়া বড় ধরনের শিল্পবিপ্লবও ঘটে। বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়। সেখানকার অনেক শিল্প প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন : চামড়াশিল্প, জাহাজশিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প, ওষুধশিল্প ইত্যাদি। তা ছাড়া খনি থেকে সোনা, রুপা ও পিতল উত্তোলনেও উন্নতি ঘটে।[২৯৭]

আমরা যদি কর্ডোভার নাগরিক জীবন ও তার আধুনিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই, এই নগরী পাঁচটি ছোট ছোট শহরে বিভক্ত ছিল। যেন তা পাঁচটি বড় বড় পল্লি। মাক্কারি জানাচ্ছেন, এক শহর থেকে অপর শহরের মাঝে বৃহদায়তন দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিল। প্রতিটি শহরই ছিল আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেক শহরের শহরবাসীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গণগোসলখানা, হাটবাজার ও শিল্প উৎপাদনব্যবস্থা ছিল।[২৯৮]

মুজামুল বুলদান গ্রন্থে উল্লেখিত ইয়াকুত হামাবির বর্ণনা অনুযায়ী কর্ডোভার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এরূপ, সেখানকার বাজারগুলো সব ধরনের পণ্য ও খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকত। আর প্রত্যেক শহরের বাজার ছিল আলাদা আলাদা।[২৯৯]

এ পর্যায়ে মাক্কারির বরাত দিয়ে কর্ডোভার স্থাপত্যকীর্তি সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি :

মসজিদ : আবদুর রহমান দাখিলের যুগে কর্ডোভার মসজিদ-সংখ্যা চারশ নব্বইয়ে উন্নীত হয়েছিল। তারপর এই সংখ্যা পৌঁছে তিন হাজার আটশ সাঁইত্রিশে।

জনসাধারণের গৃহ : দুই লাখ তেরো হাজার সাতাত্তরটি।

অভিজাত গৃহ : ষাট হাজার তিনশটি।

দোকান (স্টোর ও অন্যান্য) : আশি হাজার চারশ পঞ্চান্নটি।

গণগোসলখানা : নয়শটি।

উপশহর : আটাশটি।[৩০০]

---

[২৯৭]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৫, পৃ. ২১৮।
[২৯৮]. মাক্কারি, *নাফহুত তিব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতিব*, খ. ১, পৃ. ৫৫৮।
[২৯৯]. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।
[৩০০]. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৫৪০।

অবশ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে বা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার বিভিন্নতার কারণে এসব জিনিসের সংখ্যায় তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু এতে কিছু যায়-আসে না। কারণ এসব ভিন্নতা আভিজাত্য, গৌরব ও সৌন্দর্যের মাত্রাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে, এসব বিষয়ের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা নিয়ে নয়।

ইসলামি শাসনামলে কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লাখ।[৩০১] অথচ বর্তমানে কর্ডোভাবাসীর সংখ্যা মাত্র তিন লাখ দশ হাজারের কাছাকাছি![৩০২]

---

৩০১. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *আল-আসার* [illegible] *সিয়াতুল বাকি*[illegible] *ফি আসবানিয়া ওয়াল-বুরতুগাল*, পৃ. ১৯।

৩০২. http://ar.w[illegible]ia.org. (২০[illegible] [illegible] জনসংখ্যা তিন লাখ পঁচিশ [illegible] অনুবাদক)

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-সাহিত্যিকদের চোখে কর্ডোভা

মসুলের ব্যবসায়ী আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে হাওকাল (মৃ. ৩৬৭ হি.) ৩৫০ হিজরি/৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কর্ডোভা ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি এভাবে তার বর্ণনা দেন, আন্দালুসের অন্যতম বড় শহর কর্ডোভা। জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে কর্ডোভার মতো শহর মাগরিব অঞ্চলে একটিও নেই। বলা হয়ে থাকে, এটি দুই পার্শ্ববিশিষ্ট বাগদাদের একটি পার্শ্বের সাথে তুলনীয়। তবে কর্ডোভা যদি সেরকম নাও হয়ে থাকে, তবু তার কাছাকাছি তো অবশ্যই! গোটা নগরীটি পাথরের দ্বারা নির্মিত মজবুত প্রাচীরে বেষ্টিত। সেই প্রাচীরের গায়ে দুটি উন্মুক্ত ফটক রয়েছে। ফটকের দরজাগুলোর পথ রুসাফা এলাকার তীরবর্তী গোয়াদেল কুইভার নদীর দিকে চলে গেছে। আর রুসাফা হলো শহরের উঁচু অংশে নির্মিত বাসস্থানময় এলাকা, যার নিচে আছে ঘন বৃক্ষমালা। রুসাফার ভবনগুলো চতুর্দিক থেকে পরস্পর সংলগ্ন। তো (প্রাচীরের সেই পথটি) চলে গেছে গোয়াদেল কুইভার নদী পর্যন্ত। পথের আশপাশে আছে বাজার ও বেচাকেনার বিখ্যাত স্থান। সাধারণ মানুষের বাসস্থান (রুসাফার নিম্নবর্তী) ঘন গাছবিশিষ্ট স্থানে। সেখানকার মানুষেরা সম্পদশালী ও বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক।[৩০৩]

কর্ডোভার নাগরিকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, মানুষের মাঝে তারা অভিজাত শ্রেণি, মর্যাদাশালী এবং আলেম-উলামা ও জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায়। এ প্রসঙ্গে শরিফ ইদরিসি বলেন, কর্ডোভায় সবসময়ই বড় বড় আলেম-উলামা ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বসবাস ছিল। এখানকার ব্যবসায়ীরা ছিল অত্যন্ত ধনবান। তারা খুবই অবস্থাসম্পন্ন এবং বিপুল পরিমাণ

---

৩০৩. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।

সম্পদের অধিকারী ছিল। তাদের উন্নতমানের জাহাজ ছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য।[৩০৪]

হিময়ারি বলেন, কর্ডোভা ছিল আন্দালুসের মূল ঘাঁটি এবং প্রধান শহর। উমাইয়া খেলাফতের কেন্দ্রস্থল ছিল এই শহর। তাদের নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন এখানে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার খলিফাদের কৃতিত্ব এত প্রসিদ্ধ যে তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়। তারা ছিলেন দেশের অভিজাত শ্রেণি ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। বিশুদ্ধ মতাদর্শ, হালাল উপার্জন, সুন্দর বেশভূষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আখলাক ও শিষ্টাচারের জন্য তারা ছিলেন বিখ্যাত। কর্ডোভায় বসবাস করতেন বড় বড় আলেম ও নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি।[৩০৫]

কর্ডোভা সম্পর্কে ইয়াকুত হামাবিও বলেন, কর্ডোভা ছিল আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ শহর, দেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সম্রাটের (খলিফার) আবাসস্থল ও শাসনকেন্দ্র। বনি উমাইয়ার সম্রাটগণ (খলিফাগণ) কর্ডোভাতেই বসবাস করতেন। এই শহর ছিল জ্ঞানীগুণীদের খনি ও প্রস্রবণের সাথে তুলনীয়।[৩০৬]

আবুল হাসান আলি ইবনে বাসসাম শান্তারিনি (৪৫০-৫৪২ হি.) কর্ডোভা সম্পর্কে বলেন, (আন্দালুসে) কর্ডোভা ছিল চূড়ান্ত গন্তব্য, পতাকার কেন্দ্র, প্রধান নগরী, মর্যাদাবান ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের আবাসস্থল, জ্ঞানীগুণীদের ভূমি, রাজ্যের হৃৎপিণ্ড, জ্ঞানবিজ্ঞানের অবিরাম প্রস্রবণ, ইসলামের গম্বুজস্বরূপ, মহামান্য ইমামতুল্য, সুস্থ বিবেকবুদ্ধির গন্তব্যস্থল, অন্তরের জন্য ফলবাগানতুল্য, মেধা নিঃসৃত মণিমুক্তার সাগর। কর্ডোভার দিগন্ত থেকে উদিত হয়েছে পৃথিবীর তারকারা, উড্ডীন হয়েছে জগতের নিশানতুল্য ব্যক্তিবর্গ, বিকশিত হয়েছে গদ্য ও পদ্যের যোদ্ধারা। এখানে রচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ রচনাবলি, লিখিত হয়েছে অমূল্য গ্রন্থরাজি। এসবের– এবং প্রাচীন কালে ও বর্তমান কালে এখানকার বাসিন্দাদের অন্য মানুষদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের–কারণ এই যে, তাদের নগরী তথা কর্ডোভার দিগন্তজুড়ে সবসময়ই বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষক ও জ্ঞান-

---

৩০৪. ইদরিসি, *নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক*, খ. ২, পৃ. ৫৭৫।

৩০৫. হিময়ারি, *আর-রওযুল মিতার ফি খবারিল আকতার*, পৃ. ৪৫৬।

৩০৬. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।

অন্বেষকদের আবাসস্থল ছিল। মোটকথা, এই দিগন্তের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষভাবে কর্ডোভার মানুষ এবং ব্যাপকভাবে গোটা আন্দালুসের মানুষ ছিল আন্দালুসবিজয়ী প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ আরবগণ এবং এ অঞ্চলে আবাস নির্মাণকারী শাম ও ইরাকের মহান সেনাপতিবৃন্দ, এরপর তাদের অভিজাত বংশধররাই এতদঞ্চলের অধিবাসীরূপে অবস্থান গ্রহণ করে। তাই আন্দালুসে এমন কোনো শহর ছিল না, যেখানে দক্ষ লেখক বা স্বনামধন্য কোনো কবি ছিল না।[৩০৭]

ইবনুল ওয়ারদি তার *খারিদাতুল আজায়িব* গ্রন্থে কর্ডোভা ও তার অধিবাসী সম্পর্কে বলেন, কর্ডোভাবাসীরা ছিল গোটা দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ। খাদ্য-পানীয়, বাহন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সব দিক থেকে তারা ছিল অভিজাত ও সেরা। কর্ডোভাতেই ছিলেন সেরা আলেমগণ, নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ, বীর সেনাপতিগণ এবং দুঃসাহসী যোদ্ধারা। এরপর তিনি কর্ডোভার জামে মসজিদ ও সেতুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, এই শহরের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা এত বেশি যে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।[৩০৮]

মোটকথা, ইসলামি সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাম হলো কর্ডোভা, যা মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় এবং তার চাকাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। তবে বাস্তবিকতা এই যে, সেই যুগে এরূপ শহর একমাত্র কর্ডোভাই ছিল না; বরং আমরা চাইলে বাগদাদ, দামেশক, কায়রো, বসরা বা অন্যান্য শহর সম্পর্কেও এমন আলোচনা করতে পারি। সেসব শহরও কর্ডোভার মতো বিস্ময়কর ছিল অথবা বলা যায় তার চেয়েও বেশি। না, এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই! কেননা এটা হলো মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন, যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এবং দীর্ঘ মানবেতিহাসের ললাটে এক গৌরবপূর্ণ শুভ্রচিহ্ন।

---

৩০৭. আবুল হাসান ইবনে বাসসাম, *আয-যাখিরা ফি মাহাসিনি আহলিল জাযিরা*, খ. ১, পৃ. ৩৩।

৩০৮. ইবনুল ওয়ারদি, *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব*, পৃ. ১২।
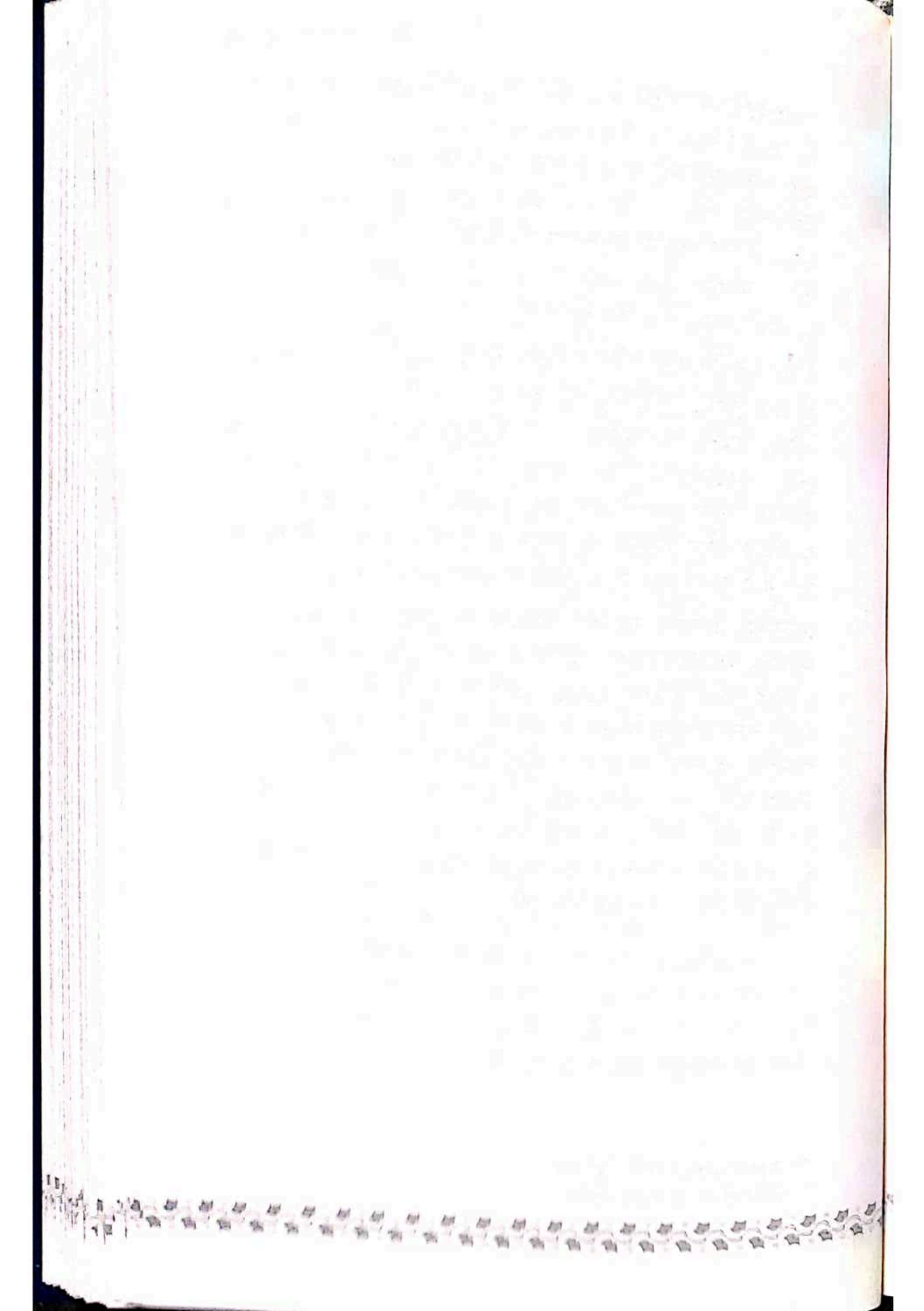
অষ্টম অধ্যায়

ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

একটি সভ্যতা মানবেতিহাসে চিন্তাধারা, জ্ঞানবিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতার বিভিন্ন দিকে কতটুকু এগিয়েছে এবং কী অমর কীর্তি সাধন করেছে তার ভিত্তিতেই ওই সভ্যতা অমরত্ব ও অবিনশ্বরতা লাভ করে। ইসলামি সভ্যতা মানবজাতির অগ্রযাত্রার ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং যে অসাধারণ কীর্তি সাধন করেছে তা আমরা জানলাম। ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান ও কীর্তি থেকে ইউরোপ কী গ্রহণ করেছে এবং ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ ও সভ্যতা কীভাবে লাভবান হয়েছে তার ওপর আলোকপাত করব, তা যাচাই করে দেখব। ইউরোপীয় সভ্যতা যেসব কীর্তি সাধন করেছে সেগুলো ইসলামি সভ্যতার প্রভাবের ফলেই করতে পেরেছে। কারণ, ইসলামি সভ্যতা ছিল তার চেয়ে অগ্রগামী। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ইসলামি সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষের যে যুগ অতিবাহিত হয়েছে, ইউরোপের আধুনিক ইতিহাস মূলত তারই ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রলম্বিত অংশ। দুটির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তার বিবরণ হয়তো তেমনই যেমন বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলোতে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে ইসলামি সভ্যতার পারাপারস্থল বা সেতু

খ্রিষ্টধর্মানুসারী পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ইসলামি সভ্যতার যোগাযোগ ঘটে মধ্যযুগে, যখন ইউরোপ যাপন করছিল তীব্র তমসাচ্ছন্ন সময়। ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, তিনটি প্রধান পথ দিয়ে এই যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে উদ্যোগ, সক্রিয়তা ও সংস্কৃতি-প্রেরণের (Cultural transmission) পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে এই তিনটি পারাপারস্থল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : আন্দালুস

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সিসিলি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ক্রুসেড যুদ্ধ

প্রথম অনুচ্ছেদ

আন্দালুস

আন্দালুস ইসলামি সভ্যতার অন্যতম প্রধান পারাপারস্থল এবং ইউরোপে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রেরণের গুরুত্বপূর্ণ সেতু। জ্ঞানবিজ্ঞান, চিন্তা ও দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির নানা দিক ও নানা বিষয় প্রেরণে তা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আন্দালুস ইউরোপেরই একটি অংশ। আট শতাব্দীব্যাপী তা (৯২-৮৯৭ হি./৭১১-১৪৯২ খ্রি.) সাংস্কৃতিক বাতিঘর হিসেবে সক্রিয় ছিল; মুসলিমরা যতদিন কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় ছিল ততদিন তো বটেই, দেশটির রাজনৈতিক দুর্বলতা ও তাইফ গোত্রীয় রাজ্যের আত্মপ্রকাশের সময়ও তা সক্রিয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, গ্রন্থাগার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ, বাগান, জ্ঞানীগুণী, কবি-সাহিত্যিক প্রভৃতি ছিল এই বাতিঘরের চালিকাশক্তি। এমনকি আন্দালুস ইউরোপীয়দের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, যে আন্দালুসের সঙ্গে তাদের দেশগুলোর ছিল নিবিড় ও বিশ্বস্ত যোগাযোগ।[৩০৯]

মুসলিমরা স্পেনে স্থায়িত্ব লাভের পরপরই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শাস্ত্রীয় বিষয়াবলির প্রতি যত্নশীল হয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। এসব ক্ষেত্রে তারা তেমনই উৎকর্ষ অর্জন করে যেমন প্রাচ্যে তাদের ভাইয়েরা করেছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় নতুন ও মহৎ কিছু উদ্ভাবন করে। যার ফলে ইউরোপের জন্য এক অনুকূল উৎসের সৃষ্টি হয়, এই উৎস থেকে তারা খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীয় রেনেসাঁস (Italian Renaissance) পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে।

গুস্তাভ লি বোঁ বলেছেন, আরবরা স্পেন বিজয় উপভোগ করতে না-করতেই সেখানে সভ্যতার চারা রোপণ করতে শুরু করে। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে তারা বিরানভূমিগুলোকে আবাদ করে, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত

---

৩০৯. হানি আল-মুবারাক ও শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ৫১-৫২।

শহরগুলোকে পুনর্নির্মাণ করে, বড় বড় অট্টালিকা ও ভবন তৈরি করে, অন্যান্য জাতির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। এর পরপরই তারা জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করে। গ্রিক ও লাতিন গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, এসব বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকালব্যাপী ইউরোপে সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হিসেবে সক্রিয় থাকে।[৩১০]

ইসলামের উদারতানীতি ইহুদি ও খ্রিষ্টান জিম্মিদের মনে বেশ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে স্প্যানিশ নব্য আরবীয়রা আরবি ভাষা শিখতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষাকেই ব্যবহার করে। এমনকি তারা লাতিন ভাষা থেকে আরবি ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়। যেমন অসংখ্য ইহুদি তাদের আরব শিক্ষকদের শিষ্যত্ব বরণ করে নেয়।

আরবি ভাষা থেকে অনুবাদ-আন্দোলন বিপুল উদ্যোগে শুরু হয়। বিশেষ করে টলেডো শহরে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তা পুরোদমে অব্যাহত থাকে। গ্রন্থরাজি আরবি থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়, তারপর স্প্যানিশ থেকে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। অথবা আরবি থেকে সরাসরি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। জ্ঞানের সব শাখায় কেবল আরব আলেম ও বিজ্ঞানীদের রচনাবলিই যে অনূদিত হয় তা নয়, বরং যেসব গ্রিক রচনারাশি ইতিপূর্বে দুই শতাব্দীব্যাপী প্রাচ্যে (আরবিতে) অনূদিত হয়েছিল সেগুলোও স্প্যানিশ ও লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। গ্যালেন, হিপোক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড প্রমুখ গ্রিক মনীষীর গ্রন্থাবলি অনূদিত হয়।

টলেডোর বিখ্যাত অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইতালীয় মনীষী জেরার্ড অব ক্রেমোনা[৩১১]। তিনি আত-তুরাইতিলি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইতালি থেকে টলেডোতে এসেছিলেন ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দে। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি প্রায় একশটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তার

---

৩১০. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ২৭৩।

৩১১. জেরার্ড অব ক্রেমোনা (Gerard of Cremona 1114-1187) ছিলেন ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। তিনি উত্তর ইতালির ক্রেমোনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আন্দা[illegible] টলেডোতে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তিনি আরবি থেকে লাতিন ভাষায় মে[illegible] করেন।

মধ্যে একুশটি গ্রন্থ চিকিৎসা-বিষয়ক। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাযি (২৫০-৩১১ হি.) কর্তৃক রচিত '*আল-মানসুরি ফিত-তিব*' ও ইবনে সিনা (৩৭০-৪২৭ হি.) কর্তৃক রচিত '*আল-কানুন ফিত-তিব*'। অবশ্য তার নামে প্রচলিত কিছু গ্রন্থ তারই তত্ত্বাবধানে তার ছাত্রদের দ্বারা অনূদিত। কোনো কোনো গ্রন্থ তিনি অন্যের সঙ্গে যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন, বিশেষ করে গালিপাসের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে গালিপাসও আরবত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশরাও ব্যাপকভাবে অনুবাদের চর্চা করে। যারা স্পেনে এসেছিল তারাও একই কাজ করে। ক্যাস্টাইল রাজ্যের রাজা দশম আলফোনসো (Alfonso X of Castile 1221-1284) কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদকে উৎসাহিত করেন ও পৃষ্ঠপোষকতা দেন, কখনো কখনো আরবি থেকে ক্যাস্টাইলীয় ভাষাতে অনুবাদকেও উৎসাহিত করেন।[৩১২]

জর্জ সার্টন বলেছেন, প্রাচ্যের প্রতিভাবান মুসলিমরা মধ্যযুগে শ্রেষ্ঠ সব কীর্তি সাধন করেছেন। আরবি ভাষায় অত্যন্ত মূল্যবান, মৌলিক ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে নিয়ে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আরবি ভাষাই ছিল মানবজাতির জ্ঞানচর্চার সবচেয়ে উন্নত ভাষা। এমনকি যেকোনো ব্যক্তি সমকালীন সংস্কৃতি ও তার সর্বশেষ ঘটনাপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চাইত তার জন্য সংগত ছিল আরবি ভাষা শেখা। যাদের মাতৃভাষা আরবি নয়, এমন অসংখ্য মানুষ এই কাজটি করেছে। আমি মনে করি যে, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, ওষুধবিজ্ঞান ও ভূগোল—বিজ্ঞানের এসব ক্ষেত্রে মুসলিমরা কী অবদান রেখেছেন তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।[৩১৩]

কর্ডোভার অবস্থান বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতা স্থানান্তরে শহরটির অবদান কী ছিল তা নিয়ে মন্তব্য করেছেন জন ব্রান্ডি ট্রেন্ড (John Brande Trend)। তিনি বলেছেন, দশম শতাব্দীতে সভ্যতার ও

---

[৩১২]. মুহাম্মাদ আল-জালিলি, *তাসিরুত তিব্বিল আরাবি ফিল-হাদারাতিল উরুব্বিয়্যা*, https://bit.ly/2W9uL9b

[৩১৩]. হাসসান শামসি পাশা, *হা-কাযা কানু ইয়াউমা কুন্না*, পৃ. ৮; আহমাদ আলি মোল্লা, *আসারুল উলামায়িল মুসলিমিন ফিল-হাদারাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ১১০-১১১।

সংস্কৃতির দিক থেকে কর্ডোভা ছিল ইউরোপের সব শহর থেকে শ্রেষ্ঠ, বাস্তবিকতার বিচারে তা ছিল গোটা বিশ্বের বিস্ময় ও সমীহবোধের কেন্দ্রস্থল। বলকান রাষ্ট্রগুলোর চোখে যেমন ছিল ভেনিস। উত্তর দিক থেকে যে-সকল পর্যটক আসতেন তারা সেই শহর (কর্ডোভা) সম্পর্কে এমন কথা শুনতেন যাতে তাদের মনে শহরটি সম্পর্কে ভয়মিশ্রিত সমীহ জাগত। সেই শহরে রয়েছে সত্তরটি গ্রন্থাগার, সাতশ গণগোসলখানা ইত্যাদি। লিওন, নাভার (Navarre), বার্সেলোনা ইত্যাদি শহরের নৃপতিদের শল্যচিকিৎসকের বা প্রকৌশলীর বা স্থপতির বা দরজির বা সংগীতজ্ঞের প্রয়োজন হলে তারা তাদের দাবি নিয়ে কর্ডোভারই দ্বারস্থ হতেন।[৩১৪]

ইউরোপের রেনেসাঁস-যুগের জন্য কর্ডোভাই পথ তৈরি করে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে জোর দিয়ে চিন্তাবিদ লিওপোল্ড উইজ (Leopold Weiss)[৩১৫] বলেন, আমরা অতিরঞ্জন করব না যদি বলি, আমরা যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বসবাস করছি তা ইউরোপের শহরগুলোতে শুরু হয়নি, বরং ইসলামি কেন্দ্রগুলোতে শুরু হয়েছে—দামেশকে, বাগদাদে, কায়রোয় ও কর্ডোভায়।[৩১৬]

ইসলামি সভ্যতাকে পাশ্চাত্যে প্রেরণ ও স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে পারাপারস্থল হিসেবে আন্দালুস যে ভূমিকা পালন করেছে সেই সম্পর্কে সিগরিড হুংকে সাধারণভাবে বলেছেন, পিরেনিজ পর্বতমালাও[৩১৭] ওইসব যোগাযোগ ও

---

৩১৪. *The Legacy of Islam*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত, আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন : জারজিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ২৭।

৩১৫. লিওপোল্ড উইজ (১৯০০-১৯৯৬ খ্রি.) ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত অস্ট্রীয় বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনায় দর্শন ও কলা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তারপর সাংবাদিকতায় যোগ দেন এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রাচ্যে ও ইসলামি দেশগুলোতে সাংবাদিক হিসেবে ভ্রমণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় মুহাম্মাদ আসাদ।

৩১৬. মুহাম্মাদ আসাদ, *Islam at the Crossroads* (1934), আরবি অনুবাদ, الإسلام على مفترق الطرق, অনুবাদক : উমর ফাররুখ, আরবি থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৪০। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন সৈয়দ আবুল মান্নান এবং প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৩১৭. দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের পিরেনিজ বা পিরিনীয় পর্বতমালা ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক সীমানা গঠন করেছে। এটির সর্বোচ্চ বিন্দু ৩৪০৪ মিটার (১১১৬৮ ফুট) উঁচু আনেতো পর্বতশৃঙ্গ। পর্বতমালাটি ইবেরীয় উপদ্বীপকে ইউরোপ মহাদেশের বাকি অংশ থেকে

আদান-প্রদানের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। এখান থেকেই আন্দালুসীয় আরব সভ্যতা পাশ্চাত্যের দিকে তার পথ খুঁজে নিয়েছে।[৩১৮]

তিনি আরও বলেন, হাজার হাজার ইউরোপীয় বন্দি আন্দালুস থেকে আরব সভ্যতার মশাল বয়ে নিয়ে যায়। তারা কর্ডোভা ও জারাগোজা (Zaragoza) এবং অন্যান্য আন্দালুসীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে ফিরে যায়। এ ছাড়াও লিওন, জেনোয়া, ভেনিস ও নুরেমবার্গের বণিকেরা ইউরোপীয় শহরগুলো ও আন্দালুসীয় শহরগুলোর মধ্যে দূতিয়ালি ও মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে। সান্তিয়াগো[৩১৯] যাওয়ার পথে লাখ লাখ ইউরোপীয় খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রী উত্তর আন্দালুস থেকে আগত আরব বণিকদল ও খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের সংস্পর্শে আসে। প্রতি বছরই ইউরোপ থেকে অশ্বচালকদল, বণিকদল ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ স্পেনে আসত; তারাও আন্দালুসীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলোকে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইহুদি বণিক, চিকিৎসক ও শিক্ষিত লোকেরা আরবের সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নিয়ে যায়। তারা (ইহুদিরা) টলেডো শহরে অনুবাদকর্মেও অংশগ্রহণ করে এবং আরবি থেকে অসংখ্য গল্প, কল্পকাহিনি ও বীরত্বগাথা অনুবাদ করে।[৩২০]

এভাবেই আন্দালুস ইসলামি সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে সক্রিয় ছিল এবং ইসলামি সভ্যতাকে ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল ও গমনপথ।

বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রায় ৪৯১ কি.মি (৩০৫ মাইল) দীর্ঘ পর্বতমালাটি পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।-অনুবাদক (উইকিপিডিয়া)

[৩১৮]. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩১।

[৩১৯]. চিলির রাজধানী। খ্রিষ্টানরা চিলির Roman Catholic Archdiocese of Santiago de Chile-তে তীর্থযাত্রায় যেত।

[৩২০]. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫৩২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সিসিলি

সিসিলিও ইউরোপে ইসলামি সভ্যতা পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রুট ও সংযোগস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে তা দক্ষিণ ইতালিতেও ইসলামি সভ্যতা বিস্তার করেছে। মুসলিমরা ২১৬ হিজরি/৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলির রাজধানী পালেরমো জয় করেন এবং ৪৮৫ হিজরি/১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুইশ ষাট বছর সিসিলি শাসন করেন। এই দীর্ঘ সময়ে সিসিলিতে মানুষের জীবন ইসলামি-আরবীয় স্বভাব-প্রকৃতির ছাঁচে গড়ে ওঠে। মুসলিমরা এই সময়ে নগরায়ণ ও সমৃদ্ধির প্রতি জোর দেন, সেখানে ইসলামি সভ্যতার নিদর্শন স্থাপন করেন। মসজিদ, প্রাসাদ, অট্টালিকা, গণগোসলখানা, হাসপাতাল, বাজার, দুর্গ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পও সিসিলিতে বিকাশ লাভ করে। যেমন : কাগজ, রেশম, জাহাজ, খনিজ পদার্থ উত্তোলন ইত্যাদি। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রচর্চায় অগ্রগতি ঘটে। ইউরোপের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা করতে আসে। এরপর সিসিলি পাশ্চাত্যে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রেরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সিসিলিতেও আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদের আন্দোলন শুরু হয়, আন্দালুসের যেমন অনুবাদ-বিপ্লব ঘটেছিল তেমনই।

একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই সিসিলি দ্বীপে ইসলামি শাসনের সমাপ্তি ঘটে। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের নরমান[৩২১] উত্তরসূরিদের ছত্রছায়ায়

---

৩২১. নরমান জাতি ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আগত ভাইকিং দস্যুর দল। এরা নবম শতকের প্রথমভাগে উত্তর ফ্রান্সের নরমঁদিতে বাস করা শুরু করে। সেখান থেকে এরা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপ বিজয় করে। একাদশ শতকের শুরুতে একদল নরমান দক্ষিণ ইতালিতে এসে উপস্থিত হয়। তারা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে সালের্নোর মুসলিম আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে যায়। আরও বেশি সংখ্যায় নরমানরা আসার পর তারা বলপ্রয়োগ করে তাদের ইতালীয় প্রতিবেশী ও চাকুরিদাতাদের জমি দখল করে নেয়। এই নরমান অভিযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওতভিলের ডিউক তঁক্রে (Tancred [illegible]uteville 980-1041), যিনি ১০৪২ সালে আপুলিয়া দখল করেন। ১০৫৩ সালে

ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী-মনীষী তাদের কাজ চালিয়ে যান। যেমন ভূগোলবিদ মুহাম্মাদ আল-ইদরিসি। তিনি সিসিলির নরমান সম্রাট দ্বিতীয় রজারের (Roger II of Sicily 1130-1145) জন্য তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন। একটি গোলাকার সমতল রুপার চাকতিতে তিনি এই মানচিত্র আঁকেন। সম্রাট রজারের জন্যই তিনি রচনা করেন '*নুযহাতুল মুশতাক ফি ইফতিরাকিল আফাক*' গ্রন্থটি।[৩২২] এই গ্রন্থে তিনি উপর্যুক্ত মানচিত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেন। রুশ-সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ ও আরবি ভাষাবিদ ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভ্স্কি[৩২৩] তার *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবি* গ্রন্থে আল-ইদরিসির কাজ সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী মন্তব্য করেন। রজার সম্পর্কে ক্র্যাচকোভ্স্কি বলেন, তিনি একজন আরবীয় বিজ্ঞানীকে তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের বিবরণ তৈরির জন্য দায়িত্ব দেন। সেই যুগে ইসলামি সভ্যতা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল এবং তা সবাই মেনে নিয়েছিল, এই ঘটনা তার স্পষ্ট প্রমাণ। সিসিলির নরমান রাজদরবার অর্ধেকের বেশি না হলেও অর্ধেকই ছিল প্রাচ্যীয়।[৩২৪]

নরমানরা পোপ নবম লিয়োঁ (Pope Leo IX)-র সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। পোপ তাদেরকে আপুলিয়া ও কালাব্রিয়ার দখলকৃত জায়গাগুলো দিয়ে দেন ও শান্তি স্থাপন করেন। ১০৭১ সালে সমগ্র দক্ষিণ ইতালি নরমানদের দখলাধীনে চলে আসে। তঁক্রের এক ছেলে ডিউক রবার্ট গিস্কার্ড (Robert Guiscard 1015-1085) এ সময় ইতালির নরমানদের নেতা ছিলেন। রবার্ট গিস্কার্ডের ভাই প্রথম রজার আরবদের কাছ থেকে সিসিলি দ্বীপ দখলের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমে উত্তর-পূর্ব সিসিলির মেসসিনা শহর দখলে সক্ষম হন। কিন্তু সমগ্র সিসিলি বিজয়ে আরও প্রায় ৩০ বছর সময় লেগে যায়। দ্বিতীয় রজার দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপে নরমানদের ভূমিগুলো একত্র করেন এবং ১১৩০ সালে সিসিলির প্রথম রাজা হন। এরপর সময়ের আবর্তে নরমানরা ইতালির স্থানীয় জনগণের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যেতে থাকে এবং পরবর্তীকালে আলাদা নরমান সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারেনি। (অনুবাদক)

[৩২২]. *Tabula Rogeriana* (*The Map of Roger*) নামেও গ্রন্থটি পরিচিত।

[৩২৩]. ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভ্স্কি (Ignaty Krachkovsky) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লাসিক গ্রিক ভাষাগুলো শিক্ষা করেন। এরপর নিজে নিজে আরবি ভাষা শিখতে ব্রতী হন। সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যীয় ভাষা অনুষদে ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। এখানে তার গুরু ছিলেন ইসলামি ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ ভেসিলি বারটোল্ড (Vasily Bartold)।

[৩২৪]. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ২৮ থেকে উদ্ধৃত। *নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক* রচনার ইতিবৃত্ত জানতে আরও দেখুন, সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪১৬-৪১৭।

নতুন ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ইউরোপীয়দের আকর্ষিত করে। নরমঁদি শাসনামলেও ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাব অব্যাহত থাকে। সিসিলির রাজকীয় জীবন–বিশেষ করে দ্বিতীয় রজার ও দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের যুগে–যে শানশওকত ও আভিজাত্যমণ্ডিত ছিল তাকে কর্ডোভার রাজকীয় জীবনের সমকক্ষ বিবেচনা করা হয়। এই সম্রাট দুজন আরবীয় পোশাক ও আরবীয় জীবনপ্রণালি অবলম্বন করেন। সিসিলির নরমঁদি শাসকদের উপদেষ্টাবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের অনেকেই ছিলেন আরব মুসলিম। তাদের ছত্রছায়ায় এসেছিলেন বাগদাদ ও সিরিয়ার অনেক আলেম ও বিজ্ঞানী। এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, সিসিলির তিনজন নরমঁদি সম্রাট আরবি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় রজার মু'তায বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন। প্রথম উইলিয়ামের উপাধি ছিল হাদি বি-আমরিল্লাহ এবং দ্বিতীয় উইলিয়াম যে উপাধি ধারণ করেন তা হলো মুসতাইয বিল্লাহ। এসব উপাধি তাদের ব্যাজে উৎকীর্ণ ছিল।[৩২৫]

দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক[৩২৬] (১১৯৪-১২৩০ খ্রি.) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মুকুট পরিধান করেন ১২২০ সালে। কিন্তু তিনি সিসিলিতে বসবাস করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তার আলাদা কদর ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তর্কবিতর্ককে উৎসাহিত করেছেন। তিনিই ১২২৪ সালে ইতালির নেপল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়[৩২৭] প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু আরবি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ইসলামি সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। কারণ প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও যথেষ্ট পরিমাণ আরবি পাণ্ডুলিপি ছিল। আরবি থেকে লাতিনে অসংখ্য গ্রন্থ অনূদিত হয়। অনুবাদকদের মধ্যে কয়েকজন হলেন স্টিফেন অব অ্যান্টিওক[৩২৮] (তিনি ১১২৭ সালে আলি ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি কর্তৃক রচিত চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ *আল-কিতাবুল মালাকি* লাতিনে অনুবাদ করেন); অ্যাডেলার্ড অব বাথ[৩২৯] (তিনি ১১০৭

---

৩২৫. আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়া*, পৃ. ৭৬।

৩২৬. Frederick II, Holy Roman Emperor.

৩২৭. University of Naples Federico II.

৩২৮. Stephen of Antioch. Stephen of Pisa ও Stephen the Philosopher নামেও পরিচিত।

৩২৯. অ্যাডেলার্ড অব বাথ (Adelard of Bath 1080-1152) ছিলেন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। লাতিন, গ্রিক ও আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ইউরোপে আরবি ভাষার বিস্তারে তার

সাল থেকে ১১৩৩ সালের মধ্যে তার গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকর্মগুলো সম্পাদন করেন);[৩৩০] তারপর আসেন মাইকেল স্কট[৩৩১], তিনি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন, উল্লেখযোগ্যভাবে অনুবাদ করেন ইবনে রুশদের গ্রন্থাবলি।

নেপলসের প্রথম চার্লস[৩৩২] আরবি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থাবলিকে লাতিন ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সেখানে সক্রিয় অনুবাদকদের যুক্ত করেন। তাদের মধ্যে রয়েছে ফারাজ বেন সালিম, মোসেস বেন সলোমোন অব সালের্নো। অনুবাদকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রতিলিপিকার ও সংশোধকদের একটি দল। চিকিৎসাবিদ আল-রাযির '*আল-হাবি*' ও ইবনে জাযলার '*তাকউইমুল আবদান ফি তাদবিরিল ইনসান*' গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন হয় এখানেই।

সিসিলি প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারা স্থানান্তরের একটি উর্বর ক্ষেত্র ছিল। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে আরবিভাষী যেমন ছিল, তেমনই গ্রিকভাষীও ছিল। আরও কিছু সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন যারা লাতিন জানতেন। সিসিলি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল একসময়, তাই এখানে গ্রিক সংস্কৃতির কিছু নিদর্শনও ছিল। তিনটি ভাষার পাশাপাশি সহাবস্থান আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের স্থানান্তর বেশ সহজ করে দিয়েছিল। এর আগে সালের্নোর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (Schola Medica Salernitana) প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী (৯০০-১২০০ খ্রি.) চিকিৎসাবিষয়ক পড়াশোনার কেন্দ্র ছিল। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ ইতালিতে অবস্থিত এবং সিসিলির সঙ্গে এর সম্পর্ক বেশ দৃঢ়। এই মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন কনস্টান্টাইন দি আফ্রিকান[৩৩৩]। তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিউনিসে। ১০৬৫ সাল থেকে ১০৮৫ সাল পর্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি ইংল্যান্ডের বাথ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সের তুর, আন্দালুস ও সিসিলিতে জ্ঞান অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর তাকে কাউন্ট হেনরির শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তার এই ছাত্রই পরবর্তীকালের সম্রাট দ্বিতীয় হেনরি।

৩৩০. নজিব আকিকি, *আল-মুসতাশরিকুন*, খ. ১, পৃ. ১১১।

৩৩১. মাইকেল স্কট (Michael Scot 1175-1232) ছিলেন স্কটিশ গবেষক, গণিতজ্ঞ, চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদ। অ্যারিস্টটলের কয়েকটি গ্রন্থ আরবি ও হিব্রু থেকে অনুবাদ করেন। আরবদের সঙ্গে আন্দালুসে পড়াশোনা করেন এবং সিসিলিতে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের রাজদরবারে কাজ করেন। ইবনে রুশদের গ্রন্থাবলি লাতিনে অনুবাদ করেন।

৩৩২. প্রথম চার্লস (Charles I, 1227-1285) সাধারণভাবে Charles of Anjou নামে পরিচিত।

৩৩৩. Constantine the African বা Constantinus Africanus.

তিনি সবচেয়ে উর্বর সময় যাপন করেন এবং বহু চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদ করেন। তিনি চল্লিশটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আলি ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি (মৃ. ৯৮২ বা ৯৯৪ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *'কামিলুস সিনাআতিত তিব্বিয়্যাহ'* ও *'আল-কিতাবুল মালাকি'*-এর অনুবাদ এবং ইবনুল জাযযার, ইসহাক ইবনে ইমরান ও ইসহাক ইবনে সুলাইমানের গ্রন্থাবলির অনুবাদ। শেষোক্ত তিনজনেরই মাতৃভূমি ছিল তিউনিসিয়া।

কনস্টান্টাইন দি আফ্রিকান কয়েকটি আরবি গ্রন্থের মূল লেখকের নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেখাননি। এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার গুরুত্ব কমে না। কারণ তিনিই ছিলেন প্রথম অনুবাদক যিনি আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং সালের্নোর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের উন্নতি তিনিই সাধন করেছিলেন। এই মহাবিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের অন্যতম ভাষা ছিল আরবি। আরব মুসলিমদের বড় বড় লেখক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সামসময়িক ছিল এই মহাবিদ্যালয়। আবু বকর আল-রাযি (মৃ. ৯২৫ খ্রি.), ইবনুল জাযযার (মৃ. ৯৭৫ খ্রি.) ও আলি ইবনে আব্বাস (মৃ. ৯৮২ বা ৯৯৪ খ্রি.)-এর জীবৎকালে এই মহাবিদ্যালয় সক্রিয় ছিল।[৩৩৪]

অধ্যাপক কোয়েল ইয়ং সিসিলির ব্যাপারে বলেন, গ্রিক, লাতিন ও আরব বার্বারদের ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মুক্ত সম্মিলনের ময়দান ছিল সিসিলি। ফলে এখানে সংমিশ্রিত বা যৌথ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। দ্বিতীয় রজার ও দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের উৎসাহদান ও পৃষ্ঠপোষকতার বদান্যতায় ইসলামি সভ্যতাসংস্কৃতির উৎকৃষ্ট অংশকে ইতালির পথ ধরে ইউরোপে পৌঁছে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেছিল সিসিলি। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিসিলির পালের্মো শহরটি অনুবাদ ও আরবি গ্রন্থাবলিকে লাতিনে রূপান্তরিত করার কেন্দ্র হিসেবে দ্বাদশ শতাব্দীর টলেডো হয়ে উঠেছিল।[৩৩৫]

---

৩৩৪. মুহাম্মাদ আল-জালিলি, *তাসিরুত তিব্বিল আরাবি ফিল-হাদারাতিল উরুব্বিয়্যা*, https://bit.ly/345rcoS

৩৩৫. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ২৮ থেকে উদ্ধৃত।

নরমান শাসকেরা কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মুসলিমদেরকে পেশাগত সুরক্ষা দিয়ে তাদের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। কারণ তারা এসব মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন।[৩৩৬] মুসলিমরা যেসব অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলোও তারা অটুট রেখেছিলেন। দিওয়ানুত তাহকিক[৩৩৭] ও দিওয়ানুল মা'মুর[৩৩৮] থেকে শুরু করে দিওয়ানুল ফাওয়ায়িদ[৩৩৯] পর্যন্ত তারা বহাল রেখেছিলেন। এসব দিওয়ান বা বিভাগের নথিপত্র লেখা হতো আরবি ভাষায়।[৩৪০]

নরমান শাসকেরা সামরিক বিভাগেও মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং কয়েকজন মুসলিমকে সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদে নিযুক্ত করেন। কেবল আরবীয় যুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিস্তার নয়, যুদ্ধের যন্ত্রপাতি, যেমন মানজানিক ও অবরোধ-দুর্গ নির্মাণের কৌশল ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে।[৩৪১]

এভাবেই সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি ইউরোপে ইসলামি সভ্যতা স্থানান্তরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুট ও গমনপথ ছিল।

---

৩৩৬. আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়্যা*, পৃ. ২৯৮।

৩৩৭. সিসিলির অর্থ-প্রশাসন বিভাগ।

৩৩৮. অর্থ-প্রশাসন বিভাগের একটি অংশ, বাইতুল মাল বা কোষাগার-সংশ্লিষ্ট।

৩৩৯. ভূমি-বিক্রয় বিভাগ।

৩৪০. এল জিনওয়ার্দি, *আদ-দাফাতিরুন নুরমানিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ১৫৯-১৬৪।

৩৪১. আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়্যা*, পৃ. ৭৬ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ক্রুসেড যুদ্ধ

ক্রুসেড যুদ্ধ প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত থাকে। হিজরি পঞ্চম শতকের/খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের শেষের দিকে (৪৯০ হি./১০৯৭ খ্রি.) ক্রুসেডের সূচনা ঘটে এবং মামলুকদের হাতে ক্রুসেডারদের শেষ দুর্গটির পতনের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে (৬৯০হি./১২৯১ খ্রি.)। এই সময়সীমাকে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বা প্রভাব-বিস্তার, স্থানান্তর ও আহরণের গুরুত্বপূর্ণ কাল বিবেচনা করা হয়। ক্রুসেডাররা ইসলাম-শাসিত প্রাচ্যে প্রবেশ করেছিল যুদ্ধ করার জন্য, জ্ঞান আহরণের জন্য নয়। তা সত্ত্বেও তারা মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের অবদান ও কীর্তির যা কিছু ইউরোপে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে গেছে। ইউরোপ তখন ছিল পশ্চাৎপদ ও অধঃপতিত।

এই প্রসঙ্গে গুস্তাভ লি বোঁ বলেছেন, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দুই শতাব্দীর যোগাযোগ ইউরোপে সভ্যতা বিকাশের একটি শক্তিশালী কারণ... কেউ যদি পাশ্চাত্যের ওপর প্রাচ্যের প্রভাব কী তা অনুধাবন করতে চায় তাহলে তাকে সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির অবস্থাও অনুধাবন করতে হবে যা যাপন করছিল এই দুই জাতি। আরবদের কল্যাণে ও বদান্যতায় প্রাচ্য তখন উন্নত সভ্যতাসংস্কৃতি উপভোগ করছিল, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ছিল বর্বরতা ও অসভ্যতার সমুদ্রে নিমজ্জিত।[৩৪২]

এই প্রসঙ্গে মাকরিযি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[৩৪৩] তিনি জানিয়েছেন, রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক বাইতুল মুকাদ্দাসে অভিযান চালানোর পর (৬২৬ হি./১২২৮ খ্রি.) তার দেশে ফেরার পথে আক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। এ সময় তিনি কিছু জটিল প্রকৌশলীয় ও গাণিতিক সমস্যার মুখোমুখি হন। সম্রাট এসব সমস্যার সমাধান চেয়ে আল-কামিল

---

৩৪২. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৩৩৪।

৩৪৩. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ১, পৃ. ৩৫৪।

আল-আইয়ুবির[৩৪৪] কাছে লোক পাঠান। সুলতান আল-কামিল জ্ঞানবিজ্ঞান অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং জ্ঞানীগুণীদের তার সান্নিধ্যে নিয়ে আসতেন, তাদের পরীক্ষা করতেন এবং প্রচুর পরিমাণে উপহার-উপঢৌকন দিতেন। তিনি এসব সমস্যা তার সাম্রাজ্যের একজন বিজ্ঞানীর কাছে পেশ করেন। সেই বিজ্ঞানীর নাম শাইখ আলামুদ্দিন কাইসার[৩৪৫]। তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী। আল-কামিল আল-আইয়ুবি সমস্যার সমাধানগুলো তার কাছ থেকে জেনে ফ্রেডেরিকের কাছে পাঠান। যেসব সমস্যা সম্রাট পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে দুটি নিম্নরূপ :

১. বর্শার কোনো অংশ পানিতে ডোবানোর পর তা সোজা না দেখিয়ে বাঁকা দেখায় কেন?

২. যাদের দৃষ্টিশক্তি কম তারা কেন তাদের চোখের সামনে মাছি বা মশার মতো রেখা দেখতে পায়?[৩৪৬]

যেসব ইউরোপীয়রা অবিশ্রান্ত তরঙ্গের মতো ইসলামি দেশগুলোতে এসেছিল, রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছিল, নিরপরাধ মানুষের রক্তে নিজেদের নিমজ্জিত করেছিল, যাদের মনে কোনো মমতা বা ভালোবাসা কাজ করেনি, তারা যখন মুসলিম সৈনিকদের মুখোমুখি হলো, দেখল যে তাদের তরবারিগুলো সুশিক্ষিত, তাদের হৃদয় দয়ার্দ্র, তাদের স্বভাব নম্র ও ভদ্র। ফলে ক্রুসেডাররা সমতা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়গুলো অনুধাবন করল। ফলে তারা তাদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও মানুষকে হেয়জ্ঞান করার যে সংস্কৃতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। গির্জার খবরদারি ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। তারা প্রাচ্যের ঐশ্বর্যকে কতিপয় নৃপতি ও সম্রাটদের দালালদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করল। তারা প্রাচ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি যা-কিছু পেল সব আঁজলা ভরে নিয়ে গেল। ফলে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে স্থানান্তরিত হয়ে গেল

---

[৩৪৪]. আল-কামিল আল-আইয়ুবি (আল-মালিক আল-কামিল নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আল-আদিল সাইফুদ্দিন আহমাদ (৫৭৬-৬৩৫ হি./১১৭৭-১২৩৮ খ্রি.) ছিলেন মিশরের চতুর্থ আইয়ুবীয় সুলতান। পঞ্চম ক্রুসেডে তিনি খ্রিষ্টানদের পরাজিত করেন।-অনুবাদক।

[৩৪৫]. কাইসার আত-তাআসিফ নামে পরিচিত। ১১৭৮ সালে মিশরের আসফুনে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১২৫১ সালে দামেশকে। গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী হওয়ার পাশাপাশি তিনি সংগীতবিদ্যাও অর্জন করেন।-অনুবাদক।

[৩৪৬]. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আর-রবিয়ি, *আসারুশ শারকিল ইসলামি ফিল-ফিকরিল উরুব্বি খিলালাল হুরুবিস সলিবিয়্যা*, পৃ. ৯৮।

নানাবিধ শিল্পসামগ্রী, উদ্ভিদ, ওষুধ, রঞ্জক পদার্থ, স্থাপত্যশিল্প, প্রকৌশলবিদ্যা, দুর্গনির্মাণকৌশল এবং আরও অনেক কিছু। তা ছাড়া পোশাক-আশাক, পানাহার, পারিবারিক শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিমদের কিছু ঐতিহ্যও পাশ্চাত্যে গেল। ক্রুসেডাররা বজ্রাহতের মতো অন্তরে অগ্নিশিখা নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। তারা এখন তাদের শোচনীয় অবস্থা ও চিন্তার গলদ সম্পর্কে সচেতন, তাদের সমাজের ভ্রান্তি সম্পর্কে সজাগ। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান অন্বেষণে ব্রতী হলো, সামাজিক সংস্কার চাইল, চিন্তার ও শিল্পের এবং নীতিনৈতিকতার অগ্রগতি প্রত্যাশা করল।[৩৪৭]

গুস্তাভ লি বোঁ বলেন, পাশ্চাত্যকে সভ্য ও সংস্কৃতিমান করে তোলার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের বিশাল অবদান রয়েছে। এটা ঘটেছে ক্রুসেড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই প্রভাব শিল্প, কারিগরি ও ব্যবসাবাণিজ্যে যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ধারাবাহিক যোগাযোগ ও আনাগোনার ফলে বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার দিকে যদি তাকাই এবং ক্রুসেডারদের ও প্রাচ্যের জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে শিল্পে ও মননশীল বিষয়াবলিতে যে বিকাশ সাধিত হয়েছে তার দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় যে, প্রাচ্যের জনমণ্ডলীই পাশ্চাত্যকে বর্বরতা ও অসভ্যতা থেকে বের করে এনেছে। শুধু তা-ই নয়, আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের বদান্যতায় অগ্রগতি ও উন্নতির প্রতি তাদের মনের জমিনকে প্রস্তুত করেছে। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এসবের ফলে ইউরোপে একদিন পুনর্জাগরণ ঘটে।[৩৪৮]

---

৩৪৭. তাওফিক ইউসুফ আল-ওয়ায়ি, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা মুকারানাতান বিল-হাদারাতিল গারবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৫৩১-৫৩২।

৩৪৮. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৩৩৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব : কিছু নিদর্শন

সভ্যতার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা এই যে, প্রত্যেক সভ্যতার ভিত্তি তার পূর্ববর্তী সভ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কোনো সভ্যতা নেই যা শূন্য থেকে শুরু হয়েছে। তেমনই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পথচলায়ও ইসলামের অবদান রয়েছে। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে ইসলামি সভ্যতার পরে। ইউরোপের বহু ক্ষেত্রে ও বহু দিকে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান, এমনকি ইউরোপীয় জনমানুষের জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বব্যবস্থায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব রয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও চিন্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, আইনকানুন, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি ও এরূপ অন্যান্য বিষয় এগিয়ে রয়েছে।

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বাস ও আইনের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জ্ঞানবিজ্ঞানে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : শিষ্টাচার ও আচরণে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : শিল্পকলায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিশ্বাস ও আইনের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

ইসলাম যে সমাজ ও বিশ্বের মাঝে তাওহিদের বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল তা শিরক ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইসলাম তাওহিদ বা একত্ববাদকে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠা করে। একে শিরক ও ক্রটি থেকে পবিত্র করে। মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে সেগুলোর উপাসনা থেকে মুক্ত করে। মানুষ ও আল্লাহর মাঝে কোনো মধ্যস্থতা বা পৌরহিত্য স্থির করে না...। এরপর গোটা বিশ্বের, বিশেষ করে পুনর্জাগরণকালে ইউরোপীয় সভ্যতার এই বিশুদ্ধ আকিদার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাই প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থায় শিরক বা পৌত্তলিকতার যেসব উপাদান ছিল, মূর্তিপূজার যেসব আচার ও প্রথা ছিল সেগুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরতে লাগল, মুখরোচক নানা কথা বলতে লাগল এবং এগুলোর ব্যাপারে ইসলামি তাওহিদ-আশ্রয়ী বা এ ধরনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল।[৩৪৯]

ড. আহমাদ আমিন বলেন, খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছিল যেগুলোতে ইসলামের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে/হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ফ্রান্সের সেপ্টিমানিয়ায় (Septimanie)[৩৫০] যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল তার মূল আহ্বান ছিল পুরোহিতদের সামনে অপরাধের স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না এবং এ ধরনের স্বীকৃতি গ্রহণের অধিকার নেই পুরোহিতদের। মানুষ যে ভুল ও পাপ করে তার ক্ষমা ও মার্জনার জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে নত হবে। ইসলামে পুরোহিত, যাজক ও পাদরি নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাপস্বীকার বলতে কিছু নেই।

---

৩৪৯. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৫।

৩৫০. বর্তমানে দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ঐতিহাসিক এলাকা। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত।

একইভাবে আরেকটি আন্দোলন দানা বাঁধে যার মূলকথা ছিল ধর্মীয় চিত্র ও মূর্তি বিচূর্ণ করা (Iconoclasm বা প্রতিমাবিচূর্ণবাদ)। এসব আন্দোলন ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। খ্রিষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরেকটি খ্রিষ্টধর্মীয় মতবাদের উত্থান ঘটে, যা চিত্র ও মূর্তির পবিত্রায়ণকে অস্বীকার করে। রোমান সম্রাট তৃতীয় লিয়োঁ (Leo III)[৩৫১] ১০৮ হিজরিতে/৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফরমান জারি করেন, তাতে তিনি চিত্র ও মূর্তির পবিত্রায়ণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১২ হিজরিতে/৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আরেকটি ফরমান জারি করেন, এতে তিনি একে মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিকতা বলে আখ্যায়িত করেন। বাইজান্টাইনীয় সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন (৭১৮-৭৭৫ খ্রি.) ও তার পুত্র চতুর্থ লিয়োঁ দা খাজারও একই কাজ করেন।

খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আরও একটি দলের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা ত্রিত্ববাদের তাওহিদ-সংলগ্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিল এবং ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালামের দেবত্ব বা ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেছিল।[৩৫২]

যে-কেউ ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস ও খ্রিষ্টানদের গির্জার ইতিহাস পড়লে বুঝতে পারবে যে, উৎপীড়ক বিশপীয় শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ও সংশোধনবাদীদের আন্দোলনে ইসলামের বৌদ্ধিক প্রভাব কী পরিমাণ ছিল। মার্টিন লুথার কিংয়ের যে ব্যাপক সংস্কারমূলক আন্দোলন তা ছিল—তার কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও—ইসলাম ও ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিকেরা এটা স্বীকার করেছেন।[৩৫৩]

ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস অসংখ্য অমুসলিমের বিশ্বাসে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বহু চিন্তা ও ধারণাকে সংশোধন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যেগুলো কালের পরিক্রমায় পৃথিবীর সব ভূখণ্ডে বিকৃত হয়ে পড়েছিল।

---

৩৫১. বাইজান্টাইনীয় সম্রাট (৭১৭-৭৪১ খ্রি.) এবং রোমের পোপ।

৩৫২. ড. আহমাদ আমিন, *দুহাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

৩৫৩. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৬।

আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে প্রভাব

আন্দালুস ও অন্যান্য এলাকায় ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে আসে। ইসলামের ফিকহি ও শরয়ি বিধানগুলোর একটি বৃহৎ অংশ তাদের সব ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে তা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ইউরোপ সেই সময় কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থার ওপর ছিল না, ইনসাফপূর্ণ আইনকানুনও তাদের ছিল না। মিশরে নেপোলিয়নের যুদ্ধ[৩৫৪] চলাকালে মালিকি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। প্রথমদিকে যে গ্রন্থগুলো অনূদিত হয় তার মধ্যে ছিল *কিতাবুল খলিল ফিল-ফিকহিল মালিকি*। এই গ্রন্থ ছিল ফরাসি নাগরিক আইনের (নাগরিকের অধিকার-সংক্রান্ত আইন বা সিভিল ল) বীজ। ফরাসি নাগরিক আইন অনেকাংশেই ছিল মালিকি ফিকহের বিধানাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩৫৫]

মনীষী লুইস সিডিও (Louis Sédillot)[৩৫৬] বলেন, মালিকি মাযহাবই বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যেহেতু ইফ্রিকীয় আরবদের সঙ্গে আমাদের জোরালো সম্পর্ক ছিল। ফরাসি সরকার ড. নিকোলাস পেরনকে (Dr. Nicolas Perron 1798-1876) খলিল ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াকুব আল-জুনদি রহ.[৩৫৭] কর্তৃক রচিত *আল-মুখতাসার ফিল-ফিকহ* গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন।[৩৫৮]

---

৩৫৪. ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৮ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মিশরে ও সিরিয়ায় ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষার্থে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ তিন বছর (১৭৯৮-১৮০১ খ্রি.) স্থায়ী হয়।-অনুবাদক।

৩৫৫. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০৭।

৩৫৬. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot, ১২২৩-১২৯২ হি./১৮০৮-১৮৭৫ খ্রি.) ছিলেন একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক। তার অন্যতম কীর্তি হলো মরোক্কান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ভূগোলবিদ ও সূর্যঘড়িনির্মাতা আলি আল-মারাকেশি (মৃ. ৬৬০ হি./১২৬২ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *জামিউল মাবাদিয়ি ওয়াল গায়াত ফি ইলমিল মিকাত* গ্রন্থের অনুবাদ। এটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তার পিতা জে জে সিডিও (Jean Jacques Emmanuel Sédillot)।

৩৫৭. সিদি খলিল নামে পরিচিত, মৃ. ৭৭৬ হি./১৩৭৪ খ্রি.। মিশরীয় ফকিহ। মিশরে মালিকি ঘরানার ফাতওয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। সবসময় সৈনিকের পোশাক পরে থাকতেন বলে আল-জুনদি বলা হয় তাকে।

৩৫৮. লুইস সিডিও, Histoire des Arabes (1854), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল-আরাবিল-আম*, অনুবাদক : আদিল যুআইতার, পৃ. ৩৯৫।

ইউরোপের আইনকানুনেও ইসলামি সভ্যতার অংশগ্রহণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েলস[৩৫৯] তার *দি আউটলাইন অব হিস্ট্রি* গ্রন্থে বলেছেন, ইউরোপ তার প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক নীতিমালার একটি বড় পর্যায়েই ইসলামের একটি শহর।[৩৬০]
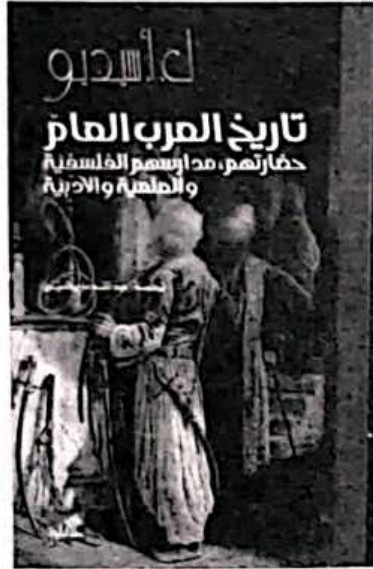
চিত্র নং-৩৩
সিডিওর গ্রন্থের প্রচ্ছদ

---

৩৫৯. হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস (Herbert George Wells 1866-1946) ছিলেন ইংরেজ সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক। তিনি তার কল্পবৈজ্ঞানিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্য সমধিক পরিচিত হলেও ইতিহাস, রাজনীতি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। জুল ভার্নের সঙ্গে তাকেও 'কল্পবিজ্ঞানের জনক' আখ্যা দেওয়া হয়। ওয়েলস শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধকেই সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে তার রচনা বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও নীতিবাদী চরিত্র লাভ করে। তার লেখক জীবনের মধ্যপর্বের (১৯০০-১৯২০ খ্রি.) রচনাগুলোর মধ্যে কল্পবিজ্ঞানের উপাদান কম। এই পর্বের রচনাগুলোর মধ্যে বিধৃত হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন (*দা হিস্ট্রি অব মি. পলি*), নব্য নারীসমাজ ও নারী ভোটাধিকার (*অ্যান ভেরোনিকা*)।

৩৬০. মুহাম্মাদ উসমান উসমান, *মুহাম্মাদ ফিল আদাবিল আলামিয়্যাতিল মুনসিফা*, পৃ. ৭৬ থেকে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জ্ঞানবিজ্ঞানে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই মুসলিমদের প্রভাব ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতায় চিকিৎসা, ওষুধবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, চক্ষুবিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রভাবের নিদর্শন বিদ্যমান। বহু পশ্চিমা বস্তুনিষ্ঠ লেখকই স্বীকার করে নিয়েছেন যে মুসলিমরা ছয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপের শিক্ষাগুরু ছিল!

ইসলামি সভ্যতার প্রভাবের একটি সাধারণ চিত্র ছিল এই যে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের গ্রন্থাবলি একাধিকবার অনুবাদ করা হয় এবং জ্ঞানের মৌলিক উৎস হিসেবে সেগুলোর ওপর নির্ভর করা হয়। কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব অনূদিত গ্রন্থ জ্ঞানের ভিত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেই সময় (মধ্যযুগে) ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান উৎকর্ষের চূড়া স্পর্শ করেছিল। অথচ তখন গির্জার পক্ষ থেকে চিকিৎসাগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কারণ তাদের কাছে অসুস্থতা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি! এরপর তারা ইবনে সিনা, আল-রাযি প্রমুখের গ্রন্থাবলি অনুবাদের পর চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভ সম্পর্কে জানতে পারে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইবনে সিনার চিকিৎসা-বিষয়ক মহাগ্রন্থ *আল-কানুন*-এর অনুবাদ হয়। কয়েকবারই এটি মুদ্রিত হয়। ফ্রান্স ও ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান উৎস ছিল *আল-কানুন*।[৩৬১]

ইউনেস্কো *কুরিয়ার* (*UNESCO Courier*) সাময়িকী ১৯৮০ সালে উল্লেখ করেছে যে, ইবনে সিনার চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ '*কিতাবুল কানুন*' ১৯০৯ সাল পর্যন্তও ইউনিভার্সিটি অব ব্রাসেলসে (Université libre de Bruxelles) পাঠ্য ছিল। এই প্রবন্ধের টীকায় লেখক ও চিকিৎসক স্যার

---

৩৬১. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৪৯০।

উইলিয়াম অসলারের[৩৬২] একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, *আল-কানুন* চিকিৎসাবিজ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে অন্য যেকোনো গ্রন্থের চেয়ে দীর্ঘকাল পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছরে *আল-কানুন*-এর মোট পনেরোটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। অসলার আরও বলেন, ইবনে সিনা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের সক্ষম করে তুলেছিলেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা করতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কার্যকরভাবেই শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে তা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।[৩৬৩]

'আল-কানুন'-এর মতো আরও অনূদিত হয় আল-রাযির *'আল-হাবি'* ও *'আল-মানসুরি'*। এটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের ঘটনা। তার অবদানের স্বীকারোক্তি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বড় বিভাগের নামকরণ করা হয় আল-রাযি নামে।

আবু রাইহান আল-বিরুনির বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) নিয়ে যে গবেষণা তাও পশ্চিমা সভ্যতার বিজ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বায়ুর ওজন ও ঘনত্ব এবং বায়ুসৃষ্ট চাপ সম্পর্কিত গবেষণায় ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী টরিসেলির তুলনায় আল-খাযিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক চাবিস্বরূপ। আল-খাযিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার দ্বারা বায়ুতে ও পানিতে বস্তুর ওজন পরিমাপ করা যেত। ইউরোপ মধ্যযুগ পর্যন্ত আল-খাযিনির আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে, তারা বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব, বায়ুর ওজন, উত্তোলন-যন্ত্র, মহাকর্ষ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মুসলিমদের সূক্ষ্ম পরিমাপের সাহায্য গ্রহণ করে।

আল-খাযিনি কর্তৃক রচিত *'মিযানুল হিকমা'* গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তা থেকে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা প্রভূত উপকার লাভ করেন।

---

৩৬২. স্যার উইলিয়াম অসলার (Sir William Osler, 1st Baronet, 1849-1919) ছিলেন কানাডিয়ান চিকিৎসক, জন হপকিন্স হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর। তাকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আখ্যায়িত করা হয়। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চাও করেছেন।

৩৬৩. ইউনেস্কো *কুরিয়ার*, অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৮০ খ্রি.।

জাবির ইবনে হাইয়ান, হাসান ইবনুল হাইসাম, আল-খাওয়ারিজমির গ্রন্থাবলিও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং কয়েক শতাব্দীব্যাপী তাদের জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিরাজমান থাকে।
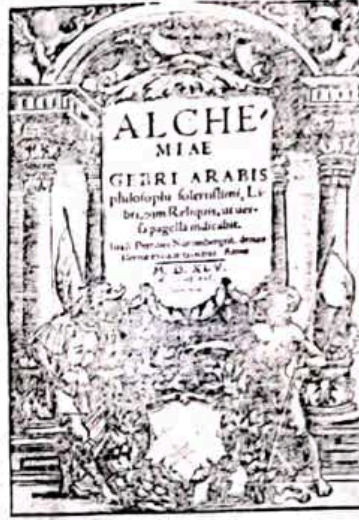
চিত্র নং-৩৪
জাবের ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ

প্রাচ্যবিদ লুইস সিডিও বলেন, শুরুর দিকে আরব থেকে লাতিন কী গ্রহণ করেছে তা অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি যে, গার্বার্ট (Gerbert of Aurillac), যিনি দ্বিতীয় সিলভেস্টার (Pope Sylvester II) নামে পোপ হন, আন্দালুসে যে গণিতবিদ্যা শিখেছিলেন তা ৩৫৯ হি./৯৭০ খ্রি. থেকে ৩৬৯ হি./৯৮০ খ্রি. সালের মধ্যে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেন; অ্যাডেলার্ড অব বাথ ৪৯৩ হি./১১০০ খ্রি. থেকে ৫২২ হি./১১২৮ খ্রি. সালের মধ্যে আন্দালুস ও মিশর ভ্রমণ করেন এবং আরবি থেকে অনুবাদ করেন ইউক্লিডের এলিমেন্টস, এই গ্রন্থ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কোনো ধারণাই ছিল না; প্লেটো তিবুরটিনাস (Plato Tiburtinus) আরবি থেকে অনুবাদ করেন থিওডোসিয়াস (Theodosius of Bithynia) কর্তৃক রচিত *আল-উকার* (Sphaerics সিরিজ) গ্রন্থের; রুডলফ অব ব্রাজেস (Rudolf of Bruges) আরবি থেকে অনুবাদ করেন *আল-জুগরাফিয়া ফিল-মামুর মিনাল-আরদ* (Ptolemy's Geographia টলেমির জিয়োগ্রাফি) গ্রন্থের; লিওনার্দো অব পিসা ৫৯৬ হি./১২০০ খ্রি. সালের মধ্যে আলজেব্রার ওপর পুস্তিকা রচনা করেন, যা তিনি আরবদের থেকে শিখেছিলেন; ক্যাম্পানুস অব নোভারা (Campanus of Novara)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবি থেকে অনুবাদ করেন ইউক্লিডের গ্রন্থের, ভালো অনুবাদের পাশাপাশি তিনি ব্যাখ্যাও দেন; গেতলিওন অফ বলঙ্গা (Getlion of Bolonga) ওই শতাব্দীতেই হাসান ইবনুল হাইসামের চক্ষুবিজ্ঞানের ওপর লিখিত *'আল-বাসারিয়্যাত'* গ্রন্থের অনুবাদ করেন; জেরার্ড অব ক্রেমোনা ওই শতাব্দীতে আরবি থেকে টলেমির *আল-মাজেস্টের* (*Almagest*), জাবির ইবনে হাইয়ানের আশ-শারহ... ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ করে বিশুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটান। ৬৪৮ হি./১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টাইলের রাজা আলফোনসো তার নামাঙ্কিত তারকা-সারণি প্রকাশের নির্দেশ দেন। সম্রাট প্রথম রজার সিসিলিতে আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন, বিশেষ করে তিনি ইদরিসির গ্রন্থরচনার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকও আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যাপারে কম উৎসাহ দেননি। ইবনে রুশদের পুত্ররা এই সম্রাটের রাজদরবারে অবস্থান করতেন, তারা তাকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রকৃতি-ইতিহাস শিখিয়েছিলেন।[৩৬৪]

সিডিওর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলিমরা ইউরোপীয়দের জন্য কেবল তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানই হস্তান্তর করেননি, বরং ইউরোপীয়দের তাদের গ্রিক পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচয় লাভের ক্ষেত্রেও তারা জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন, যারা ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনই ছিল ইসলামি সভ্যতার অবদান।

ইউরোপে ইসলামি শিল্প কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। অবশ্য এ বিষয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাগজশিল্পে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, তারা সেই সময় এই শিল্পকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কাগজশিল্পের বিকাশ না ঘটলে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সামনে এগোত না, লিপিবদ্ধকরণের যে আন্দোলন তাও উদ্যম পেত না এবং ইউরোপও সভ্য হতে পারত না।

মুসলিমরা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের দিকে চীনের একদল বন্দিকে সমরকন্দে নিয়ে যান। এসব বন্দিদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যারা

---

৩৬৪. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪২ থেকে উদ্ধৃত।

কাগজ ভালো বানাতে পারত। তাদের হাত ধরেই কাগজশিল্পের সূচনা ঘটে। সমরকন্দে কাগজশিল্প বিকশিত হয় এবং এতে আরও বেশি সুন্দর ও সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। কাগজশিল্পের মৌলিক উপাদান হয়ে ওঠে কটন ও লিলেন। ফলে ফাইন পেপারের (Fine paper) উদ্ভব ঘটে, কাগজের মধ্যে এটিই উৎকৃষ্ট। তখন প্যাপিরাস[৩৬৫] ছিল অত্যন্ত দামি, তাই নতুন কাগজ কিনতে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনকি আব্বাসি খলিফা আল-মানসুর–যিনি সঞ্চয়প্রবণতা ও মিতব্যয়িতাপ্রীতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন–তার গোটা রাজ্যে প্যাপিরাস ব্যবহার না করতে নির্দেশ দিলেন এবং সাধারণ কাগজ সস্তা হওয়ার কারণে কাগজের ব্যবহার এতেই সীমাবদ্ধ রাখতে বললেন।[৩৬৬]

চিত্র নং-৩৫
'শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব' গ্রন্থের প্রচ্ছদ

---

৩৬৫. মিশরীয় সভ্যতায় নীলনদের তীরে নলখাগড়া জাতীয় গাছ পাওয়া যেত। সেই গাছ কেটে প্রাপ্ত খোলকে পাথরচাপা দিয়ে রোদে শুকানো হতো। ফলে খোলগুলো শুকিয়ে যেত এবং পাথরের চাপে সোজা হয়ে লেখার উপযোগী হতো। পরে আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে রোল আকারে সংরক্ষণ করা হতো। এভাবে তৈরি প্রাচীন লেখার উপযোগী মাধ্যমকে প্যাপিরাস বলা হয়। বর্ণমালা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মিশরীয়দের যেমন বিশেষ অবদান ছিল, তেমনই তারা আবিষ্কার করেছিলেন লেখার উপযোগী এই চমৎকার উপাদানটি।

৩৬৬. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪৬; হানি আল-মুবারাক ও শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৫৭।

খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে বাগদাদে কাগজকলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপর দামেশক ও ত্রিপোলিতে কাগজকল চালু হয়। তারপর শুরু হয় ফিলিস্তিন ও মিশরে। কাগজশিল্প পৌঁছে যায় মরক্কোতে, সেখান থেকে পৌঁছে সিসিলিতে ও আন্দালুসে। তারপর ইউরোপ এই শিল্প সম্পর্কে জানতে পারে। বাস্তবিক অর্থেই এই শিল্প-সংস্কৃতি ও আত্মিক জীবনের একটি স্তম্ভ। এরই মধ্য দিয়ে মুসলিমরা এমন একটি যুগের সূচনা করেছিলেন যেখানে জ্ঞান মানুষের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সমাজের সকলের জন্য মশাল হয়ে উঠেছিল এবং বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে ও চিন্তাভাবনা করতে আহ্বান জানিয়েছিল। যেমন বলেছেন সিগরিড হুংকে।[৩৬৭]

পর্যটক, দর্শনার্থী, তীর্থযাত্রী, বণিকদল, বিদ্যার্থীরা তাদের ইউরোপের দেশগুলো থেকে বার্সেলোনা ও ভ্যালেন্সিয়ায় আসত। এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হতো। ইদরিসি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এই কাগজ নিয়ে দেশে ফিরে যেত। পৃথিবীর কোথাও এই কাগজের তুলনা ছিল না।[৩৬৮]

সিগরিড হুংকে বলেছেন, কাগজের কল তৈরি করার দক্ষতা আরবদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা নিজেরাই এই দক্ষতা অর্জন করেছিল। সব ধরনের পানির ও বাতাসের কল দিয়ে তারা ইউরোপকে সাহায্য করেছিল।[৩৬৯]

কাগজশিল্প কেবল নয়, মুসলিমরা কম্পাসও আবিষ্কার করেছেন। কোনো কোনো ইউরোপীয় কম্পাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন ইতালীয় নাবিক ফ্ল্যাভিও জোয়া (Flavio Gioia)-কে। কিন্তু সিডরিড হুংকে এই মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এই ইতালীয় নাবিক মুসলিম আরবদের কাছে এই যন্ত্রের বিদ্যা শিখেছেন।[৩৭০]

গবেষকরা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, আরবরাই কি প্রথম কম্পাস ব্যবহার করেছেন, নাকি তারা চীন থেকে তা নিয়েছেন... লুইস

---

৩৬৭. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪৬।
৩৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
৩৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
৩৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

সিডিও চীনাদের পিক্সিস (Pyxis)[৩৭১] ব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। যদিও তারা ১৮৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বাস করত যে ভূ-গোলকে দক্ষিণতম বিন্দু বা দক্ষিণ মেরু জ্বলজ্বল করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আরবরাই প্রথম কম্পাস ব্যবহার করে। জর্জ সার্টনও তার বক্তব্যে সিডিওকে সমর্থন করেছেন। আরবরাই প্রথম কম্পাস ব্যবহার করেছে ও ইউরোপীয়রা আরবদের থেকে পিক্সিসের ব্যবহার শিখেছে বলে সবাই জোরালো মত প্রকাশ করেছেন।[৩৭২] কম্পাস যে ইউরোপীয়দের জীবনে ব্যাপক অবদান রেখেছিল তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

---

৩৭১. দক্ষিণ আকাশের একটি ছোট ও অনুজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডল। পিক্সিস হলো পিক্সিস নটিকার (Pyxis Nautica) সংক্ষিপ্তরূপ। নাবিকদের কম্পাসের লাতিন নাম এটি।

৩৭২. আনওয়ার রিফায়ি, *আল-ইনসানুল আরাবি ওয়াল-হাদারাতি*, পৃ. ৪৮৭।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

ইউরোপীয়রা–বিশেষ করে স্পেনের কবিরা–আরবি সাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আরবি সাহিত্যের বীরত্বগাথা, রূপকথা, উচ্চমার্গীয় অলংকারপূর্ণ চিত্রকল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। আন্দালুসে আরবি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি ঘটেছে প্রকটভাবে। প্রখ্যাত স্প্যানিশ লেখক ভিসেন্ট ব্লাসকো ইবনেজ (Vicente Blasco Ibáñez) বলেন, আরবদের আন্দালুসে আগমন এবং দক্ষিণের অঞ্চলগুলোতে তাদের দুঃসাহসী সেনাপতি ও বীরযোদ্ধাদের ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত ইউরোপ বীরত্ব সম্পর্কে কিছুই জানত না, এ সংক্রান্ত অপরিহার্য সাহিত্যজ্ঞানের খোঁজও তাদের ছিল না এবং সাহসিকতাপূর্ণ সম্মানবোধের আচরণও তাদের জানা ছিল না।[৩৭৩]

ইবনে হায্ম আন্দালুসি ও তার বিখ্যাত গ্রন্থ *তাওকুল হামামাহ ফিল-উলফাতি ওয়াল-উল্লাফ*-এর ব্যাপক প্রভাব ছিল স্পেনের ও দক্ষিণ ফ্রান্সের কবিদের ওপর। খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে এটা ঘটেছিল। আরবি হয়ে উঠেছিল আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চল ও অভিজাত শ্রেণির ভাষা। স্পেনের খ্রিষ্টান আমির-শাসিত এলাকাগুলোতে আমিরের দরবারে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী কবিদের সঙ্গে মুসলিম কবিরা একত্র হতেন। যেমন স্যাঞ্চোর[৩৭৪] রাজদরবারে উভয় ধর্মের কবিদের সম্মিলন ঘটত। তিনি তার দরবারে তেরোজন আরব মুসলিম কবি এবং বারোজন খ্রিষ্টান ও একজন ইহুদি কবি জড়ো করেছিলেন। ক্যাস্টাইলের রাজা দশম আলফোনসোর (তার পিতার) সময়ের একটি পাণ্ডুলিপিও তিনি অনুসন্ধান

---

৩৭৩. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪২।

৩৭৪. স্যাঞ্চো (Sancho IV of Castile) ছিলেন দশম আলফোনসো ও ইওলান্দার পুত্র এবং তাকে এল ব্রাভো নামে ডাকা হতো। তিনি ১২৮৪ সাল থেকে আমৃত্যু ক্যাস্টাইল, লিয়োঁ ও গ্যালিসিয়া শাসন করেন।-অনুবাদক।

করে উদ্ধার করেন। এই পাণ্ডুলিপিতে একটি তালিকাও পাওয়া যায়, যেখানে দুজন ভ্রাম্যমাণ কবির কথা বলা হয়েছে। এই কবিরা তার দরবারে একত্র হতেন এবং একসঙ্গে উদ[৩৭৫] বাজিয়ে গান গাইতেন। তাদের একজন ছিলেন আরব, আরেকজন ছিলেন ইউরোপীয়। আরও বিস্ময়কর হলো, সে সময়ের ইউরোপীয় কবিরা আরবি কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। এ কারণেই হেনরি মারো[৩৭৬] বলেছেন, রোমান জাতিগুলোর সভ্যতার ওপর আরবদের প্রভাব কেবল নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়ে বা শিল্পকলায় সীমাবদ্ধ নয়, এসব ক্ষেত্রে যেমন তাদের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে তেমনই সংগীত ও কবিতাতেও প্রভাব রয়েছে।[৩৭৭]

ডোজি[৩৭৮] তার ইসলাম-বিষয়ক গ্রন্থে[৩৭৯] স্প্যানিশ লেখক আলভ্যারোর (Álvaro) পুস্তিকা থেকে যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে পশ্চিমা কবি-সাহিত্যিকেরা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা সে যুগে কী পরিমাণ প্রভাবিত হয়েছিলেন তা ভালোভাবেই বোঝা যায়। মানুষের মধ্যে লাতিন ও গ্রিক ভাষার প্রতি অবহেলা এবং মুসলিমদের ভাষার প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহ দেখে আলভ্যারো তীব্র মনস্তাপে প্রায় রোদন করে উঠেছেন, তিনি বলেছেন, আরবি সাহিত্যের গুঞ্জরণ বিচক্ষণ ও রুচিশীল ব্যক্তিদের জাদুগ্রস্ত করে ফেলেছে, ফলে তারা লাতিন ভাষাকে হেয়জ্ঞান করেছে এবং তাদের দখলদারদের ভাষায় লিখতে শুরু করেছে। ব্যাপারটি তার সামসময়িক বলে তার জন্য আরও বেশি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। তিনি স্বাজাত্যবোধের অহমিকায় যতটা গর্বিত ছিলেন তার সমকালীন লোকেরা তা ছিল না। তাই তিনি তিক্ত আফসোসে ভেঙে পড়েছেন। বলেছেন, আমার খ্রিষ্টধর্মীয় ভাইয়েরা আরবদের কবিতায় ও গল্পে মুগ্ধ-বিহ্বল হয়ে পড়ছে, তারা মুসলিম ফকিহ ও দার্শনিকদের লিখিত রচনারাশি

---

৩৭৫. উদ (oud /عود) : ছোট ঘাড়ের বীণাজাতীয় নাশপাতি-আকৃতির বাদ্যযন্ত্র।-অনুবাদক।

৩৭৬. হেনরি-ইরেনি মারো (Henri-Irénée Marrou 1904-1977) একজন ফরাসি ঐতিহাসিক ও খ্রিষ্টান মানবতাবাদী ভাবধারার চিন্তাবিদ। তার কাজের মূল ক্ষেত্র ছিল প্রাচীন কালের নিদর্শন এবং শিক্ষার ইতিহাস।-অনুবাদক।

৩৭৭. আহমদ দারবিশ, *নাযরিয়্যাতুল আদাবিল মুকারান ওয়া তাজাল্লিয়্যাতুহা ফিল-আদাবিল আরাবি*, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

৩৭৮. রেইনহার্ট ডোজি (Reinhart Pieter Anne Dozy 1820-1883) ফরাসি বংশোদ্ভূত ডাচ পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ। প্রোটেস্ট্যান খ্রিষ্টান ছিলেন। নেদারল্যান্ডের লেইডেনে জন্ম ও মৃত্যু। আরবি ভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৩৭৯. Spanish Islam, *A History of the Moslems in Spain* (1913).-অনুবাদক।

গলাধঃকরণ করছে। তারা এই কাজ করছে সেগুলোকে অমূলক ও সস্তা প্রতিপন্ন করার জন্য নয়, বরং বিশুদ্ধ আরবীয় আঙ্গিক ও সাহিত্যরীতি গ্রহণের জন্য। আজ ধর্মীয় লোক ছাড়া আর মানুষেরা কোথায় যারা তাওরাত ও ইনজিলের ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো পড়বে? তারা আজ কোথায় যারা ইনজিল ও নবী-রাসুলদের পুস্তিকাগুলো পাঠ করবে? ওহ, আফসোস! খ্রিষ্টানদের উঠতি মেধাবী প্রজন্ম আরবি ভাষা ও আরবি সাহিত্য ছাড়া কোনো ভাষা ও সাহিত্যই ভালোভাবে জানে না। তারা আরবদের গ্রন্থাবলি থেকে প্রেরণা লাভ করছে। প্রচুর দাম দিয়ে তাদের বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারগুলো বোঝাই করছে। সব জায়গায় তারা আরবি সাহিত্যভান্ডারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছে। অথচ তারা খ্রিষ্টধর্মীয় গ্রন্থাবলির নাম শুনলে সেদিকে ফিরেও তাকায় না, আগ্রহ তো দেখায়ই না। তারা জানিয়ে দিতে চায় যে খ্রিষ্টধর্মীয় গ্রন্থাবলি তাদের মনোযোগ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। হায় আফসোস! খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজেদের ভাষা ভুলে গেছে। আজ তুমি তাদের মধ্যে প্রতি হাজারে একজনকেও পাবে না যে তার বন্ধুকে নিজেদের ভাষায় চিঠি লেখে। বরং আরবি ভাষাতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, আরবি ভাষার ঢং ও আঙ্গিক তারা চমৎকারভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। তারা আরবি ভাষায় এমন সব কবিতা রচনা করছে যা শোভায়, সৌষ্ঠবে এবং ভাবপ্রকাশে খোদ আরবদের কবিতা থেকেও উৎকৃষ্ট।[৩৮০]

ইউরোপীয় ভাষাগুলোর ওপর আরবি ভাষার প্রভাব সম্পর্কে ডিটার মেসনার[৩৮১] বলেন, আইবেরিয়ান উপদ্বীপে কথ্য ভাষাগুলোর ওপর আরবি ভাষার—যা অ্যারাবিয়ান সুপারস্টেট ও আরব অভিজাতদের ভাষা—প্রভাব ক্যাস্তিলিয়ান, পর্তুগিজ ও কাতালান ভাষাগুলোকে রোমান্স[৩৮২]

---

৩৮০. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪৩।

৩৮১. ডিটার মেসনার (Dieter Messner) ইউনিভার্সিটি অব সালজবার্গের (Universität Salzburg) রোমান্স ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

৩৮২. রোমান্স 'Romance' নামটি প্রাকৃত লাতিন ক্রিয়াবিশেষণ romanice থেকে এসেছে, যা ধ্রুপদি লাতিনের romanicus (রোমানিকুস) শব্দ থেকে বিবর্তিত। রোমান্স বা রোমান্টিক উপন্যাসে ব্যবহৃত রোমান্স শব্দটির উৎপত্তিও একই। মধ্যযুগে ইউরোপে গুরুগম্ভীর রচনা লিখিত হতো মূলত লাতিনে; সাধারণ জনপ্রিয় প্রেমকাহিনি ও অন্যান্য লঘু রচনা রচিত হতো স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় এবং এগুলোকে রোমান্স বলে অভিহিত করা হতো। রোমান্স ভাষাসমূহ (Romance languages) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের একটি শাখা। রোমান সাম্রাজ্যের ভাষা, লাতিন থেকে উদ্ভূত সব ভাষা এই ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত। এসব ভাষায়

ভাষাশ্রেণির মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থান দিয়েছে। আরবি ভাষার প্রভাব কেবল আইবেরিয়ান উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এই উপদ্বীপের মধ্যস্থতার ফলে আরবির এসব প্রভাব ফরাসি ভাষার মতো অন্যান্য ভাষাতেও ছড়িয়ে পড়ে।[৩৮৩]

ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় জীবনের নানাদিক সম্পর্কে কী পরিমাণ আরবি শব্দ প্রবেশ করেছে তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অনেক শব্দ তার আরবি মূলরূপও ধরে রেখেছে। যেমন : কুত্ন (Cotton), আল-হারিরুদ দিমাশকি (Damask), মিস্ক (Musk), শারাব (Syrup), জার্রা (Jar), লাইমুন (Lemon), সিফ্র (Medieval Latin: cifra), এমন আরও অসংখ্য শব্দ। আমাদের জন্য এখানে অধ্যাপক ম্যাকেইলের মন্তব্য উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট, ইউরোপ তার উপন্যাস-সাহিত্যে আরবীয় দেশ ও সিরিয়ান-আরব নাজদে বসবাসকারী জাতি-গোষ্ঠীর কাছে ঋণী। বিশ্ব যে প্রেরণায় বুঁদ হয়েছিল তার থেকে ভিন্ন প্রেরণায় ও কল্পনায় ইউরোপীয় মধ্যযুগকে আলাদা করে দিয়েছিল (আরব থেকে প্রাপ্ত) কিছু উদ্দীপনামূলক শক্তি। ইউরোপ অনেকাংশে বা প্রধানত এসব শক্তির কাছে ঋণী।[৩৮৪]

ইউরোপীয় গল্প-সাহিত্য বিকাশকালে প্রভাবিত হয়েছে আরবদের মধ্যযুগীয় গল্পশিল্পের দ্বারা। মাকামাত[৩৮৫], বীরত্বগাথা, মর্যাদা ও প্রণয়ের পথে দুঃসাহসী ব্যক্তিদের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ইত্যাদি ছিল আরবদের গল্পশিল্পের বিষয়। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় *আলফু লায়লা ওয়া লায়লা (আলিফ লায়লা)*-এর অনুবাদ তাদের গল্প-সাহিত্যে

উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও বিশ্বের বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষুদ্র অঞ্চলের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ কথা বলে থাকে। রোমান্স ভাষাগুলো প্রাকৃত লাতিন ভাষা (Vulgar Latin) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যের সেনা, বণিক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকালয়ের মানুষেরা এই প্রাকৃত লাতিন ভাষায় কথা বলত। প্রাকৃত লাতিন ছিল ধ্রুপদি লাতিন থেকে বেশ আলাদা।-অনুবাদক।

৩৮৩. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা খাদরা জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : اللغة والأدب (Language and Literature), অনুচ্ছেদ : مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها في اللغات الرومانسية والأيبيرية (Further Listings and Categorisations of Arabic Words in Ibero-Romance), লেখক : ডিটার মেসনার, খ. ১, পৃ. ৬৫১।

৩৮৪. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪৪।

৩৮৫. কাব্য আকারে সাহিত্যমানসম্পন্ন কাল্পনিক গল্প।-সম্পাদক

বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। ওই সময় থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত ইউরোপীয় যাবতীয় ভাষায় আলিফ লায়লার তিন হাজারেরও বেশি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এমনকি কয়েকজন ইউরোপীয় সমালোচক মনে করেন যে, জোনাথন সুইফ্‌ট রচিত গালিভারের ভ্রমণকাহিনি[৩৮৬] এবং ড্যানিয়েল ডিফো রচিত রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত[৩৮৭] *আলিফ লায়লা* ও আরব দার্শনিক ইবনে তুফাইলের *হাই ইবনে ইয়াকযান* পুস্তকটির কাছে ঋণী।[৩৮৮]

বোক্কাচ্চো[৩৮৯] ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে *দেকামেরন*[৩৯০] নামে তার গল্পগুলো রচনা করেন। গল্পগুলো লেখা হয়েছে আলিফ লায়লার অনুকরণে। উইলিয়াম শেক্সপিয়রও *আলিফ লায়লা* থেকে তার *All's Well That Ends Well*

---

৩৮৬. জোনাথন সুইফ্‌ট রচিত যুগান্তকারী বক্তব্যপ্রধান কাহিনি। ইংরেজি ভাষায় লেখা এই কাহিনি ভ্রমণবৃত্তান্তের আদলে রচিত। ১৭২১ সাল থেকে ১৭২৬ সালের মধ্যে সুইফ্‌ট এই লেখা শেষ করেন বলে মনে করা হয়। ১৭২৬ সালের ২৮ অক্টোবর এই বই প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে এই ভ্রমণকাহিনি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। *Gulliver's Travels* মূলত বাজারে প্রচলিত ভ্রমণকাহিনিগুলোর প্যারডি বা ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এর প্রতিটি অসম্ভব অভিযানের অন্তরালে প্রচলিত ভ্রমণকাহিনিগুলোর এক মর্মান্তিক ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।-অনুবাদক।

৩৮৭. *রবিনসন ক্রুসো (Robinson Crusoe)* ইংরেজ ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডিফো রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ এবং ওই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র। রচনাকাল ১৭১৯ সাল। স্কটল্যান্ডবাসী নাবিক আলেকজান্ডার সেলকার্কের (১৬৭৬-১৭২১ খ্রি.) দুঃসাহসিক অভিযান রবিনসন ক্রুসোর গল্পের উপাদান। রবিনসন ক্রুসো সমুদ্রযাত্রা করে জাহাজডুবিতে একটি নির্জন দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করে ডিফো তিন খণ্ডে *রবিনসন ক্রুসো* রচনা সমাপ্ত করেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের শক্তির জয় এই গ্রন্থের মূল বিষয়। এই বইয়ের অনুকরণে সুইজারল্যান্ডের লেখক জোহান রুডোল্‌ফ ভিস (Johann Rudolf Wyss) লেখেন তার বিখ্যাত বই *ডের শ্‌ভাইট্‌সেরিশে রোবিন্সন্‌;* মোট চার খণ্ডে রচিত এই বই *সুইস ফ্যামিলি রবিনসন* নামে ইংরেজি অনুবাদে পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। দুটি বই-ই বাংলাভাষায় অনূদিত ও বহুল পরিচিত।-অনুবাদক।

৩৮৮. জাক সি রিসলার (Jacques C. Risler), *LA CIVILISATION ARABE*, আরবি অনুবাদ, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাহ*, অনুবাদক : গানিম আবদুন, আরবি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২২৩।

৩৮৯. জিওভান্নি বোক্কাচ্চো (Giovanni Boccaccio 1313-1375) একজন ইতালীয় লেখক ও কবি। চতুর্দশ শতকের সফলতম ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের অন্যতম।-অনুবাদক।

৩৯০. *দেকামেরোন* (*The Decameron* বা *দশ দিনের অপেরা*) হলো চতুর্দশ শতকের জিওভান্নি বোক্কাচ্চোর লেখা একশটি গল্পের সংকলন। একে চতুর্দশ শতকে রচিত ইউরোপের প্রধান সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। বইটির গল্পগুলো বর্ণনা করে একদল তরুণ-তরুণী। এই সময়ে ফ্লোরেন্সে কালোমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তিনজন তরুণ ও সাতজন তরুণী কালোমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দশদিন শহরের বাইরে অবস্থান করে। সময় কাটানোর জন্য প্রত্যেক সদস্য প্রতিরাতে একটি করে গল্প বলে। এইভাবে দশদিনে গল্প বলে একশটি।-অনুবাদক।

নাটকের প্লট গ্রহণ করেন। একইভাবে জার্মান লেখক ও নাট্যকার লেসিং (Gotthold Ephraim Lessing) তার *Nathan der Weise* নাটকের ধারণা গ্রহণ করেন *আলিফ লায়লা* থেকে। বোক্কাচ্চোর যুগে যারা তার থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইংরেজি ভাষায় আধুনিক কাব্যের জনক জেফ্রি চসার। তিনি ইতালিতে গিয়ে বোক্কাচ্চোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পরপরই *দা ক্যান্টারবেরি টেইল্স*[৩৯১] নামে তিনি তার বিখ্যাত গল্পগুলো রচনা করেন।[৩৯২]

বহু সমালোচক জোর দিয়ে বলেছেন যে, দান্তে তার *ডিভাইন কমেডিতে*[৩৯৩] পরজগৎ ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তিনি আরবি সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গ্রন্থ দুটির একটি হলো কবি ও দার্শনিক আবুল আলা মাআররি (৩৬৩-৪৫৯ হি./৮৭৩-১০৫৭ খ্রি.) রচিত *রিসালাতুল গুফরান* এবং অপরটি হলো কবি ও দার্শনিক ইবনুল আরাবি (৫৫৮-৬৩৮ হি./১১৬৪-১২৪০ খ্রি.) রচিত *ওয়াসফুল জান্নাহ*।

দান্তে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের শাসনকালে সিসিলিতে অবস্থান করছিলেন। ফ্রেডেরিক ছিলেন আরবি উৎসকে ভিত্তি করে ইসলামি সংস্কৃতি ও তার জ্ঞানচর্চার প্রতি উৎসাহী। অ্যারিস্টটলের মতবাদ নিয়ে

---

[৩৯১]. *দা ক্যান্টারবেরি টেইল্স (The Canterbury Tales)* ইংরেজি সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর রচয়িতা চতুর্দশ শতাব্দীর জেফ্রি চসার (Geoffrey Chaucer, আনু. ১৩৪৫-১৪০০ খ্রি.) ছিলেন অসাধারণ গুণী মানুষ। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, অনুবাদক, পণ্ডিত, যোদ্ধা, রাষ্ট্রদূত। সরকারি কর্মচারী জেফ্রি চসার মাতৃভাষা ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি এবং লাতিন ভাষা খুব ভালো জানতেন। বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন স্বদেশ ও বিদেশের নানা স্তরের নানা চরিত্রের নানান মানুষের সঙ্গে। বাস্তবিক জীবনের এই ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা তার শ্রেষ্ঠ কাব্য ক্যান্টারবেরি টেইল্স-এ প্রতিফলিত হয়েছে।-অনুবাদক।

[৩৯২]. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪৪।

[৩৯৩]. *দা ডিভাইন কমেডি (The Divine Comedy)* ইতালীয় কবি দান্তে আলেগিয়েরি (Dante Alighieri 1265-1321) রচিত মহাকাব্য। কাব্যটির মূল নাম *দিভিনা কোমেদিয়া (Divina Commedia)*; ইংরেজি পাঠক মহলে *ডিভাইন কমেডি* নামেই পরিচিত। একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা দান্তে ছিলেন মধ্যযুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। দান্তে ঠিক কবে *দা ডিভাইন কমেডি* লিখতে শুরু করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ১৩২১ সালে মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি এ মহাকাব্য সমাপ্ত করেন। দান্তের বেশ কিছু রচনা আছে লাতিন ভাষায়; কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি *'দিভিনা কোমেদিয়া'* মহাকাব্যটি তিনি রচনা করেন তার মাতৃভাষা ইতালীয়তে।-অনুবাদক।

ফ্রেডেরিক ও দান্তের মাঝে একাধিকবার বিতর্ক হয়। তন্মধ্যে কিছু বিতর্কের উৎস ছিল আরবি রচনাবলি।[৩৯৪]

এ ছাড়া নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সম্পর্কে দান্তের প্রচুর জানাশোনা ছিল। এ সূত্রে রাসুলের মিরাজ ও রাত্রিকালীন ভ্রমণ (আল-ইসরা) এবং আসমানের বিবরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।[৩৯৫] এ ব্যাপারে সিগরিড হুংকে বলেছেন, দান্তে ও ইবনুল আরাবির মধ্যে সামঞ্জস্য বেশ ভালোভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইবনুল আরাবি থেকে তার উপমাগুলো প্রায় দুইশ বছর পর গ্রহণ করেছেন দান্তে।[৩৯৬]

ইতালি ও ফ্রান্সে যখন আরবীয় সংস্কৃতির যুগ, সেই সময়টা যাপন করেছিলেন কবি পেত্রার্কা[৩৯৭]। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় (University of Montpellier) ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরবদের রচনাবলি ও আন্দালুসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাদের ছাত্রদের ওপর ভিত্তি করে।[৩৯৮] এই কারণে পেত্রার্কা তার জাতির উদ্দেশে বলেছেন, কী আশ্চর্য! দেমোস্থিনিসের[৩৯৯] পর সিসেরো[৪০০] বাগ্মী হতে

---

[৩৯৪]. এখানে তথ্যগত বিভ্রাট রয়েছে। দান্তের জন্ম হয়েছে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পর। তাই তাদের মধ্যে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।-অনুবাদক

[৩৯৫]. মুস্তাফা শাক্আ, *মাআলিমুল হাদারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ২৬৩-২৬৫।

[৩৯৬]. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫২১।

[৩৯৭]. ফ্রাঞ্চেসকো পেত্রার্কা (Francesco Petrarca 1304-1374) একজন লেখক, কবি ও মানবতাবাদী। পেত্রার্কাকে 'মানবতন্ত্রের জনক' বলা হয়। পিয়েত্রো বেম্বো (Pietro Bembo) ১৬শ শতাব্দীতে পেত্রার্কা, বোক্কাচ্চো ও দান্তের কাজের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক ইতালীয় ভাষার একটি মডেল তৈরি করেন। রেনেসাঁসের যুগে পেত্রার্কার সনেটগুলো পুরো ইউরোপজুড়ে প্রশংসিত হয় এবং কবিদের অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। লিরিক কবিতার মডেলে পরিণত হয়েছিল তার সনেট। 'অন্ধকার যুগ' প্রপঞ্চটির প্রবর্তক যারা ছিলেন পেত্রার্কা তাদের অগ্রগণ্য।-অনুবাদক।

[৩৯৮]. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. 88।

[৩৯৯]. দেমোস্থিনিস (Demosthenes 384-322 BC) ছিলেন প্রাচীন এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক ও বাগ্মী। তার বক্তৃতাগুলোতে সামসময়িক এথেনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা ও প্রতাপ প্রকাশ পেত। জীবনের একটি সময় তিনি পেশাদার বক্তৃতালেখক (লোগোগ্রাফার) হিসেবে কাটিয়েছেন।-অনুবাদক।

[৪০০]. মার্কাস টুলিয়াস সিসেরো (Marcus Tullius Cicero 106-43 BC) ছিলেন প্রাচীন রোমের বিখ্যাত বাগ্মী, কূটনীতিক, রাজনৈতিক তত্ত্ববিশারদ, আইনজ্ঞ এবং দার্শনিক। তাকে অনেকেই লাতিন ভাষার শ্রেষ্ঠ বাগ্মী এবং প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।-অনুবাদক।

পেরেছেন এবং হোমারের[৪০১] পর ভার্জিল[৪০২] কবি হতে পেরেছেন। তাহলে কেন আমাদের এই দুর্ভাগ্য যে আমরা আরবদের পর কিছু লিখলাম না। আমরা ছিলাম গ্রিকদের ও সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর সমকক্ষ এবং মাঝে মাঝে আমরা তাদের থেকে এগিয়েও ছিলাম, কেবল আরবদের ব্যতিরেকে। আফসোস নির্বুদ্ধিতার জন্য! ভ্রান্তিবিলাসিতার জন্য আফসোস! আফসোস ইতালির ক্লান্ত নিস্তেজ প্রতিভার জন্য![৪০৩]

এমনই ছিল আরবীয় ইসলামি সভ্যতার আলোকশিখা, যা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানবতার আবাসগুলো আলোকিত করে তুলেছিল।

---

৪০১. হোমার (Homer, আনু. খ্রিষ্টপূর্ব ১২-৯ শতক) প্রাচীন গ্রিক কবি ও ইউরোপের আদি কবি হিসেবে খ্যাত। গ্রিক ভাষায় তার নাম 'ওমেরোস্' হলেও আমাদের কাছে তিনি 'হোমার' নামেই পরিচিত। বিশ্বসাহিত্যের সেরা সম্পদ '*ইলিয়াড*' ও '*অডিসি*' মহাকাব্য দুটি তার রচনা। হোমারের জীবন, জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে হোমার নামে আসলে কেউ ছিলেনই না। আধুনিক গবেষকেরা অবশ্য হোমার এবং হোমারের সৃষ্টিকর্মকে স্বীকার করে নিয়েছেন। হোমার অন্ধ ছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে। কিন্তু তার কাব্যে পৃথিবীর রূপ-রস ও সৌন্দর্যানুভূতির এমন আশ্চর্য সজীবতার প্রকাশ ঘটেছে যে গবেষকেরা মনে করেন, হোমার শেষ বয়সে দৃষ্টি হারিয়ে থাকতেও পারেন, তবে জন্মান্ধ ছিলেন না নিশ্চয়ই। প্রাচীন গ্রিসে হোমার জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল উভয়েই তাদের রচনায় বারংবার হোমারের কাব্যরীতির উল্লেখ করেছেন।-অনুবাদক।

৪০২. ভার্জিল (Virgil, আনু. ৭০-১৯ খ্রিষ্টপূর্ব) প্রাচীন রোমক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে খ্যাত। তার অমর ও কালজয়ী মহাকাব্য *ইনিদ*-এর জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০ অব্দের ১৫ অক্টোবর ইতালির মান্তোয়ার নিকটবর্তী আন্দেস নামক গ্রামের এক অবস্থাপন্ন কৃষকপরিবারে তার জন্ম। পুরো নাম পুবলিউস ভের্গিলিউস্ মারো (Publius Vergilius Maro) হলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রে তিনি বাংলাদেশে ভার্জিল নামেই পরিচিত। জন্মসূত্রে ভার্জিল গ্রামকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ভালোও বেসেছিলেন অকৃত্রিমভাবে। তাই প্রথম জীবনে তিনি গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবনভিত্তিক কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘ এগারো বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভার্জিল '*ইনিদ*' মহাকাব্যটি রচনা করেন। রচনা শেষ করার পর এর গুণগত মানে তিনি পুরোপুরি তৃপ্ত হতে না পেরে কিছু দুর্বল অংশ আবার সংশোধন ও পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই কাজ শেষ করার আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর আগে তিনি এই মহাকাব্য পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে যান। সম্রাট অগাস্টাস সিজারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত কবির এই নির্দেশ অগ্রাহ্য হয়।-অনুবাদক।

৪০৩. লুইস সিডিও, *Histoire des Arabes* (১৮৫৪), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাব*, অনুবাদক: আদিল যুআইতার, পৃ. ৫৬৯।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

শিষ্টাচার ও আচরণে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, কবিতা ও সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউরোপ ইসলামি সভ্যতা থেকে যা গ্রহণ করেছে তা স্পষ্ট ও সুবিদিত। কারণ এগুলো সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত প্রভাব, সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে এগুলোর পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই সম্ভব। অন্যদিকে সামাজিক ও মানবিক প্রভাব (শিষ্টাচার ও আচরণ)-এর পর্যবেক্ষণ ততটা স্পষ্টভাবে সম্ভব নয়। কালগত দৃশ্যপট যত বিস্তৃত হয়, সামাজিক বিকাশও তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক কার্যাবলি ও ঘটনাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এগুলো এখনো পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ক্ষেত্র। তাই এই অনুচ্ছেদে আমরা বহু তুলনামূলক বিষয় উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। আমরা বাস্তবিক অর্থেই দেখেছি যে ইসলাম যেসব বিষয় প্রতিষ্ঠিত করেছে, পাশ্চাত্যসভ্যতা এখনো তার অধিকাংশেরই নাগাল পায়নি। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা ও দর্শনের পার্থক্য থেকেই গেছে। আমরা এখানে পাশ্চাত্যের এমন কিছু দিক উল্লেখ করব যা পরিপূর্ণরূপে ইসলামি সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত।

ফরাসি লেখক ফ্রাঁসোয়া জোলিভেট কাস্তাও (François Jollivet-Castelot) তার '*কানুনুত তারিখ*' (*La Loi de l'Histoire*, 1933) গ্রন্থে বলেছেন, ইউরোপ ওই যুগে যে উপকারী বায়ু-প্রবাহ ভোগ করেছে তার জন্য আরবীয় চিন্তা-চেতনার কাছে ঋণী। ইউরোপ এমন চারটি শতাব্দী কাটিয়েছে যখন সেখানে আরবসভ্যতা ছাড়া আর কোনো সভ্যতার অস্তিত্বই ছিল না। ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরাও আরবসভ্যতার উড্ডীয়মান ঝাণ্ডা বহন করেছে।[৪০৪]

---

৪০৪. ফ্রাঁসোয়া জোলিভেট কাস্তাও, *La Loi de l'Histoire*; মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, পৃ. ৫৪৪ থেকে উদ্ধৃতি।

অত্যন্ত যৌক্তিক বিবেচনায় সমকালীন পাশ্চাত্যসভ্যতার যেকোনো দৃশ্যপটের উন্নতি ও বিকাশকে রোমান সভ্যতা থেকে আলাদা করে ওই মধ্যযুগের সঙ্গে অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতাকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। অধিকার, স্বাধীনতা, আচার-আচরণ, আখলাক-শিষ্টাচার, লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামি সভ্যতার কী অবদান তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। এই অনুচ্ছেদে আমরা পাশ্চাত্যসভ্যতায় এসব অবদানের কী প্রভাব রয়েছে তা খতিয়ে দেখব। ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে আলফোনসো দা গ্রেট[৪০৫] তার পুত্র যুবরাজের জন্য একজন শিক্ষাগুরু নিয়োগ করার ইচ্ছা করেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কর্ডোভার দুইজন মুসলিমকে আহ্বান জানান। কারণ তার পুত্রকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কোনো খ্রিষ্টান তিনি খুঁজে পাননি।[৪০৬]

মুসলিমরা যখন আন্দালুস জয় করলেন, খ্রিষ্টানদের একটি দল ইসলামি শাসনের ছায়াতলে বসবাস করতে চাইল না, তারা ফ্রান্সে চলে যাওয়াটাকেই ভালো মনে করল। টমাস আর্নল্ড[৪০৭] যে-সকল খ্রিষ্টান ইসলামি রাজ্যে সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করেছে তারা মুসলিমদের থেকে কী আচরণ পেয়েছে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে যারা ফ্রান্সে চলে গিয়েছিল তারা ওখানে কী আচরণের শিকার হয়েছিল সেটাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের শাসনাধীন বসবাস করার জন্য ফরাসি দেশে চলে গিয়েছিল তাদের অবস্থা বাস্তবিক বিচারে তাদের ধর্মীয় ভাইদের (যারা আন্দালুসে ইসলামি শাসনের ছায়াতলে থেকে গিয়েছিল তাদের) চেয়ে ভালো ছিল না। ৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কদের রাজা শার্লেমাইন (Charlemagne) স্পেন থেকে ফিরে

---

৪০৫. তৃতীয় আলফোনসো অব আস্তুরিয়াস (Alfonso III of Asturias 848-910), ৮৬৬ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লিয়োঁ, গ্যালিসিয়া ও আস্তুরিয়াসের রাজা।-অনুবাদক

৪০৬. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, পৃ. ৫৪৮।

৪০৭. স্যার টমাস ওয়াকার আর্নল্ড (Sir Thomas Walker Arnold 1864-1930) ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এর আরবি ভাষা ও ইসলামি শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।-অনুবাদক

আসেন। এ সময় যেসব দেশত্যাগী লোক তার সঙ্গে জড়ো হয়েছিল তাদেরকে সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের হুমকি-ধমকি ও জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করেন। তিন বছর পর ফরাসি রাজা লুইস দা পাইয়াস (Louis the Pious) দেশত্যাগীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি ডিক্রি জারি করতে বাধ্য হন। তা সত্ত্বেও তারা অভিজাত শ্রেণির লোকদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ না করে থাকতে পারেনি; কারণ অভিজাত শ্রেণির লোকেরা দেশত্যাগীদের নামে বরাদ্দ ভূমি দখল করে নিচ্ছিল। কিন্তু এসব দুর্বৃত্তদের দমনপ্রচেষ্টা কিছুদিনের মধ্যে অকেজো হয়ে পড়ল এবং নতুন করে অভিযোগের পাহাড় তৈরি হলো। এ সকল সহায়সম্বলহীন দুর্ভাগা দেশত্যাগীদের অবস্থা ভালো করার জন্য যেসব সরকারি ফরমান ও ডিক্রি জারি হয়েছিল তার কোনো হদিসই পাওয়া গেল না। পরবর্তী সময়ে ক্যাগোট (Cagots) সংখ্যালঘুরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আচরণের শিকার হয়েছিল। যেসব স্প্যানিশ কলোনি ইসলামি শাসনব্যবস্থা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের স্বগোত্রীয় খ্রিষ্টানদের করুণার ওপর ছুড়ে দিয়েছিল তাদের কথাও পুনরায় উল্লেখ করব।[৪০৮]

মুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা ও লেনদেন যে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের স্বভাবচরিত্রকে নম্র-ভদ্র করে তুলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আন্দালুসের এক ঐতিহাসিক ইজিডোরের (Isidore of Seville) ক্রিয়াকলাপ থেকেও। টমাস আর্নল্ড বর্ণনা করেছেন যে, ইজিডোর মুসলিম বিজেতাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতেন। অথচ তিনি আবদুল আযিয ইবনে মুসা ইবনে নুসাইর যে সম্রাট রডারিকের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন সেই ঘটনা পেশ করেছেন কোনো বিরূপ মন্তব্য ছাড়াই; এই ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি একটিও নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেননি।[৪০৯] আর্নল্ড আরও জানাচ্ছেন, এসব বিষয় ছাড়াও বহু খ্রিষ্টান তাদের নাম রেখেছিল আরবি শব্দে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি পালনে তারা মুসলিম প্রতিবেশীদের অনুসরণও করত। ফলে অসংখ্য খ্রিষ্টান খতনা করিয়েছিল। খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও তারা মুসলিমদের সংস্কার ও রীতিনীতি মেনে চলত।[৪১০]

---

৪০৮. টমাস আর্নল্ড, *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*, আরবি অনুবাদ, الدعوة الى الاسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية, পৃ. ১৫৯।

৪০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৪১০. প্রাগুক্ত।

ক্রুসেড যুদ্ধকালে যেসব ক্রুসেডার সিরিয়া (শাম ভূমি) দখল করে নিয়েছিল তারা ছিল পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এমনকি উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট[৪১১] বিস্ময় বোধ করেছেন এবং বলেছেন, ক্রুসেডে অংশগ্রহণের জন্য যারা এসেছিল তাদের ধর্ম (খ্রিষ্টধর্ম) যে শান্তির ধর্ম এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল।[৪১২]

কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশার পর তাদের মন-মানসিকতা পালটে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উইল ডুরান্ট বলেন, যে ইউরোপীয়রা এসব দেশে (সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে, ক্রুসেডের সময়) তাদের আবাস তৈরি করে নিয়েছিল তারা ধীরে ধীরে প্রাচ্যীয় বেশভূষা ও আদব-আখলাক গ্রহণ করে..। এসব (বিজিত) এলাকায় যে-সকল মুসলিম বসবাস করত তাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক ও যোগাযোগ জোরালো হয়ে ওঠে। এতে দুটি জাতির মধ্যে যে রেষারেষি ও শত্রুতাভাব ছিল তা কমে যায়। মুসলিম ব্যবসায়ীরা পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে খ্রিষ্টীয় দেশগুলোতে প্রবেশ করতে শুরু করে[৪১৩] এবং ওখানকার বাসিন্দাদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে। অন্যদিকে খ্রিষ্টান রোগীরা খ্রিষ্টান চিকিৎসকদের চেয়ে মুসলিম ও ইহুদি চিকিৎসকদের প্রাধান্য দেয়। খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতারা মুসলিমদের মসজিদগুলোতে ইমামতি ও ইবাদতের অনুমতি দেয়। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত আন্তাকিয়ায় ও ত্রিপোলিতে অবস্থিত মাদরাসাগুলোতে মুসলিমরা তাদের সন্তানদের পাঠাতে ও কুরআন শেখাতে শুরু করে।[৪১৪]

এসব ব্যাপার খ্রিষ্টানদের মৌলিক স্বভাবজাত ছিল না। কারণ ক্রুসেডাররা স্পেনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কী নির্মম আচরণ করেছিল তা আমরা

---

[৪১১]. উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট (William Montgomery Watt 1909-2006) ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও ইসলামি স্টাডিজে বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও ইসলামশিক্ষা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টো, কলেজ ডি ফ্রান্স এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি স্কটিশ এপিস্কোপাল চার্চের ধর্মযাজক ছিলেন। ইসলামি দর্শন, তুলনামূলক ধর্ম, ইসলামি ইতিহাস ও ইসলামি সভ্যতা বিষয়ে তার ২০টি গ্রন্থ রয়েছে।-অনুবাদক।

[৪১২]. মন্টগোমারি ওয়াট, *The Influence of Islam on Medieval Europe*, আরবি অনুবাদ, فضل الإسلام على الحضارة الغربية, পৃ. ১০২।

[৪১৩]. খ্রিষ্টানরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের যেসব এলাকা দখল করে নিয়েছিল সেগুলো উদ্দেশ্য। অন্যথায় এগুলো তাদের দেশ ছিল না।

[৪১৪]. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৫, পৃ. ৩৪।

দেখেছি। ওই সময় থেকে পাঁচ শতাব্দী কেটে যাওয়ার পর স্পেনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি বাইতুল মুকাদ্দাস স্বাধীন করার পর খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যে মানবিক আচরণ করেছিলেন তা ছিল বিস্ময়কর। আশ্চর্যজনক হলেও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির এমন আচরণের মূল্যায়নও রয়েছে, স্বীকৃতিও রয়েছে।

আমরা দেখি যে, ফরাসি মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ ম্যাক্সিম রোডিনসন[৪১৫] তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে, সবচেয়ে বড় শত্রু সালাহুদ্দিন পশ্চিমাদের মধ্যে ব্যাপক বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন। তিনি মানবিকতা ও বীরত্বের দ্বারা যুদ্ধকে অলংকৃত করলেন; অথচ তার শত্রুদের মধ্য থেকে তার সঙ্গে এমন আচরণ খুব কম লোকই করেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড দা লায়নহার্ট।[৪১৬]

টমাস আর্নল্ড বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে, সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চারিত্রিক গুণাবলি ও তার বীরত্বপূর্ণ জীবন তার সমকালে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মন ও মগজে জাদুকরী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এমনকি একদল খ্রিষ্টান বীরযোদ্ধা সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রতি এতটাই আকর্ষণ অনুভব করেছিল যে তারা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে এবং স্বজাতিকে ত্যাগ করে মুসলিমদের সঙ্গে গিয়ে মিশে।[৪১৭]

খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের মধ্যে সালাহুদ্দিনের মহত্ত্ব সম্পর্কে যে বিস্ময় ছড়িয়ে ছিল তা লিপিবদ্ধ করেছেন উইল ডুরান্ট, সালাহুদ্দিন নিজ ধর্মের প্রতি সীমাহীন অনুরাগী ছিলেন। নাইটস টেম্পলার[৪১৮] ও নাইটস

---

৪১৫. ম্যাক্সিম রোডিনসন (Maxime Rodinson 1915-2004) একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ ও ধর্মের ইতিহাস বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত। ইসলাম ও আরববিশ্ব সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো, *Muhammad* (১৯৬০): *Islam and Capitalism* (১৯৬৬); *Marxism and the Muslim world* (১৯৭২); *Europe and the Mystique of Islam* (১৯৮০)।

৪১৬. ম্যাক্সিম রোডিনসন, *আস-সুরাতুল গারবিয়্যাহ ওয়াদ-দিরাসাতুল গারবিয়্যাতু ওয়াল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪১।

৪১৭. টমাস আর্নল্ড, The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, আরবি অনুবাদ, الدعوة الى الاسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية, পৃ. ১১১।

৪১৮. নাইটস টেম্পলার : সুলাইমানের মন্দির এবং খ্রিষ্টের দরিদ্র সহযোগী-সৈনিকবৃন্দ (Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon) সাধারণ মানুষের কাছে নাইট টেম্পলার নামে পরিচিত। এ ছাড়া একে অর্ডার অব দা টেম্পলও বলা হয়ে থাকে। খ্রিষ্টান সামরিক যাজক সম্প্রদায়গুলোর (অর্ডার) মধ্যে এটিই সবচেয়ে বিখ্যাত এবং পরিচিত। মধ্যযুগে প্রায় দুই শতকব্যাপী এই সংগঠনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম

হসপিটালার্স[৪১৯]-এর ওপর তীব্র কঠোরতাকে তিনি নিজের জন্য বৈধ ও সহনীয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বভাবত তিনি দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও পরাজিতদের প্রতি দয়াপরবশ ছিলেন। অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তার সকল শত্রুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এতে খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকেরা বিস্ময় বোধ করেছেন যে, কীভাবে দ্বীনে ইসলাম–যা তাদের ধারণায় ভ্রান্ত–একজন ব্যক্তিকে এমনভাবে চারিত্রিক গুণাবলিতে ভূষিত করল যে, সে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের এই পর্যায়ে পৌছে গেল।[৪২০]

এ তো গেলই, চৌদ্দ শতাব্দী পরও ইসলামি এই বিধান এখনো অটুট রয়েছে,

«أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى»

ক্রুসেডের পরই এর সৃষ্টি হয় যার উদ্দেশ্য ছিল জেরুসালেমে আগত বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জেরুসালেম মুসলিমদের দখলে চলে যাওয়ার পর এই নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে চার্চ এই সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করে। এরপর থেকে যাজক সম্প্রদায়টি গোটা ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এর সদস্যসংখ্যা এবং ক্ষমতা বিপুল হারে বাড়তে থাকে। স্বতন্ত্র ধরনের লাল ক্রস-সংবলিত আলখাল্লা পরিধান করার কারণে যেকোনো টেম্পলার নাইটকে সহজেই চিহ্নিত করা যেত। তারা ছিল ক্রুসেডের সময়কার সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, সর্বোচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সর্বোচ্চ শৃঙ্খলাবিশিষ্ট যোদ্ধা দল।-অনুবাদক।

৪১৯. নাইটস হসপিটালারস : নাইটস হসপিটালার (The Order of Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem) একটি ক্যাথলিক মিলিটারি অর্ডার। বিভিন্ন সময়ে এর হেডকোয়ার্টার জেরুসালেম, রোডস এবং মাল্টাতে ছিল। ১২শতকে great monastic reformation-এর সময় জেরুসালেমের মুরিস্তান জেলায় আমালফিটান হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত লোকদের সংঘ হিসাবে হসপিটালারদের উত্থান হয়। পবিত্র ভূমিতে আসা খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য ১০২৩ সনে জন দি ব্যাপ্টিস্ট (ইয়াহয়া)-এর প্রতি উৎসর্গিত করে জেরার্ড থম (Gerard Thom) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য কিছু বিদ্বান মনে করেন যে আমালফিটান হাসপাতাল থেকে জেরার্ড থমের অর্ডার ও হাসপাতাল ভিন্ন ছিল। প্রথম ক্রুসেড চলাকালে ১০৯৯ সনে জেরুসালেম অবরোধ সংস্থাটি একটি ধর্মীয় সংঘে এবং সামরিক সংঘে পরিণত হয় যার দায়িত্ব ছিল পবিত্র ভূমির প্রতিরক্ষা। মুসলিম শক্তি কর্তৃক পবিত্র ভূমি দখলের পর, নাইটরা রোডস থেকে তাদের কাজ পরিচালনা করত, যেখানে তাদের সার্বভৌমত্ব ছিল এবং আরও পরে মাল্টা থেকে, যেখানে তারা সিসিলির স্প্যানিশ ভাইসরয়ের অধীনে করদরাজ্য শাসন করত। হসপিটালাররা ১৭ শতকের এক সময় চারটি ক্যারিবীয় দ্বীপ দখল করেছিল যা তাদেরকে ১৬৬০ সনে ফ্র্যান্সিদের কাছে ছেড়ে দিতে হয়।-অনুবাদক।

৪২০. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৫, পৃ. ৪৫।

> তোমরা আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। সুতরাং অনারবদের ওপর আরবদের এবং আরবদের ওপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, গৌরবর্ণের ওপর কৃষ্ণবর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কৃষ্ণবর্ণের ওপর গৌরবর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে।[৪২১]

আব্রাহাম লিংকন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দাসশ্রেণির মুক্তির উদ্যোগ নেন। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল এবং তিনি দাসশ্রেণির উপকারভোগী সম্প্রদায় থেকে এমন তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন যে, তিনি এই উদ্যোগ থেকে সরে আসার উপক্রম করেছিলেন। তবে তিনি এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইন জারি করে দেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, তিনি নিজেও জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

সংগত কারণেই আমরা বলব, ইউরোপে এখনো আচার-আচরণে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণবাদ (রেসিজম) ও বর্ণবাদমূলক বৈষম্য রয়ে গেছে। বিশেষ করে ফ্রান্সে ও জার্মানিতে..। গুস্তাভ লি বোঁ জানিয়েছেন, আরবদের মধ্যে সাধারণ সমতার প্রেরণা সবসময়ই ছিল। তাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। ইউরোপে সমানাধিকার-নীতির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বটে, তবে তা কাজে নয়, শুধু কথায়। এই মানবাধিকার-নীতি ইসলামি শরিয়ার স্বভাব-প্রকৃতিতে পরিপূর্ণভাবে বদ্ধমূল রয়েছে। যেসব সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব পাশ্চাত্যে প্রাণঘাতী বিপ্লব-বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল এবং এখনো করছে সেসব শ্রেণির প্রতি মুসলিমদের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।[৪২২]

আর চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে ইসলাম বন্দিদের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছে তা নিম্নরূপ,

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

> তারপর চাইলে (বন্দিদেরকে) মুক্তি দেবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।[৪২৩]

---

[৪২১]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৫৩৬; তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৪৯২১।

[৪২২]. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৩৯১।

[৪২৩]. সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন,

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচার করো বা তাদের কল্যাণকামী হও।[৪২৪]

ইসলামের এমন নির্দেশনার চৌদ্দশ বছর পর জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ সালে বন্দিদের ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।[৪২৫] এসব নীতিমালায় বন্দিদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তারপরও ইসলাম বন্দিদের যে অধিকার দিয়েছে তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি। যুদ্ধ চলাকালে নাগরিকদের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে তা নিয়ে ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট জেনেভা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।[৪২৬] কারণ চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

৪২৪. তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; *আল-মুজামুস সগির*, হাদিস নং ৪০৯।

৪২৫. ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধগুলো থেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ, যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। যেমন : যুদ্ধবন্দিদের পানাহার দানের বিষয়টি কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আহারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে।' (সুরা দাহর : আয়াত ৮) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা বন্দিদের সঙ্গে কল্যাণকর আচরণ করো।' (তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৪০৯; *কানযুল উম্মাল*, হাদিস নং ১১০৩৬) এই হাদিস ব্যাপকার্থক, বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক উভয় কল্যাণের কথা বোঝানো হয়েছে।-অনুবাদক।

৪২৬. ১২ আগস্ট ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জেনেভা কনভেনশনের সঙ্গে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন যে প্রটোকল (প্রটোকল ১) বর্ধিত করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, বেসামরিক জনমণ্ডলী ও বেসামরিক বস্তুর প্রতি সম্মান ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংঘর্ষমান পক্ষগুলো বেসামরিক জনমণ্ডলী ও যোদ্ধাদের মধ্যে এবং বেসামরিক বস্তু ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চিত করবে এবং সে অনুযায়ী তাদের অপারেশন কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশে পরিচালনা করবে। (ধারা ৪৮) অথচ চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে ইসলাম কী নির্দেশ দিয়েছে দেখুন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গির্জায় ও আশ্রমে যারা রয়েছে তাদের হত্যা করো না।' (*মুসনাদে আহমদ*, ২৭২৮; আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ২১২)। এই হাদিস থেকে দুটি ব্যাপার বোঝা যায়,
১. ইসলাম এই গোষ্ঠীটিকে, যারা ধর্মশালায় উপাসনায় লিপ্ত, সম্মান দেখিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে দুরাচার করতে নিষেধ করেছে। যেসব যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে উপাসনালয়ে রয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।
২. যুদ্ধের সময় উপাসনালয় ও ধর্মশালাকে রক্ষা করতে হবে এবং সেগুলোর ওপর আক্রমণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে মদদ জোগায়।-অনুবাদক।

«اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»

তোমরা যুদ্ধ করো কিন্তু (যুদ্ধলব্ধ সম্পদে) খেয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, শত্রুদের বিকলাঙ্গ (হাত, পা, নাক, কান কর্তন) করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না...।[৪২৭]

আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছেন,

«لَا تَعْصُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَجْبُنُوا، ولا تهدموا بيعة، وَلَا تعزقُوا نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقُوا زَرْعًا، وَلَا تَجْشروا بَهِيمَةً، وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا، وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّذِي حَبَسُوهَا فَذَرُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ».

তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খেয়ানত করো না, ভীরুতা প্রদর্শন করো না, গির্জা ধ্বংস করো না, খেজুরগাছ খুঁড়ে তুলে ফেলো না, ফসল পুড়িয়ে দিয়ো না, চতুষ্পদ জন্তুদের আটকে রেখো না, ফলদার বৃক্ষ কর্তন করো না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করো না, ছোট শিশুদের হত্যা করো না। তোমরা এমন লোকদের দেখবে যারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত রয়েছে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি), তোমরা তাদের ছেড়ে দিয়ো এবং তাদের কাজ করতে দিয়ো।[৪২৮]

তালাকের প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম তালাকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যদিকে ইউরোপে তালাকের বৈধতা জ্ঞাপন করে নাগরিক আইন পাশ হয়েছে মাত্র গত শতাব্দীতে। ব্রিটেনে ১৯৬৯ সালে তালাক প্রসঙ্গে নাগরিক আইন জারি করা হয়। নারীদের সঙ্গে বৈষম্য-নিরসনে যে আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র[৪২৯] স্বাক্ষরিত হয়েছে তা ইসলামি শরিয়া দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং এ ব্যাপারটি সবার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। নারীর মালিকানা, উত্তরাধিকার, আইনগত

---

[৪২৭]. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তামিরুল ইমামিল উমারা, হাদিস নং ১৭৩১।

[৪২৮]. ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ২, পৃ. ৭৫।

[৪২৯]. Declaration on the Elimination of Discrimination against Women (DEDAW). ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয় Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ)।-অনুবাদক।

সক্ষমতা (legal capacity) ইত্যাদি অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামি ফিকহের গ্রন্থাবলিতে যা-কিছু রয়েছে তারই সারমর্ম ফুটে উঠেছে এই সনদের ধারাগুলোতে। আর এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর।

ইউরোপ আধুনিক যুগেও নারীর প্রতি চরম অবমাননা ও বৈষম্য প্রত্যক্ষ করেই উপর্যুক্ত ঘোষণাপত্র তৈরি করেছে। নারী অবমাননার অদ্ভুত সব ঘটনা রয়েছে এ আধুনিক যুগের। যেমন ১৭৯০ সালে গির্জা কর্তৃপক্ষ একজন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব অতিরিক্ত বোঝা মনে করে, ফলে ওই নারীকে মাত্র দুই শিলিংয়ে বিক্রি করে দেয়। উনিশ শতকের শুরুতেও (১৮০৫ সালে) স্বামীর অধিকার ছিল স্ত্রীকে নির্ধারিত মূল্যে (৬ সেন্ট) বিক্রি করে দেওয়ার, অর্থাৎ স্ত্রী ছিল স্বামীর মালিকানাধীন বস্তু। ১৯৩১ সালে একজন ইংরেজ তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয় এবং ১৮০৫ সালের পূর্ববর্তী আইনের আওতায় তাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একজন আইনজীবীও সে পেয়ে যায়। অবশেষে আদালত তাকে পনেরো মাসের কারাদণ্ড দেয়।

ইউরোপে নারী স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা-অধিকারও লাভ করে উনিশ শতকের শেষের দিকে, ১৮৮২ সালে। এমনকি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে পাগল ও শিশুদের মতো নারীদেরকেও অক্ষম ও অপরিণত বলে মনে করা হতো।[৪৩০]

---

৪৩০. আবদুল ওয়াদুদ শালবি, *ফি মাহকামাতিত তারিখ*, পৃ. ৬০ ও তার পরবর্তী।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

শিল্পকলায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

ইসলামি সভ্যতা কীভাবে ও কোন পথে ইউরোপে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে পৌছেছিল তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব পথ দিয়ে ইসলামি স্থাপত্যশিল্প ও অলংকরণশিল্পও ইউরোপে পৌছেছিল। প্রায়োগিক শিল্পকলার অধিকাংশ শৈলীই (ফর্ম) পৌছে গিয়েছিল পশ্চিমা দেশগুলোতে। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলামি শিল্পকলার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় চারুশিল্পের অনেক ক্ষেত্রে দর্শন ও রূপ উভয়টিই ইসলামি উৎস থেকে নেওয়া। কতিপয় বাস্তবতা এদিকেই ইঙ্গিত করে।[৪৩১]

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, কিছু পশ্চিমা শিল্পী তাদের কাজের সঙ্গে পরিপূরকরূপে বা আলংকারিক উপায়ে ইসলামি শিল্পরূপের সংমিশ্রণ ঘটালেও আরবি লিখনের হরফসমূহের প্রতিলিপির সময় শাব্দিক অর্থ বোঝেননি এবং মুসলিম শিল্পীর উদ্দিষ্ট তাৎপর্য অনুধাবন করেননি। তারা আরবি লিপি ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ নয়; নিরর্থক বাহ্যিক আলংকারিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার দিকটি বেছে নিয়েছেন।[৪৩২]

এই প্রসঙ্গে গুস্তাভ লি বোঁ আরবি লিপিকলার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, আরবি লিপিকলা আলংকারিক নান্দনিকতার এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মধ্যযুগে ও রেনেসাঁসের কালে আরবি লেখার যে খণ্ড-বিশেষই খ্রিষ্টান শিল্পবোদ্ধাদের হস্তগত হতো, সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় স্থাপনাসমূহে তার প্রতিলিপি স্থাপন করাতেন। এ কাজটি তারা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেগের সঙ্গে করতেন।

---

৪৩১. Dionisius A. Agius ও Richard Hitchcock, *The Arab Influence in Medieval Europe*, আরবি অনুবাদ : التأثير العربي في أوربا العصور الوسطى, পৃ. ৬৪

৪৩২. ইনাস হুসনি, *আসারুল ফন্নিল ইসলামিয়্যি আলাত তাসবিরি ফি আসরিন নাহদাতি*, পৃ. ১২০।

মশিয়েঁ ল্যাংব্রিয়েদ ও মশিয়েঁ লাভোইসসহ অনেকেই ইতালিতে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। মশিয়েঁ লাভোইস এও দেখেন যে, মিলান ক্যাথিড্রালের মালপত্র রাখার জায়গায় পিকারিন নকশায় নির্মিত একটি দরজা, দরজার চারপাশে পাথরের কার্নিশ, কার্নিশের উপর একটি আরবি শব্দ কয়েকবার উৎকীর্ণ। সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকার (St. Peter's Basilica) দ্বারসমূহের উপর অঙ্কিত যিশুর মাথার চারপাশে আরবি লিপি রয়েছে। পোপ চতুর্থ ইউজিনের (Pope Eugene IV) নির্দেশে এই গির্জা নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে সেন্ট পিটার এবং সেন্ট পলের যে মূর্তি ছিল তার আলখাল্লায় দীর্ঘ কুফি লিপি উৎকীর্ণ ছিল।

এরপর তিনি বলেন, আমার আফসোস হলো, এসব আরবি লেখাগুলোর লেখক তার অনুবাদ করেনি। সম্ভবত যিশুর মাথার চারপাশের লেখাটি ছিল, لا إله إلا الله محمد رسول الله।[৪৩৩]

আরব-ইসলামিক অলংকরণশিল্প বহু ইউরোপীয় শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈলীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। কারণ আরবি লিপিকলা কতিপয় ইউরোপীয় শিল্পীর দর্শন ও চিত্রকর্মে প্রভাব ফেলেছিল। আরব-ইসলামি শিল্পকলার অন্যতম সৃষ্টি আরবি লিপিকলা, তার প্রকরণ ও ফর্মে রয়েছে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং বহুবিধ আঙ্গিক ও শৈলীতে তার অলংকরণ সম্ভব। ইসলামি অলংকরণশিল্পের প্রভাব-বিস্তার শুরু হয় ক্রুসেডের সময় থেকে, যখন ইউরোপীয়রা আরবদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। এর শৈল্পিক ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি তাদের উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং তারা চরমভাবে আকর্ষিত হয়।

ফলে তারা তাদের শিল্পকর্মে এর ব্যবহার শুরু করে। তাদের ফলকচিত্রে আরবি লিপির ব্যবহারকারী প্রথম শিল্পীদের মধ্যে ফ্লোরেন্সীয় চিত্রকর জোত্তো দি বন্দোনে[৪৩৪] অন্যতম। ফ্লোরেন্সীয় চিত্রকর ফিলিপ্পো

---

৪৩৩. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৫৩১।

৪৩৪ জোত্তো দি বন্দোনে (Giotto di Bondone) জোত্তো নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রথম বড় শিল্পী হিসেবে পরিচিত। ১২৬৭ সালে ফ্লোরেন্সের কাছে কোল্লে দি ভেসপিনিয়ানোতে তাঁর জন্ম এবং ১৩৩৭ সালে ফ্লোরেন্সে মৃত্যু।-অনুবাদক

লিপ্পিও[৪৩৫] তার কর্মে আরবি লিপিকলার প্রয়োগ ঘটান। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে-সকল ব্যক্তির চিত্র অঙ্কন করেন তাদের পোশাকে দৃশ্যসজ্জা হিসেবে আরবি লিপি ব্যবহার করেন। আরেক ফ্লোরেন্সীয় চিত্রশিল্পী ভেরোচ্চিয়ো[৪৩৬] রাজাদের শ্রদ্ধার চিত্র চিত্রায়ণের ফলকে আরবি ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করে, যা ফ্লোরেনসে সংরক্ষিত রয়েছে।[৪৩৭]

মোটকথা, ইসলামি শিল্পকলা তার অনন্য নান্দনিক উপাদানগুলোর মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় শিল্পীদের শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্মে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এভাবে ইউরোপীয়দের মনোজাগতিক অনেক বিষয়কে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ আরবি লিপিকলা ও আরবি নকশা-প্রকরণ আরাবিস্কে পর্যাপ্ত ছন্দ ও গতি বিদ্যমান থাকায় ইউরোপীয় শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মের জন্য সমৃদ্ধ আঙ্গিক ও শৈলীর উৎস খুঁজে পেয়েছিল এবং নানা জুতসই প্রাণবন্ত ছন্দ ও বৈশিষ্ট্যের নিত্যনতুন আকৃতি ও চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছিল।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও ইতিহাসের বাস্তবতা তুলে ধরার পর আমরা বলতে পারি, এমন অনন্য ও শাশ্বত অবদানের জন্য অবশ্যই ইসলামি সভ্যতাকে যথার্থ ও শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দেওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। আর এসব চিরন্তন অর্জন ও প্রভাব আমাদের ইসলামি সভ্যতার, যা মানবতার দিগন্তে নিকষ কালো অন্ধকারের পর মানবতাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোকিত রেখেছিল।

---

[৪৩৫]. ফিলিপ্পো লিপ্পি (Filippo Lippi) ১৪০৬ সালে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশটিরও বেশি বিশ্ববিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করেছেন। ১৪৬৯ সালে স্পোলেতোতে তার মৃত্যু হয়।-অনুবাদক।

[৪৩৬]. ভেরোচ্চিয়ো (Andrea del Verrocchio) ১৪৩৫ সালে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। 'ম্যাডোনা উইথ সিটেড চাইল্ড', 'ব্যাপ্টিজম অফ ক্রিস্ট', 'তোবিয়াস অ্যান্ড দা অ্যাঞ্জেল' তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম। তিনি ১৪৮৮ সালে ভেনিসে মৃত্যুবরণ করেন।-অনুবাদক

[৪৩৭]. ইনাস হুসনি, *আসারুল ফন্নিল ইসলামিয়্যি আলাত তাসবিরি ফি আসরিন নাহদাতি*, পৃ. ১২৯
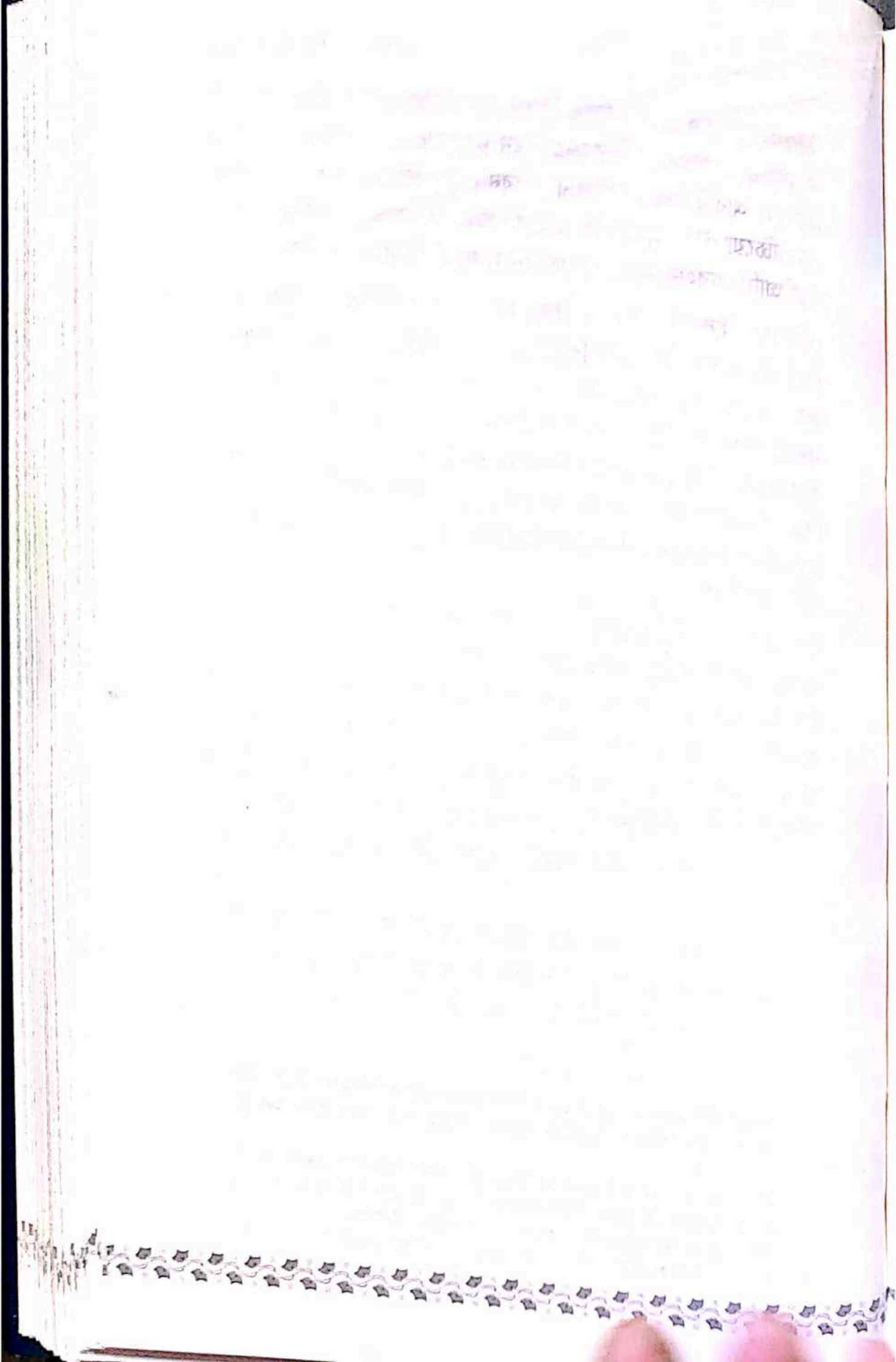
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম সভ্যতার মূল্যায়নে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

পশ্চিমারা (অত্যন্ত কৌশলে) ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য এবং মানবসভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে ইসলামি সভ্যতার অবদানকে হেয় করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তাই তাদের কেউ কেউ মনে করে মুসলিমরা শুধু পূর্ববর্তীদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নকলকারী। আবার কেউ কেউ শুধু গ্রিক ও রোমানদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে দাবি করে যে, ইসলামি সভ্যতা সামগ্রিক দিক থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করার উপযুক্ত নয়।

তারা মুসলিমদের কীর্তি ও ভূমিকা ভুলে গিয়ে গ্রিক ও রোমানদেরকেই কেবল ইউরোপীয়দের শিক্ষক মনে করে। তারা মনে করে এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের কোনো অবদান নেই। তাদের কেউ কেউ মুসলিমদের সভ্যতার অর্জন ও প্রভাবকেও হেয়জ্ঞান করতে চায়। তাদের যুক্তি এই যে, মুসলিমরা জ্ঞানের এমনকিছু শাখায় উৎকর্ষ সাধন করেছে যেগুলোতে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করতে তেমন চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া অন্যান্য শাখায় তারা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই না করেই অন্যদের থেকে সংগ্রহ ও নকল করেছে এবং সেসব ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের কোনো অবদান নেই।

আসল কথা এই যে, মুসলিমদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যারা বিদ্বেষপরায়ণ ও হিংসুটে এবং যারা মানবতার অগ্রযাত্রায় মুসলিমদের অবদান সম্বন্ধে অজ্ঞ তাদের অবস্থা এমনই। তাদের বিপরীতে প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিকদের একটি দলের অবস্থান আমাদের বক্তব্যকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। তারা মানবসভ্যতায় মুসলিমদের শেষ্ঠত্ব ও অনন্য অবদানকে নজর দিয়ে দেখেছেন, ফলে যা সত্য সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং

তা স্বীকার করে নিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্ব যার প্রাপ্য তারা তাকেই তা দিয়েছেন। তারা এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতা নিয়ে বহু গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র রচনা করেছেন। সেগুলো ঘোষণা করেছে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কীর্তির কথা, যা কখনো অস্বীকার করা যায় না। তাদের একজন বলেছেন, একটি জাতি সম্বন্ধে কথা বলার সময় এসেছে। যে জাতি পৃথিবীর নানা ঘটনাপ্রবাহে জোরালো ভূমিকা রেখেছিল এবং প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাশ্চাত্য তাদের কাছে ঋণী এবং মানবতাও তাদের কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী।[৪৩৮]

এ পরিচ্ছেদে আমরা এ সকল ন্যায়নিষ্ঠ প্রাচ্যবিদের স্বীকৃতির কিছু দিক তুলে ধরতে সচেষ্ট হব। মানবতার অগ্রযাত্রায় ও আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ইসলামি সভ্যতার মৌলিকতা, অসামান্য অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান অসংখ্য ও অগণিত। মুসলিমদের সর্বাধিক অবদানের বিষয়টিকে সামনে রেখে আমরা তিনটি অনুচ্ছেদে প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি তুলে ধরব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

৪৩৮. সিগরিড হুংকে, শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব, পৃ. ১১।

প্রথম অনুচ্ছেদ

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

ইউরোপীয় সুবিবেচকরা যেসব বিষয়ে তাদের ন্যায়পূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সম্ভবত বিজ্ঞানই এর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। এটি প্রধানত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে হয়েছে, এক. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিমদের অবদান। দুই. পশ্চিমা সুবিবেচকদের সেসব গোঁড়া ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কথা প্রত্যাখ্যান করা, যারা মুসলিমদের সবরকমের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে অস্বীকার করে। তা পরীক্ষামূলক জ্ঞানের যত বড় বিষয়ই হোক না কেন। যেমন, যন্ত্রপ্রকৌশল, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি।

নিচে সুবিবেচক ইউরোপীয়দের কিছু স্বীকৃতি তুলে ধরা হলো:

মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার যেকোনো চিত্র যেকোনো দিক থেকে লক্ষ করলে কেবল মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিভাত হয়।[৪৩৯]

সিগরিড হুংকে বলেন, আরবজাতি গ্রিকদের থেকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কাঁচামাল (তথা তথ্যসমূহকে) নিজেদের গবেষণার মাধ্যমে উন্নত করে তোলে। সেগুলোকে নতুন রূপ দান করে। প্রকৃতপক্ষে আরবজাতিই পরীক্ষাভিত্তিক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপদ্ধতি আবিষ্কার করে..। তারা যে শুধু গ্রিক সভ্যতাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে তাকে নতুন বিন্যাসে সাজিয়ে ইউরোপীয়দের উপহারই দিয়েছে তা নয়; বরং তারা রসায়ন, পদার্থ, গণিত, বীজগণিত, প্রাণিবিদ্যা, ত্রিকোণমিতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রে নিরীক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবক। এসব ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে অপরিসীম অবদান রাখে। তাদের অধিকাংশ কৃতিত্বই ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের গলায় পরানো হয়েছে।

---

[৪৩৯] রবার্ট ব্রিফল্ট, *The Making of Humanity*, আনওয়ার আল-জুনদি, *মুকাদ্দিমাতুল উলুম ওয়াল-মানাহিজ*, খ. ৪, পৃ. ৭১০ থেকে উদ্ধৃত।

আরবজাতি বিশ্ববাসীকে সবচেয়ে মূল্যবান যে উপহারে ভূষিত করেছে তা হলো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতি। যা পাশ্চাত্যের সামনে পদার্থবিদ্যার অনেক রহস্য উন্মোচনের পথ খুলে দেয় এবং পদার্থবিজ্ঞানের ওপর রাজত্ব করার সুযোগ এনে দেয়।[৪৪০]

হুংকে আরও বলেন, প্রকৃতপক্ষে রজার বেকন বা ব্যাকফন ভারলাম, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বা গ্যালিলিও—কেউই বিজ্ঞানে নিরীক্ষণপদ্ধতির আবিষ্কার করেননি। এই ক্ষেত্রে আরবরাই পথিকৃৎ। তা ছাড়া (ইউরোপীয়দের নিকট আল-হাযেন নামে পরিচিত) ইবনুল হাইসাম তার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যা-কিছুর বাস্তবরূপ দিয়েছেন তা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া কিছু নয়।[৪৪১]

সিগরিড হুংকে আরও বলেন, পাশ্চাত্যের সর্বাধিক প্রভাবশালী আরব শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন হাসান ইবনুল হাইসাম। পশ্চিমা বিশ্বে এই প্রতিভাবান আরব বিজ্ঞানীর প্রভাব ছিল অনেক। পদার্থবিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানে তার মতবাদ ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর আমাদের এই আধুনিক কাল পর্যন্ত কর্তৃত্ব করেছে। ইবনুল হাইসামের *আল-মানাযির* গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ইংরেজ বিজ্ঞানী রজার বেকন থেকে শুরু করে জার্মান বিজ্ঞানী ভিটেলো পর্যন্ত আলোকবিদ্যা-সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও বিদ্যার উদ্ভব ঘটে। ক্যামেরা অবস্কিউরা (Camera obscura), নলকূপ ও লেদমেশিনের আবিষ্কারক এবং প্রথম উড়োজাহাজ তৈরির দাবিদার ইতালীয় বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সরাসরি আরবদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ইবনুল হাইসামের কীর্তি ও অবদান তাকে অনেক চিন্তা জুগিয়েছিল। গ্যালিলিও যে-সকল সূত্র ও তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বড় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অজানা তারকারাজি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে কেপলার যখন সেসব সূত্র নিয়ে গবেষণা করেন, তার ওপর ইবনুল হাইসামের দীর্ঘ প্রভাব-ছায়া ছিল। বর্তমান সময়েও এই কঠিন গাণিতিক পদার্থবৈজ্ঞানিক সমস্যা বিদ্যমান। ইবনুল হাইসাম বীজগণিতে তার গভীর দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে চতুর্ঘাত সমীকরণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। আমরা আরও বলি,

---

৪৪০. সিগরিড হুংকে : *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪০১, ৪০২।

৪৪১. সিগরিড হুংকে : *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১৪৮, ১৪৯।

আতশি কাচের (Burning Mirror) মাধ্যমে আলো প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতন কোণ ও প্রতিফলিত কোণ সর্বদা সমান হয়—এটিকে এখনো ইবনুল হাইসামের দিকে সম্বন্ধ করে 'হাইসামি তত্ত্ব' বলা হয়।[৪৪২]

চিত্র নং-৩৬
ইবনুল হাইসামের গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ

ফ্লোরিয়ান কাজোরি তার *পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস* গ্রন্থে[৪৪৩] বলেন, আরবের মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রথম যথাযথভাবে পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন। এ পদ্ধতির আবিষ্কার তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায়। পদার্থবিদ্যায় এর গুরুত্ব ও উপকারিতা তারাই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাদের অগ্রভাগে রয়েছেন ইবনুল হাইসাম।[৪৪৪]

ম্যাক্স ফ্যান্টিগো বলেন, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ইসলামি আরব সভ্যতার কাছে ঋণী। গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যা কিছু অর্জন, তা স্পেনে

---

৪৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৪৪৩. Florian Cajori, *A History of Physics in its Elementary Branches* (১৯১৭)।-অনুবাদক

৪৪৪. আলি আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাহ ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩০৩।

আরব মুসলিমদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্যাণে ইসলামি জগতের সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মেলামেশা ও সংশ্লিষ্টতার ফসল।[৪৪৫]

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে ইসলামি আরব সভ্যতার উৎকর্ষের সূচনা হয় এবং তা পুবে পারস্য ও পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সনাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের এক বিরাট অংশের পুনরাবিষ্কার হয় এবং পদার্থ, রসায়ন ও গণিত ইত্যাদি শাখায় আবিষ্কারের নবধারা সৃষ্টি হয়। এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও আরবজাতি ইউরোপীয়দের শিক্ষকে পরিণত হয় এবং তারা এ মহাদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের রেনেসাঁসে অবদান রাখে।[৪৪৬]

জার্মান গবেষক ড. পিটার ই. পোরম্যান[৪৪৭] বলেন, বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় মুসলিমদের অবদান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অধিকন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদের অর্জন ও অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ ব্যাপারটিই আমাকে *Medieval Islamic Medicine* শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তিনি আরও বলেন, এই গ্রন্থ রচনার আরেকটি কারণ এই যে, আমি একজন জার্মান খ্রিষ্টান হিসেবে আমার সংস্কৃতির বিরাট অংশে ইসলামি সংস্কৃতির যে অবদান রয়েছে তার কাছে ঋণী। আমি ব্যাপারটি স্পষ্ট করার এবং জোরালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদিও কতিপয় লোক ইউরোপে ও বিশ্বে মুসলিমরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা মুছে ফেলতে তৎপর। আমি এবং আমার গবেষণা-সহকারী এমিলি স্যাভেজ স্মিথ[৪৪৮] মধ্যযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের অবদান তুলে আনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছি।

---

[৪৪৫]. ১৯৫৩ সালে ব্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইসলামি আরবসভ্যতা শীর্ষক সেমিনারে ম্যাক্স ফ্যান্টিগো এ কথা বলেন। দেখুন, শাওকি আবু খলিল, হানি মুবারক, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ১২৫।

[৪৪৬]. রবার্ট ব্রিফল্ট, *নাশআতুল ইনসানিয়্যা*, পৃ. ৮৪।

[৪৪৭] পিটার ই. পোরম্যান (Peter E. Pormann) ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রুপদি ও গ্রিক-অ্যারাবিক স্টাডিজের অধ্যাপক। তিনি ও এমিলি স্মিথ যৌথভাবে *Medieval Islamic Medicine* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। পিটা ই. পোরম্যানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *The Philosophical Works of Al-Kindi*।-অনুবাদক

[৪৪৮]. এমিলি স্যাভেজ স্মিথ (Emilie Savage-Smith) : ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট ক্রস কলেজের মহাফেজখানার তত্ত্বাবধায়ক।

তিনি আরও বলেন, ইসলামি হাসপাতালগুলো ইসলামি ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল। এসব হাসপাতালে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের চিকিৎসা দেওয়া হতো। ইহুদি, খ্রিষ্টান, নক্ষত্রপূজারি, জরথুস্ত্রীয় সবাই চিকিৎসাসেবা পেত। ইসলামি হাসপাতালগুলো সবাইকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করত। অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের এ এক অনন্য উদারতা।

মুসলিমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসায় অবদান রেখেছে। ড. পোরম্যান বলেন, মুসলিমরা বহু কঠিন ও জটিল রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জটিল হলো মনোরোগ মেলানকোলিয়া (melancholia, বিষাদ-বায়ু, বিমর্ষতা, দৌর্মনস্য)।[৪৪৯]

উইল ডুরান্ট বলেন, মুসলিমরাই রসায়নকে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপদান করেন। তারা এই ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই-বাছাইয়ে যত্নশীল হন। অথচ আমাদের জানামতে, এই ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান কিছু শিল্প-অভিজ্ঞতা ও অস্পষ্ট ধারণানির্ভর তত্ত্বে সীমাবদ্ধ ছিল।[৪৫০]

ডোনাল্ড আর. হিল বলেন, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রসায়নের প্রধান প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আল-রাযি অনন্য ব্যক্তিত্ব। এটা তার তুলনামূলক পদ্ধতির অনুসরণ এবং আবশ্যকীয় পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিরবচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকার ফলে সম্ভব হয়েছিল।[৪৫১]

এ বিষয়ে ডোনাল্ড আর. হিলের আরও একটি স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ইউরোপীয়দের বহু আগে মুসলিমরা আপেক্ষিক ভরের রেখাচিত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। অথচ ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। রবার্ট বয়েল (মৃ. ১৬৯১ খ্রি.)-এর সময়ে এসে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। তিনি দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে পারদের আপেক্ষিক ভর নির্ধারণ করেন। পদ্ধতি দুটি থেকে প্রাপ্ত ভরের মান ছিল ১৩.৭৬ এবং ১৩.৩৫৭; উভয়টি খাযিনির নির্ধারিত মানের চেয়ে

---

৪৪৯. *আল-আখবারুল মিসরিয়্যা* (সংবাদপত্র), ১৩ এপ্রিল, ২০০৭।

৪৫০. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৩৫৬।

৪৫১. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুমু ওয়াল-হানদাসাতু ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, অনুবাদ : আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০২।

তুলনামূলক কম নিখুঁত। খাযিনির অধিকাংশ পরীক্ষাফলই ছিল চূড়ান্ত নিখুঁত।[৪৫২]

গুস্তাভ লি বোঁ বলেন, জাবির ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থাবলি থেকে একটি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ রচিত হয়। তাতে তৎকালীন আরব মনীষীরা রসায়নশাস্ত্রে যে অবদান রেখেছিলেন তার নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া এসব বিশ্বকোষে রসায়নের অনেক যৌগিক মৌলের বর্ণনা রয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোথাও উল্লেখিত হয়নি। যেমন নাইট্রিক এসিড। জাবির ইবনে হাইয়ানকে বাদ দিয়ে আমরা রসায়নশাস্ত্রের কল্পনাও করতে পারি না।[৪৫৩]

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফ্লোরিয়ান কাজোরি বলেন, বীজগণিতে আরব এবং মুসলিমদের অবদানের প্রতি লক্ষ করলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। বীজগণিতের ওপর লেখা খাওয়ারিজমির গ্রন্থটি[৪৫৪] ছিল এক জ্ঞান-প্রস্রবণ, যেখান থেকে পরবর্তী মুসলিম ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা সমানভাবে আহরণ করেছেন, তাদের গবেষণাকর্মে এই গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল থেকেছেন এবং এখান থেকে বহু তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। অনেক মৌলিক নীতিমালা তারা এ বই থেকেই সংগ্রহ করেছেন। তাই এ কথা বলা যথার্থ যে, খাওয়ারিজমিই বীজগণিতশাস্ত্রকে তার সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪৫৫]

জাঁ ফ্রিনেট বলেন, আমরা যখন এর নিপুণতা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলাম, দেখলাম যে গণিতশাস্ত্রে মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক বিকাশের মূলনীতির সূচনা হয়েছে কুরআনুল কারিম থেকে। মিরাস বণ্টন-সম্পর্কিত যে জটিল বিধান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাতে এসব মূলনীতি রয়েছে। খাওয়ারিজমিকে প্রথম মুসলিম গণিতশাস্ত্রবিদ মনে করা হয়। সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ও মানদণ্ডের জন্য আরবিতে প্রণালিবদ্ধ পদ্ধতি প্রণয়নে তিনি যে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিরেন তার জন্য আমরা তার কাছে ঋণী। যেমন আমরা স্প্যানিশ শব্দ 'গাওয়ারিজমি'-র জন্যও তার কাছে ঋণী। যার অর্থ সংখ্যায়ন

---

৪৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
৪৫৩. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৪৭৫।
৪৫৪. كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة (*The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing*)।
৪৫৫. আলি আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*।

(সংখ্যা, সংখ্যার স্থানীয় মান ও শূন্য)। বীজগণিত ছিল খাওয়ারিজমির দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র। এটি গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা। এটি তখনও পদ্ধতিমূলক গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল না।[৪৫৬]
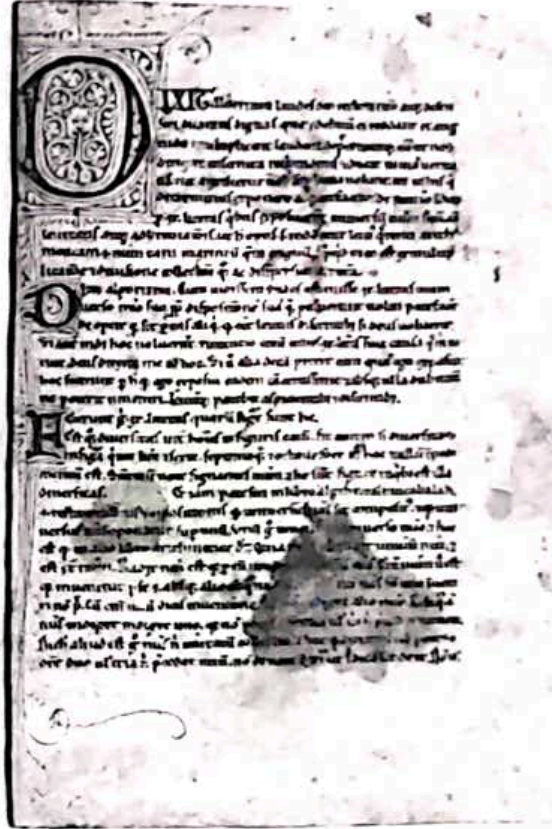
চিত্র নং-৩৭
খাওয়ারিজমির গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ

ড্রেপার বলেন, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ আরবদের[৪৫৭] স্বভাবগত বিষয়। জ্যামিতি ও গণিতকে তারা চিন্তা ও অনুমানের উপায় মনে করত। প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যন্ত্রপ্রকৌশল, তরল পদার্থ ও আলোকবিদ্যা সম্পর্কে তারা যা লিখেছেন তাতে কেবল তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেননি; বরং পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন। এটা তাদের জন্য রসায়নশাস্ত্রকে কাজে লাগানোর পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে।

---

৪৫৬. জাঁ ফ্রিনেট, যোসেফ শাখ্ত (Joseph Franz Schacht) ও ক্লিফোর্ড বসওয়র্থ (Clifford Edmund Bosworth) কর্তৃক সম্পাদিত The Legacy of Islam, আরবি অনুবাদ : تراث الاسلام, ৩য় অংশ, পৃ. ১৬৮।

৪৫৭. লক্ষণীয় বিষয় হলো, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ আরব বলে মুসলিম উদ্দেশ্য নেন। এখানেও তা-ই ঘটেছে।

পরিশোধন ও বাষ্পীভবনের সরঞ্জাম এবং ভারী বস্তু উত্তোলন-যন্ত্র আবিষ্কারে তাদের পথপ্রদর্শন করেছে...। এর মাধ্যমে তাদের সামনে জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতির উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধনের বিশাল দুয়ার উন্মোচিত হয়।[৪৫৮]

ডেভিড ইউজিন স্মিথ তার *গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস*[৪৫৯] গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, ইউরোপীয়রা দাবি করে থাকে যে দোলক-নীতির আবিষ্কারক হলেন গ্যালিলিও। অথচ ইবনে ইউনুস[৪৬০] তার আগেই এই নীতি পর্যবেক্ষণ করেন। কারণ, আরবের জ্যোতির্বিদগণ তারকা পর্যবেক্ষণকালে সময়ের হিসাব রাখার জন্য দোলক ব্যবহার করতেন।

জর্জ সার্টন তার *Introduction to the History of Science* গ্রন্থে সম্পূরকরূপে আরও বলেন, ইবনে ইউনুস সন্দেহাতীতভাবে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের অন্যতম প্রতিভাবান মনীষী। তিনি মিশরের একজন মহান জ্যোতির্বিদ। তিনিই দোলকের আবিষ্কারক।[৪৬১]

ইয়োহান গ্যোটে বলেন, আরবরা আমাদেরকে গ্রন্থ রচনা শিখিয়েছে। বারুদের ব্যবহার এবং কম্পাসও আবিষ্কার করেছে। আমাদের ভাবা উচিত, আরব সভ্যতার যেসব কীর্তি আমাদের হাতে পৌঁছেছে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলে আমাদের রেনেসাঁস সম্ভব হতো না।[৪৬২]

শার্ল সেইনোবোস বলেন, আরবরা প্রাচ্যের প্রাচীন বিশ্ব (গ্রিস, পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীন) থেকে প্রাপ্ত বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার একত্র করেছে, সমন্বয় করেছে এবং তারাই তা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। অনেক আরবি শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করেছে। এটা সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাদের থেকে বিজ্ঞানের অনেককিছু গ্রহণ করেছি। আরবদের

---

৪৫৮. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. [illegible]।

৪৫৯. David Eugene Smith, History of Mathematics.

৪৬০. ইবনে ইউনুস : আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস (মৃ. [illegible] হি./১০০৯ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী। উল্লেখযোগ্য রচনা : আল-যিজুল হাকিমি, যা যিজ ইবনে ইউনুস নামে পরিচিত। মিশরের ফুসতাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন কায়রোতে। [illegible] শতাব্দীতে যিনি সময় পরিমাপের জন্য সর্বপ্রথম দোলক ব্যবহার করেছিলেন তিনি হলেন ইবনে ইউনুস। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খ. ৩, পৃ. [illegible]।

৪৬১. আলী আবদুল্লাহ দাফফা, [illegible], পৃ. [illegible]।

৪৬২. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. [illegible]।

কল্যাণেই বর্বর পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতার কাতারে প্রবেশ করতে পেরেছে। আমাদের চিন্তা এবং শিল্প ছিল সেকেলে। তখন জীবনকে সহজ ও স্বস্তিকর করার সব আবিষ্কার আরবদের থেকে আমাদের কাছে এসে হাজির হয়। ইউরোপীয়রা আরবদের থেকে অনেক শিল্পকৌশল শিখে নিয়েছিল; এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বস্ত্রশিল্প। ইতালির পিসার অধিবাসীরা আলজেরিয়ার বেজায়া শহরে যাত্রাবিরতি করত। সেখান থেকে তারা মোমবাতি বানানোর বিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। পরে এই বিদ্যা তারা নিজ দেশে ও ইউরোপে সরবরাহ করে।[৪৬৩]

রেসন বলেন, আবাদি এলাকায় আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমান দ্রুততায় তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটে। তা আমাদের আরব সভ্যতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই উন্নত সভ্যতা মধ্যযুগে ছিল বাইজান্টাইনীয় এবং পারস্যসভ্যতার মিশ্রিতরূপ। সভ্যতার এ ধরনের মিশ্রণ পরিপূর্ণতা পায় দুটি কারণে : **এক.** আরবদের ব্যবসাপ্রীতি; **দুই.** নগরায়ণের প্রতি তাদের অনুরাগ। তীক্ষ্ম মেধা এবং প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সহজাত প্রেরণা তাদেরকে পদার্থবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সকল জাতির ওপর আরবদের অশেষ অবদান রয়েছে। বিশেষ করে আরবি সংখ্যা, বীজগণিত উদ্ভাবন এবং জ্যামিতির সুষম রূপদানের ক্ষেত্রে।[৪৬৪]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, সত্য কথা এই যে, বর্তমান সময়ে প্রচলিত অনেক ওষুধের নাম, ওষুধের উপাদান এবং ওষুধ প্রস্তুতকরণপ্রণালি আরবদের সৃষ্টি; বরং বাস্তবতা এই যে, আধুনিক রাসায়নিক পরিবর্তন ও সংশোধন (Chemical modifications) ছাড়াও আধুনিক ওষুধবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন আরবরা।[৪৬৫]

---

৪৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৩-২৩৪।
৪৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।
৪৬৫. *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*, খ. ১৮, পৃ. ৪৬, ১১তম সংস্করণ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

নৈতিকতা ধর্ম থেকেই উৎসারিত। যে ধর্ম নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে, নৈতিক গুণাবলিতে ভূষিত হওয়ার আহ্বান জানায় এবং চারিত্রিক কদর্যতাকে ঘৃণিত করে তোলে, এমন ধর্মের বন্ধন না থাকলে নীতিমান হওয়া যায় না। ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রাচ্যবিদদের যে প্রশংসা ও স্বীকৃতি রয়েছে তার অধিকাংশ মূলত সামগ্রিক অর্থে ইসলামধর্মেরই প্রাপ্য।

পাশ্চাত্যের নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সেরকম কিছু স্বীকৃতি ও প্রশংসাবাণী এখানে উল্লেখ করা হলো :

গ্লেন লিউনার্দ বলেন, ইসলামি বিধিবিধান মেনে চললে ইউরোপের অবস্থা আজ এমন জটিল সমীকরণ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকত এবং চরম অকৃতজ্ঞতা ও হেয়জ্ঞান করার নীচু মানসিকতার পরিবর্তে চিরকৃতজ্ঞতার পরিবেশ তৈরি হতো। অথচ আজ পর্যন্ত ইউরোপ সত্যিকার অর্থে ও নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে মহান ইসলামধর্মের স্বীকৃতি দেয়নি, অথচ তারা ইসলামি শিক্ষা ও আরব সভ্যতার জন্য এই ধর্মের কাছে ঋণী। তবে তারা নিতান্ত অনাগ্রহ ও শৈথিল্যের সঙ্গে এই ধর্মের ঋণ স্বীকার করেছে শুধু সেই অন্ধকার যুগের জন্য যখন সমগ্র ইউরোপ হাবুডুবু খাচ্ছিল বর্বরতা ও অজ্ঞতার মহাসাগরে। ইসলামি সভ্যতায় আরবরা জ্ঞান ও নাগরিক সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছেছে এবং ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থাকে জীবন দিয়েছে, তাকে অধঃপতনের কবল থেকে রক্ষা করেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির শীর্ষ অবস্থানে থেকে আমাদের আত্মোপলব্ধি এই যে, যদি ইসলামি সংস্কৃতি ও আরব সভ্যতা এবং নাগরিক সমস্যা সমাধানে তাদের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উত্তম ব্যবস্থাপনা না থাকত, তাহলে আজ পর্যন্ত ইউরোপ মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত।[৪৬৬]

---

[৪৬৬]. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, পৃ. ৮২।

ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ. জি ওয়েলস বলেন, যে ধর্ম নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, তাকে দেয়ালে ছুড়ে মারো। আমি যে সত্যধর্মকে নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাল মিলিয়ে চলতে দেখেছি তা হচ্ছে ইসলামধর্ম।

কেউ প্রমাণ চাইলে কুরআন পড়ুক এবং কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের ধারা, সামাজিক রীতিনীতি লক্ষ করুক। সর্বোপরি এটা ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি সর্বজ্ঞানের এক কিতাব। কেউ যদি আমার কাছে সংক্ষেপে ইসলামের সংজ্ঞা চায়, তাহলে এক কথায় বলব, 'ইসলাম মানেই হলো সভ্যতা'।[৪৬৭]

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, রজার বেকন[৪৬৮] ছিলেন ইসলামি জ্ঞান ও রীতি-পদ্ধতিকে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন দূত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলতে কখনো দ্বিধা করেননি যে, আরবি ভাষা ও আরবদের জ্ঞানবিজ্ঞান হলো সত্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ..।[৪৬৯]

ইসলামি সভ্যতা স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের শিক্ষা থেকেই উৎসারিত। আর ইসলামি সভ্যতা যেভাবে ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং একত্ববাদের বিচারে থেকে মানবেতিহাসের অন্য সকল সভ্যতা থেকে ভিন্ন, তেমনই সহিষ্ণুতা, মানবিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দিক থেকেও এই সভ্যতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।[৪৭০]

আর গুস্তাভ লি বোঁ বলেন, নিঃসন্দেহে আরবীয় মুসলিম সভ্যতাই ইউরোপের বর্বর জাতিগুলোকে মানবিক জগতে প্রবেশ করিয়েছে। নিশ্চয় আরবরা আমাদের শিক্ষক। ...আর এটা সত্য যে পাশ্চাত্যের

---

৪৬৭. আবদুল মুনয়িম নিমর, *আল-ইসলাম ওয়াল-মাবাদিউল মুসতাওরিদা*, পৃ. ৮৪।

৪৬৮. রজার বেকন (১২১৪-১২৯২ খ্রি.) মধ্যযুগের ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে প্রথম পথিকৃৎ। রজার বেকন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি নানাভাবে নিগ্রহের শিকার হন। তাকে ধর্মদ্রোহীও ঘোষণা করে তারা। তিনি গ্রিক দার্শনিক ও আরব চিন্তাবিদদের চিন্তারাজিকে অধ্যয়ন করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধর্মযাজকের বাণীর চেয়ে গ্রিক ও আরব দার্শনিকদের যুক্তি বেশি মূল্যবান ঘোষণা করায় যাজক সম্প্রদায় তার উপর ভীষণ ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তাকে দশ বছরেরও বেশি সময় নজরবন্দি করে রাখা হয়। সরদার ফজলুল করিম কৃত *দর্শনকোষ* অবলম্বনে, পৃ. ৭৪-৭৫।-অনুবাদক

৪৬৯. রবার্ট ব্রিফল্ট, *বিনাউল ইনসানিয়্যাহ*, আনওয়ার জুনদি রচিত *মুকাদ্দিমাতুল উলুম ওয়াল-মানাহিজ*, খ. ৪, পৃ. ৭১০ থেকে উদ্ধৃত।

৪৭০. আবদুল মুতি আদ-দাল্লাতি, *রাবিহতু মুহাম্মাদান ওয়া লাম আখসার আল-মাসিহ*, পৃ. ১২৮।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবদের রচনাবলি ছাড়া জ্ঞানচর্চার জন্য অন্য কোনো উৎস খুঁজে পায়নি। সুতরাং বলা যায় আরবরাই ইউরোপকে সুসভ্য করেছে। সেটা বৈষয়িক দিক থেকে যেমন, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিক ও নীতি-নৈতিকতার দিক থেকেও। বিশ্ব-ইতিহাস আরবদের ন্যায় এমন স্বর্ণপ্রসবা জাতি আর প্রত্যক্ষ করেনি।... সভ্যতার ক্ষেত্রে ইউরোপ আরবদের কাছে ঋণী।... প্রথম আরবরাই বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়েছে যে, কীভাবে ধর্মের ওপর অবিচলতা এবং চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।... তারাই খ্রিষ্টান জাতিকে শিক্ষিত করে তুলেছে, বরং চাইলে বলতে পারো যে, তারাই খ্রিষ্টানজাতিকে মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণ সহিষ্ণুতা ও উদারতা শিক্ষাদানের প্রয়াস পেয়েছে।... ইসলামের শুরুর যুগে মুসলিমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলি বিশ্বের অন্য সকল জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল।[৪৭১]

এন্ড্রু ডিকসন হোয়াইট[৪৭২] বলেন, হযরত উমরের যুগ ও তার পরবর্তী সময় থেকে মুসলিমবিশ্বে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে অত্যন্ত মমতাপূর্ণ ও মানবিক আচরণ করা হয়। কিন্তু গোটা খ্রিষ্টীয় জগতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় আট শতাব্দীব্যাপী এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। সে সময়ে ইউরোপে মানসিক রোগীদের শয়তানের আছরগ্রস্ত মনে করা হতো। যে কারণে তাদের সঙ্গে চরম নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ করা হতো।

তিনি আরও বলেন, পাদরি জন হার্ড অষ্টাদশ শতকে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পাদরি ও পরিব্রাজকেরা সে সময়ে এবং তারও পূর্বে পর্যবেক্ষণ করেন যে, মুসলিমগণ মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য অত্যন্ত মানবিকতাপূর্ণ উপায় অবলম্বন করেন। এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত তারা খ্রিষ্টীয় ইউরোপ-ভূমিতে দেখতে পাননি। সত্য এটাই যে মানসিক রোগীদের সঙ্গে দয়ার্দ্র ও মানবিকতাপূর্ণ আচরণের ক্ষেত্রে মুসলিমরা বহু পূর্বেই সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, অথচ ইউরোপে এর সূচনা ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে।[৪৭৩]

---

[৪৭১]. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ২৬, ২৭৬, ৪৩০, ৫৬৬।

[৪৭২]. এন্ড্রু ডিকসন হোয়াইট (Andrew Dickson White 1832-1918) : আমেরিকান সিনেটর ও লেখক। তাকে নিউইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[৪৭৩]. দেখুন, A. D. White, *A history of the warfare of science with theology in Christendom*, খ. ১১, পৃ. ১২৩।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু[৪৭৪] তার বিখ্যাত গ্রন্থ *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়াতে* বলেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মুসলিম বিজেতাদের আগমন ও ইসলামের প্রবেশ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয় সমাজে যে ব্যাধি ও পচন ছড়িয়ে পড়েছিল, ইসলাম তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যে বর্ণভেদ, অচ্ছুত প্রথা ও বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ইসলামই তা চিহ্নিত করেছে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিমজাতি লালন করে ভারতীয়দের জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাব সেসব দুর্ভাগা জনগোষ্ঠীর ওপরই ছিল সর্বাধিক, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যাদের সাম্য ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।[৪৭৫]

প্রফেসর হকিং বলেন, জ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোর প্রতি অনির্বাণ তৃষ্ণা ছিল আরবদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে প্রবলভাবে শাণিত করে তোলে। তারা ছিল স্বাধীনচেতা। সকল ধরনের স্থবিরতা ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে সবসময় তারা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম আদর্শের অভিলাষী ছিল।... অচিরেই আমরা দেখতে পাব, যে অগ্নিময় ঝাঁপটা ও আত্মবিস্মৃতির ঘোর আরবদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা কেটে গেলে, জ্ঞানবিপ্লব ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের সুপ্ত উপাদানসমূহের উদ্‌গিরণ ঘটবে। ফলে আরবরা পুনরায় বিশ্বের বুকে তাদের মর্যাদাপূর্ণ আসন দখল করতে পারবে। প্রথম রেনেসাঁসের সময় আরবদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাদের রেখে যাওয়া অবিস্মরণীয় সব কীর্তি ও জ্ঞানভান্ডারই আমার কথার প্রমাণ।[৪৭৬]

---

৪৭৪. জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

৪৭৫. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৭ থেকে উদ্ধৃত।

৪৭৬. *মাবাদিউস সিয়াসাতিল আলামিয়্যা*, পৃ. ২৫; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাউরুল ফিকরিল আলামিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৯ থেকে উদ্ধৃত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে চিন্তা হলো এই দ্বীনের প্রতি ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। ইসলামি সভ্যতা যেসব স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এটি তার অন্যতম। আল্লাহ তাআলার চিন্তাযোগ্য কিতাবের মূল বক্তব্য এটিই, এটিই গোটা সৃষ্টিজগতের মূলকথা। পঠিত কিতাব (আল-কুরআনুল কারিম) তার বহু আয়াতে এই কিতাবে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছে...। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতকিছু সত্ত্বেও এমন লোকদেরও আবির্ভাব ঘটেছে যারা চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মের প্রতি ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে চায়!

তাদের অন্যায় দাবির খণ্ডনে স্বয়ং পাশ্চাত্যের কিছু ন্যায়বান মনীষীর সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি জেনে নেওয়া যাক :

এতেইন্নে দিনেত (Etienne Dinet)[৪৭৭] বলেন, ইউরোপে চিন্তার স্বাধীনতা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে প্রধান কৃতিত্ব যার তিনি হলেন আন্দালুসীয় মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ (১১২০-১১৯৮ খ্রি.)। অবশ্য আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও নাস্তিক্যবাদের মধ্যে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ইবনে রুশদ অ্যারিস্টটলের চিন্তা ও দর্শনের যে ব্যাখ্যা হাজির করেন তার প্রতি মধ্যযুগের ইউরোপের স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তার এসব ব্যাখ্যা শক্তিশালী ইসলামি ভাবপ্রবাহে ছিল। ইবনে রুশদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণের ফলে ইউরোপে যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাই পরবর্তী সময়ে তাদের ধর্মীয় সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করার পাশাপাশি আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তাধারার উৎস ছিল। আমরা সত্যিকার অর্থে এভাবেই বিচারবিবেচনা করতে পারি।[৪৭৮]

---

৪৭৭. এতেইন্নে দিনেত (Etienne Dinet 1861-1929) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ, চিত্রকর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক।

৪৭৮. এতেইন্নে দিনেত, *মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ*, পৃ. ৩৪৩।

সিগরিড হুংকে বলেন, আরবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ এবং তাদের হাতে নানান জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিমার্জন, বিন্যাস ও নিরীক্ষণ গোটা পাশ্চাত্যে জোয়ার সৃষ্টি করে...। বস্তুত সে সময়কার ইউরোপীয় জ্ঞানী মহলে এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন না যিনি আরবীয় জ্ঞানভাণ্ডারে হাত বাড়াননি। সেখান থেকে তারা যা খুশি গ্রহণ করেছেন এবং সুমিষ্ট পানির ঝরনা থেকে পিপাসার্ত যেভাবে জলপান করে সেভাবে জ্ঞান আহরণ করেছেন।... তৎকালীন ইউরোপে রচিত এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না যার পৃষ্ঠাসমূহে আরবীয় ঝরনাধারার প্রবল প্রবাহ পরিলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয় প্রতিটি গ্রন্থই ছিল আরব জ্ঞানপ্রাচুর্যের মুখাভিনয়। সেগুলোতে আরবীয় প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। শুধু আরবি শব্দ (ইউরোপীয় ভাষায়) অনুবাদের ছাপই নয়, বরং বিষয়বস্তু ও চেতনা প্রকাশেও সেই প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়।[৪৭৯]

তিনি আরও বলেন, শূন্য থেকে শুরু করে সভ্যতার ক্ষেত্রে আরবরা যে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে মানবেতিহাসের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে তা উল্লেখযোগ্য বিষয়। জ্ঞানের ময়দানে ধারাবাহিক বিজয় তাদের সকল সভ্যতার নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে; অন্যান্য সভ্যতার বিবেচনায় তা তুলনাহীন। আরবদের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি আমাদেরকে অবাক করে দেয় যে ইতিহাসে তা কীভাবে ঘটল![৪৮০]

লুইস সিডিও বলেন, ইউরোপ যে ধরনের বিবেকহীনতা, চিন্তাগত দৈন্য, আত্মিক কলুষতা, জ্ঞান ও জ্ঞানীর সঙ্গে নির্দয় আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে ইসলামি সভ্যতা তা প্রত্যক্ষ করেনি। ইতিহাস এটাও সাক্ষ্য দেয় যে ইউরোপে বত্রিশ হাজার জ্ঞানীগুণীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এতে কোনো মতভেদ নেই যে, চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামি ইতিহাস এরকম জঘন্য অত্যাচারের সম্মুখীন হয়নি। বরং সে অন্ধকার যুগে একমাত্র মুসলিমরাই জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা করত। এমনটি কখনো ঘটেনি যে কোনো ধর্ম-রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণ করেছে, আর আকিদা-বিশ্বাসে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দিয়ে সহায়তা করেছে, অথচ

---

৭৯. সিগরিড হুংকে, শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব, পৃ. ৩০৫, ৩০৬।
৮০. সিগরিড হুংকে, শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব, পৃ. ৩৫৪।

ইসলামি সভ্যতা সর্বদাই জনগণকে সব রকমের স্বাধীনতা প্রদান করেছে।[৪৮১]

ফরাসি প্রাচ্যবিদ ব্যারন কারা ডি ভো[৪৮২] বলেন, আরবরা বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন এবং জ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণায় সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছেছে এমন সময়ে যখন খ্রিষ্টজগৎ বর্বরতার করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করছে (যা পনেরো শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে)। আরবরা নবম এবং দশম শতাব্দীতে তাদের উৎকর্ষ ও উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে প্রত্যেক বিজ্ঞানমনস্ক পশ্চিমা ব্যক্তির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে মারাকেশ এবং মধ্যপ্রাচ্য। আর এ সময়ে ইউরোপীয়রা আরবদের জ্ঞানভান্ডার অনুবাদ করতে শুরু করে। যেভাবে আরবরা গ্রিকদের জ্ঞানভান্ডার অনুবাদ করেছিল।[৪৮৩]

মরিস বুকাইলি তার *The Bible, The Qur'an and Science* গ্রন্থে বলেন, আমরা জানি, ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম এবং বিজ্ঞান জমজ দুই সন্তানের মতো। বিজ্ঞানকে পরিমার্জন করা শুরু থেকেই ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিধি প্রয়োগের ফলে ইসলামি সভ্যতার যুগে আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব রেনেসাঁসের পূর্ব থেকেই তার দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।[৪৮৪]

হিন্দুস্তানি জাতিসত্তা এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলের উপর ইসলামি একত্ববাদী বিশ্বাসের ভূমিকার কথা আলোচনা করতে গিয়ে মিশরে নিযুক্ত ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত কে. এম. পানিক্কর (১৮৯৫-১৯৬৩ খ্রি.) বলেন, এটা সুস্পষ্ট যে, এই (ইসলামি) যুগে হিন্দুধর্মের ওপর ইসলামের গভীর প্রভাব ছিল। হিন্দুদের মধ্যে যে আল্লাহর ইবাদতের (ঈশ্বরের উপাসনার) চিন্তা তা ইসলামের ভাবধারাপ্রসূত। এই যুগে চিন্তা ও ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে

---

৪৮১. হাসসান শামসি পাশা, *হাকায়া কানু ইয়াওমা কুন্না*, পৃ. ৮৩।

৪৮২. ব্যারন বার্নার্ড কারা ডি ভো (Baron Bernard Carra De Vaux) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। ফরাসি ভাষাতেই লিখেছেন। তার আগ্রহের বিষয় ছিল আরবের জ্ঞানভান্ডার। মুসলিম বিজ্ঞানীদের কয়েকটি রচনা তিনি পুনর্নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা করেছেন।

৪৮৩. বার্নার্ড কারা ডি ভো : টমাস আর্নল্ড সম্পাদিত *তুরাসুল ইসলাম* গ্রন্থে আল-ফালাক ওয়ার-রিয়াদিয়্যাত শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ. ৫৬৪।

৪৮৪. ওয়াহিদুদ্দিন খান, *আল-ইসলাম ইয়াতাহাদ্দা*, পৃ. ১৪।

ইবাদতের উপযুক্ত উপাস্য একজনই, কেবল তারই কাছে মুক্তি ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করা যায়। ইসলামি যুগে ভারতে যেসব ধর্মান্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোর ওপর ইসলামি চিন্তাধারার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। যেমন ভক্তি আন্দোলন এবং কবীর পরমেশ্বর আন্দোলন।[৪৮৫]

ফরাসি ঐতিহাসিক লুইস সিডিও ইসলামি সভ্যতার মৌলিক দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করেন এবং অবশেষে এ কথা বলে তার বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন, আধুনিক ইউরোপের ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট।[৪৮৬]

যাই হোক, ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে এসব বক্তব্য ন্যায়নিষ্ঠ ও ইনসাফপরায়ণ পশ্চিমা ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের।

ব্রিটেনের প্রিন্স চার্লসের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে এ অধ্যায়ের ইতি টানছি[৪৮৭]। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রে (Oxford Centre for Islamic Studies) 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শীর্ষক এই বক্তব্য দিয়েছিলেন। বক্তব্যটির চুম্বকাংশ নিচে দেওয়া হলো :

> ইসলামের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে পাশ্চাত্যে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামি বিশ্বের কাছে যে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কারণে ঋণী সে সম্পর্কেও আমাদের মধ্যে অপরিমাণ অজ্ঞতা রয়েছে। মুসলিম শাসনামলে স্পেন শুধু রোমান ও গ্রিক সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐশ্বর্যকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণই করেনি, বরং সেই সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটিয়েছে ব্যাপকভাবে। সে সময় স্পেন তার নিজের পক্ষ থেকে মানব-গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, আলজেব্রা—শব্দটি মূলত আরবি—আইনবিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসা, ঔষধবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, কৃষি ও স্থাপত্যশিল্পে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি রয়েছে।

---

৪৮৫. A Survey of Indian History, পৃ. ১৬৩।
৪৮৬. লুইস সিডিও, তারিখুল আরাবিল আম, পৃ. ৩৬৮।
৪৮৭. [illegible]

দশম শতকে কর্ডোভা জ্ঞানবিজ্ঞানে ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। এখন আধুনিক ইউরোপ যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ববোধ করে সেগুলো মূলত স্পেনে মুসলিম শাসনামলের গৌরব ও অবদানের স্মারকচিহ্ন। কূটনীতি, স্বাধীন ব্যবসানীতি, উন্মুক্ত সীমানা, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা-পদ্ধতি, নৃবিজ্ঞান, শিষ্টাচার, পোশাকশিল্পের বিকাশ, বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা (Alternative medicine) এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা–এ সবকিছু সেই সমৃদ্ধ নগরী (কর্ডোভা) থেকেই প্রাপ্ত।

এগুলোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, ইসলাম আমাদের পৃথিবীতে সমঝোতার সঙ্গে জীবনযাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। এ ব্যাপারগুলো খ্রিষ্টধর্মে নেই এবং তা এই ধর্মকে দুর্বলতম স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। সৃষ্টিজগতের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অনুসারেই পৃথিবীকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। কেননা ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিবেক ও জড়বস্তুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরিকে প্রশ্রয় দেয়নি; বরং এগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে জোরালো করেছে। একত্বের প্রতি এবং আমাদের চারপাশের পৃথিবীর পবিত্র ও আত্মিক প্রকৃতির সুরক্ষার প্রতি এমন প্রগাঢ় অনুভূতি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ইসলাম থেকে আমরা নতুন করে শিখতে পারি।[৪৮৮]

আধুনিক ইউরোপের রেনেসাঁসে ইসলামি সভ্যতার অবদান সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানতে লুইস সিডিও রচিত '*তারিখুল আরাবিল আম*'[৪৮৯] গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'ওয়াসফুল হাদারাতিল আবাবিয়্যাহ' শীর্ষক আলোচনা দেখুন। আরও দেখতে পারেন গুস্তাভ লি বোঁ-র *হাদারাতুল আরাব* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় এবং সিগরিড হুংকের '*শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*' গ্রন্থটি। এসব গ্রন্থগুলোতে পাশ্চাত্যসভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু জর্জ সার্টন (George Sarton,

---

৪৮৮. 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শীর্ষক বক্তৃতা, প্রিন্স চার্লস ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ-এ এই বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর ব্রিটিশ দূতাবাস এই বক্তৃতার অনূদিত কপি দামেশকে বিতরণ করে। পরবর্তী সময়ে প্রিন্স চার্লসের অর্থায়নে তা একটি ছোট পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

৪৮৯. Histoire des Arabes (১৮৫৪), ফরাসি থেকে আরবি অনুবাদ করেছেন আদিল যুআইতার।

1884-1956) রচিত '*মুকাদ্দামাতুন ফি তারিখিল উলুম*'[৪৯০] গ্রন্থে যত উৎস ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

এসব বর্ণনা সন্দেহাতীতভাবে ইসলামি সভ্যতার মৌলিকত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি, সামগ্রিকতা ও ক্রমবিকাশ, বাস্তবতা ও উদারতা এবং মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়াপত্তনে বিরাট অবদানের প্রমাণ বহন করে।

সময় হয়েছে এখন নবজাগরণের প্রত্যাশায় ইসলামি সভ্যতার সেসব অবদান অনুধাবন করার।

---

৪৯০. *Introduction to the History of Science.*

পরিশিষ্ট

আমরা ইসলামি ইতিহাসের অন্তস্তলে ও আমাদের অনন্য সভ্যতার পথে-প্রান্তরে দ্রুত ভ্রমণ করে এলাম, এখন আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মান্বেষার জায়গায় দাঁড়াতে হবে...এসব বিষয়ে জ্ঞানলাভের পর কাজেকর্মে আমাদের আকাঙ্ক্ষা কী? নিজ উম্মাহর প্রতি আত্মমর্যাদাশীল এবং তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন মুসলিম হিসেবে কী হবে আমাদের দায়িত্ব?

এই উম্মাহর মুক্তি ও সফলতা রয়েছে কেবল কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে—প্রায়োগিক অর্থে এ কথা অনুধাবনই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হওয়া উচিত। এটা কোনো আবেগপ্রসূত প্রমাণশূন্য কথা নয়, নিজেদের সত্যিকারের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর হতাশাগ্রস্ত লোকদেরও কথা নয় এটা; বরং এটাই বিবেকী, যৌক্তিক, দালিলিক ও প্রমাণসিদ্ধ কথা...। আমরা এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি। এই উন্নতি ও উৎকর্ষ নামাজের মিহরাবে বা জিহাদের ময়দানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং মানবজীবনের ছোট-বড় প্রতিটা ক্ষেত্রেই তা আমরা দেখেছি। ইসলামি সভ্যতার অনুশীলন-অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পরেও আর কোনো সভ্যতা এতটা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। চিন্তা ও বিশ্বাস, শিল্প ও সাহিত্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও ব্যবস্থাপনা, শান্তি ও যুদ্ধ... সবকিছুতে তা অনন্য ও অনুপম। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অসাধারণ অনুশীলন-অভিজ্ঞতার ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

জীবনের এই উজ্জ্বল পরম্পরায় ফিরে যেতে চাইলে আমাদের জন্য ইসলামি শরিয়ার কোনো বিকল্প নেই, আল্লাহর দ্বীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

> আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।[৪৯১]

সম্ভবত আমরা বুঝতে পারছি যে, উপর্যুক্ত আয়াতে যে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে তা সভ্যতার বিপরীত; তা মূলত বিভ্রান্তি ও বিনাশের অবস্থা। এই অবস্থার উৎস হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা, অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করা। আমাদের এই বোধের সমর্থনে রয়েছে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّتِيْ»

> তোমাদের মাঝে আমি দুটি বিষয় রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।[৪৯২]

তাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো একনিষ্ঠভাবে লৌকিকতামুক্ত থেকে সামগ্রিক অর্থে দ্বীনে ইসলামে প্রত্যাবর্তন। এই প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য ভ্রষ্টতার পর সত্যপথ, দাসত্বের পর নেতৃত্ব এবং অসভ্যতার পর সভ্যতার নিশ্চয়তা দেবে। একইভাবে নিশ্চয়তা দেবে দুনিয়ার সাফল্য তো বটেই, আখেরাতের সাফল্যেরও। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

---

[৪৯১]. সুরা আহযাব : আয়াত ৩৬।

[৪৯২]. *মুয়াত্তা মালেক*, কিতাবুল কদর, হাদিস নং ১৫৯৪; *আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি*, হাদিস নং ২০৮৩৩; *সুনানে দারাকুতনি*, হাদিস নং ৪৫৬৫; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৩১৯।

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে, কেউ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয় পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে দেবো তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।[৬৯৩]

আমাদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো আমাদের শেকড় ও ভিত্তিভূমি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করা...। এর জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা বা নির্ধারিত কিছু পৃষ্ঠা যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয় কোনো ভলিউম বা বড় কোনো গ্রন্থ...। এই গৌরবময় ইতিহাস পাঠ করতে এবং তার সকল পর্ব ও দিক নিয়ে অধ্যয়ন করতে আমাদের বিপুল পরিমাণ সময়—বরং জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করতে হবে। আমরা এই বইয়ে সামান্য কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এরপর আমাদের মহান চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞ আলেমদের রেখে যাওয়া জ্ঞানসমুদ্রে ডুবে যাওয়া উচিত। আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে পরিবার, মানবাধিকার, রাজনীতি, চিন্তা ও দর্শন, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, শিল্পকলা, নন্দনতত্ত্ব এবং অন্যান্য সব বিষয়ে...। আমাদের অনন্য, মহান মনীষীদের জীবনচরিত্রও আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে; তাদের জীবনযাপন কেমন ছিল, দ্বীন সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি কেমন ছিল, কীভাবেই-বা তারা দ্বীনের মাধ্যমে পৃথিবী শাসন করেছেন। ইতিহাসের রয়েছে অঢেল ভান্ডার। যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। রয়েছে অশেষ জ্ঞান-ঐশ্বর্য। সব ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ কথা যখন সত্য, তখন ইসলামি ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা অধিকতর সত্য, সূক্ষ্ম ও গভীর।

আমাদের পরবর্তী তৃতীয় দায়িত্ব হলো আমাদের এই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও যাবতীয় তথ্যভান্ডার পৃথিবীবাসীর কাছে পৌছে দেওয়া। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সফলতার উপাখ্যান পৃথিবীর মানুষ কমই জানে। বরং তারা আমাদের ব্যাপারে জানে কতগুলো মনগড়া বিষয় আর বিকৃত ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো উৎকণ্ঠা আর ভয় সঞ্চার করে। বয়ে আনে উপহাস আর বিদ্রূপ। উপরন্তু, কখনো কখনো এগুলো যুদ্ধবিগ্রহের ও শত্রুতারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অজানা বিষয়কে শত্রু মনে করে থাকে। তাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা কেন শুধু শুধু শত্রুতা টেনে আনব। তাদের তরফ থেকে আমাদের প্রতি কোনো শত্রুতা

---

৬৯৩. সুরা নাহল, আয়াত ৯৭।

না পেলেও কি আমরা তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করব না? ইসলামের বহুবিধ কল্যাণের কথা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরব না?

শাশ্বত ইসলামি রিসালাত কেবল আরব উপদ্বীপবাসীর জন্যই আসেনি, সেই শুরুর দিন থেকেই তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾

আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।[৪৯৪]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»

অন্যান্য নবী কেবল তারই জাতির উদ্দেশে প্রেরিত হতেন। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের উদ্দেশে।[৪৯৫]

আমাদের কাছে কুরআনের আয়াত ও রাসুলের বাণী এই দাবি রাখে যে, আমরা এই শাশ্বত দ্বীন ও অনুপম সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, সন্দেহপূর্ণ ইতিহাস খণ্ডন করে তা থেকে অসত্য বিষয়গুলো মুছে ফেলব, জনসাধারণের কাছে মানবজীবনের উন্নয়নে আমাদের অবদানগুলো তুলে ধরব, খুলে খুলে বর্ণনা করব। তখন সবাই বুঝবে যে, এই মহান ধর্মই হলো এই উন্নতি ও উৎকর্ষের কারণ। এভাবেই চলতে থাকবে দাওয়াতের ধারাবাহিকতা। ধাপে ধাপে পরিবর্তন হবে মানুষের চিন্তাধারা।

বুডলি[৪৯৬] কী বলেন এবার তা দেখে নেওয়া যাক। মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নের পর তিনি হতবাক হয়ে বলেন,

---

৪৯৪. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭।

৪৯৫. *বুখারি*, অধ্যায় : তায়াম্মুম, হাদিস নং ৩২৮; *মুসলিম*, হাদিস নং ৫২১ (শামেলা)।

৪৯৬. রোনাল্ড ভিক্টর বুডলি (R. V. C. Bodley) : ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও সেনা অফিসার। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ধাপে ধাপে কর্নেল পদে উন্নীত হন। যথাক্রমে ইরাকে ও ১৯২২ সালে উত্তর জর্ডানে ব্রিটিশ সেনা ইউনিটে কর্মরত থাকেন। এরপর ১৯২৪ সালে ওমানের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৩০-১৯৩১ সালে 'আর-রাবউল খালি' মরুভূমি পাড়ি দেন ও তার অজানা রহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করেন। রাষ্ট্রীয় পদ থেকে অব্যাহতির পর আরব মরুবাসীদের সঙ্গে বসবাস করতে চলে যান এবং নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে মরুভূমি ও প্রাচ্য

মুসলিমজাতি ছিল বৃষ্টির মতো। যে ভূমিতেই বর্ষিত হয় সে ভূমিকে উর্বর করে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে প্রধান ভূমিকা ছিল নবী-সাহাবিদের পৌত্রদেরই। তারাই উঁচিয়ে ধরেছিল সুস্থ সংস্কৃতির মশাল। তখনও ইউরোপ ডুবে ছিল মধ্যযুগীয় অন্ধকারে।[৪৯৭]

এই সাক্ষ্য বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা মুসলিমরা যে কল্যাণে ভূষিত ছিলেন তার প্রশংসা করছে, তাদের সাধনা ও কীর্তি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করছে। মুসলিমরা সর্বশেষ আসমানি পয়গামের ধারকবাহক হিসেবে তাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা উপলব্ধি করেছেন এবং সব জায়গায় কল্যাণের বিপ্লব ঘটিয়েছেন। উপর্যুক্ত সাক্ষ্য এ ব্যাপারটিও তুলে ধরছে। তুলে ধরছে মুসলিম সভ্যতার তুলনায় অন্যান্য সভ্যতার ফলশূন্যতার ব্যাপারটিও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর উপলব্ধির ব্যাপার এই যে, বুডলির সাক্ষ্য ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃতিত্ব বলে ঘোষণা করেছে, যিনি তাঁর সাহাবিদের এসব নীতি ও মূল্যবোধ এবং ইলম শিখিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তা উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের সন্তান ও বংশধরদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।

নিশ্চয় এটি মূল্যবান ও অসাধারণ সাক্ষ্য, বিশেষত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন,

«مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ السَّمَاءُ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسُ؛ فَشَرِبُوْا، وَسَقُوْا، وَزَرَعُوْا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ...»

সম্পর্কে নানা বিষয়ে লেখালেখি করেন। আরবি থেকেও অনুবাদ করেন তিনি। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ : الرسول: حياة محمد, *Wind in the sahara, The soundless Sahara.*

৪৯৭. R. V. C. Bodley, আর-রসুলু : হায়াতু মুহাম্মাদ, পৃ. ১৪৭।

> আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো ভূমির উপর বর্ষিত প্রবল বৃষ্টি। কোনো ভূখণ্ড ছিল উর্বর যা বৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশি উৎপন্ন করেছে। কোনো ভূখণ্ড ছিল কঠিন ও গভীর যা পানি (শোষণ করেনি, কিন্তু) আটকে রেখেছে, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকার সাধন করেছেন—মানুষ তা পান করেছে, (পশুপালকে) পান করিয়েছে এবং এর দ্বারা চাষাবাদ করেছে। কিছু বৃষ্টি ভূমির এমন অংশে পড়েছে যা ছিল সমতল ও কঠিন, তা পানিও আটকে রাখে না বা (পানি শোষণ করে) ঘাস-লতাপাতাও উৎপন্ন করে না। এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা তার উপকার করেছে—সে তা শিক্ষা করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে..।[৪৭৮]

কিন্তু নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন.. ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা না করে বা না জেনে বুডলি কীভাবে এই সাক্ষ্য দিতে পেরেছিলেন? নিজেকে আবারও জিজ্ঞেস করুন, কতজন অমুসলিম তা জানে যা জানতেন বুডলি?!

এই সাক্ষ্যের কি কয়েকটি সাক্ষ্য হওয়া সম্ভব নয়?!

এই সাক্ষ্যগুলোর দৃষ্টান্ত কি অমুসলিমদের বিবেক ও অন্তরের জট খুলে দেওয়ার জন্য চাবিকাঠি হতে পারে না?!

নিঃসন্দেহে এই উপলব্ধি আমাদের কাঁধে একটি গুরুদায়িত্ব এবং একটি মহান আমানতের ভার অর্পণ করে। তা এই যে, আমরা এই দ্বীনকে নিয়ে পুরো বিশ্ববাসীর কাছে ছুটে যাব। কারণ আমরা সর্বশেষ রাসুলের অনুসারী এবং তাঁর পরে আমাদেরকেই দেওয়া হয়েছে তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার আমানত। কেননা,

«فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

> কোনো কোনো মুবাল্লাগ (যার কাছে হাদিস বা দ্বীনের কথা পৌছানো হয়েছে) শ্রবণকারী (যে হাদিস বা দ্বীনের কথা

---

৪৭৮. *বুখারি*, হাদিস নং ৭৯; *মুসলিম*, হাদিস নং ২২৮২।

পৌঁছিয়েছে) থেকে কখনো কখনো অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।[৪৯৯]

«فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»

অনেকে এমন রয়েছে যারা (নিজেরা জ্ঞানী হলেও) নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (তার জন্য তা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত)।[৫০০]

সুতরাং এই কিতাবের পরিশিষ্টে যে বিষয়টির প্রতি আমি ইঙ্গিত করতে চাই তা এই যে, আমরা বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

এটা আমাদের জন্য চিরকাল গৌরব ও মহিমার বিষয় যে আমরা এই দ্বীনকে ধারণ করেছি এবং রাসুলদের নেতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের অনুসারী হয়েছি। তেমনই আমাদের জন্য অনন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের আলোকিত ইতিহাস ও উজ্জ্বল সংস্কৃতি দান করেছেন। আমাদের এখনই সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এবং পুরো সৃষ্টিজগতের সামনে তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে এ কথা ঘোষণা করার : আলহামদুলিল্লাহ! আমরা মুসলিম।

আমি খুবই দুঃখিত হই ও আফসোস করি যখন দেখি কিছু মুসলিম যুবক সমাজ থেকে লুকিয়ে থাকছে, যেন বোঝা না যায় সে মুসলিম; সে আদর্শহীন পশ্চিমাদের বা প্রাচ্যীয়দের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে, তা হতে পারে তাদের পোশাকে, হতে পারে তাদের ভাষায়, এমনকি তাদের খেলাধূলা ও বিনোদনে। যেন সে নিজের চামড়া খুলে ফেলতে চাইছে এবং পালিয়ে যেতে চাইছে নিজের বাস্তবতা থেকে।

আমি খুবই আফসোস করি যখন এই তিক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হই। প্রথম মুহূর্তেই আমি ধরতে পারি যে, এই সমস্ত যুবক তাদের ইতিহাসের কিছুই

---

৪৯৯. *বুখারি*, অধ্যায় : হজ, হাদিস নং ১৬৫৪

৫০০. *আবু দাউদ*, অধ্যায় : ইলম, হাদিস নং ৩৬৬০; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৬৫৬; *ইবনে মাজাহ* হাদিস নং ২৩০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৭৮৪।

জানে না এবং তারা তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এক পৃষ্ঠাও পড়েনি। তা না হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটত এবং পরিস্থিতি ভিন্ন হতো।

নষ্টরা কখনো সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে না...।

হতাশাগ্রস্তরা কখনো জাতির সংশোধন করতে পারে না...।

দৃঢ় মনোবল, আত্মসম্মানবোধ, উচ্চ মানসিকতা, অহংকারমুক্ত আত্মসম্মানবোধ, স্বেচ্ছাচারমুক্ত শক্তিমত্তা ব্যতীত আমরা কিছুতেই আমাদের সোনালি সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে পারব না..

কবি বলেছেন,

> যা সমৃদ্ধ করেছে আমার সম্মান ও মর্যাদা, যেন আমি পায়ের তলায় মাড়িয়েছি কৃত্তিকা নক্ষত্ররাশি..
>
> (তা এই যে, হে আমরা রব,) আমি তোমার বাণী 'হে আমার বান্দা, এর অন্তর্ভুক্ত এবং তুমি আহমদকে বানিয়েছ আমার নবী।[৫০১]

এই মনোবল ও প্রেরণাই এই বার্তা ধারণ করতে সক্ষম। এই মানসিকতাই এই সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশ্বনেতৃত্বে মুসলিমদের প্রত্যাবর্তন অচিরেই বাস্তবে পরিণত হবে এবং দূরের ও কাছের সকলেই তা প্রত্যক্ষ করবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমরা যেন সোনালি সভ্যতার এ বিশাল প্রাসাদ বিনির্মাণে অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত হই।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের এ বাণীটি উল্লেখ করা যেতে পারে,

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾

> এবং তারা বলবে কখন তা ঘটবে? বলে দিন, সম্ভবত তা ঘটবে শীঘ্রই।[৫০২]

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেন।

---

৫০১. কবি মুহাম্মাদ আল-জিলালি, আল-আবইয়াত।
৫০২. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৫১।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম : কুরআনুল কারিম

দ্বিতীয় : তাফসিরুল কুরআন ও উলুমুল কুরআন

- ইবনে কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির আল-কুরাশি আদ-দিমাশকি, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, নিরীক্ষণ : সামি ইবনে মুহাম্মাদ সালামাহ, দারু তাইবিয়া লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।
- মাশকি, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, নিরীক্ষণ : সামি ইবনে মুহাম্মাদ সালামাহ, দারু তাইয়িবা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।
- আবু হাইয়ান, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-আন্দালুসি, *তাফসিরুল বাহরিল মুহিত*, নিরীক্ষণ : আদিল আহমাদ আবদুল মাওজুদ ও অন্যরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- বদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আদুল্লাহ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফজল ইবরাহিম, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৯১ হি.।
- আর-রাযি, ফখরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে উমর, *আত-তাফসিরুল কাবির আও মাফাতিহুল গাইব*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ২০০০ খ্রি.।
- আস-সাদি, আবদুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে আবদুল্লাহ, *তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান (তাফসিরুস সাদি)*, নিরীক্ষণ : আবদুর রহমান ইবনে মুআল্লা আল-লুওয়াইহিক, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, কায়রো, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২০ হি.।

- সাইয়িদ কুতুব, *ফি যিলালিল কুরআন*, দারুশ শুরুক, কায়রো, একাদশ মুদ্রণ, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- সুয়ুতি, *লুবাবুন নুকুল ফি আসবাবিন নুযুল*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলি আয়িল কুরআন*, নিরীক্ষণ : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম মুদ্রণ, ২০০০ খ্রি./১৪২০ হি.।
- কুরতুবি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-আনসারি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল-আরাবি, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনুল আরাবি, *আল-আহকামুস সুগরা*, দারুত তাকরিব বাইনাল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ, ২০০১ খ্রি.।
- আল-ওয়াহিদি, *আসবাবু নুযুলিল কুরআন*, নিরীক্ষণ : কামাল বাসয়ুনি যগলুল, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯১ খ্রি.।

তৃতীয় : আকিদা ও ধর্ম

- ইবনে হায্ম আল-আন্দালুসি, আবু মুহাম্মাদ আলি ইবনে আহমাদ, *আল-ফাস্ল ফিল-মিলালি ওয়াল-আহওয়ায়ি ওয়ান-নিহাল*, মাকতাবাতুল-খানজি, কায়রো।
- শাহরাসতানি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারিম, *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ সাইয়িদ কিলানি, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪১৪ হি.।

চতুর্থ : সুনান ও আসার

- ইবনে আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুফি, *আল-মুসান্নাফ ফিল-আহাদিসি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : কামাল ইউসুফ আল-হুত, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৯ হি.।

- ইবনে হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ তামিমি, *সহিহ ইবনে হিব্বান বি-তারতিবি ইবনে বালবান*, নিরীক্ষণ : শুআইব আরনাউত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- ইবনে খুযাইমা, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আবু বকর সালামি নিশাপুরি, *সহিহ ইবনে খুযাইমা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ মুস্তাফা আযমি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৩৯০ হি./১৯৭০ খ্রি.।
- ইবনে মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আবু আবদুল্লাহ আল-কাযবিনি, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- আবু জাফর তাহাবি, *মুশকিলুল আসার*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস সিজিস্তানি আযদি, *সুনানে আবু দাউদ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, দারুল ফিকর।
- আবু নুআইম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানি, *হিলয়াতুল আওয়ালিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.।
- আবু ইয়ালা, আহমাদ ইবনে আলি ইবনুল মুসান্না মুসিলি তামিমি, *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, নিরীক্ষণ : হুসাইন সালিম আসাদ, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেশক, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৪ খ্রি./১৪০৪ হি.।
- বুখারি, *আত-তারিখুল কাবির*, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬ খ্রি.।
- বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আবু আবদুল্লাহ জুফি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

- বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আবু আবদুল্লাহ জুফি, *সহিহ বুখারি*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা দিব আল-বুগা, দারু ইবনে কাসির, আল-ইয়ামামাহ, বৈরুত, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- বাযযার, আহমাদ ইবনে আমর, *মুসনাদুল বাযযার*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৩ খ্রি.।
- বাইহাকি, *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : আবদুল মুতি আমিন কালআজি, দারুল ওয়াফা, মিশর, ১৪১২ হি.।
- বাইহাকি, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন, *দালায়িলুন নুবুওয়া*, নিরীক্ষণ : আবদুল মুতি আমিন কালআজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- বাইহাকি, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন, *সুনানুল বাইহাকিল-কুবরা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আতা, মাকতাবা দারুল বায, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি./১৪১৪ হি.।
- বাইহাকি, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন, *শুআবুল ঈমান*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ সাইদ বাসইয়ুনি যগলুল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১৪ হি.।
- তিবরিযি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আবু ঈসা সালামি, *জামে তিরমিযি*, নিরীক্ষণ : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যরা, দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- আল-হারিস ইবনে আবু উসামা, *বুগয়াতুল বাহিস আন যাওয়ায়িদি মুসনাদিল হারিস*, যাওয়ায়িদু হাফিয নুরুদ্দিন হাইসামি, নিরীক্ষণ : হুসাইন আহমাদ সালিহ বাকিরি, মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস-সিরাতিন নাবাবিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.।
- হাকিম, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি, *মুসতাদরাকে হাকেম*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুল কাদির আতা,

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.।

- দারাকুতনি, আলি ইবনে উমর আবুল হাসান বাগদাদি, *সুনানুদ দারাকুতনি*, নিরীক্ষণ : সাইয়িদ আবদুল্লাহ হাশিম ইয়ামানি মাদানি, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.।
- দারিমি, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আবু মুহাম্মাদ, *সুনানুদ দারিমি*, নিরীক্ষণ : ফাওয়ায আহমাদ যামরালি ও খালিদ আস-সাবউল ইলমি, দারুল কুতুবিল আরাবি, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.।
- সুলাইমান ইবনে দাউদ ফারিসি বিসরি তয়ালিসি, *মুসনাদু আবি দাউদ তয়ালিসি*, দারুল মারিফা, বৈরুত।
- তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, নিরীক্ষণ : হামদি ইবনে আবদুল মাজিদ সালাফি, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল-হিকাম, মসুল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি.।
- তাবারানি, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমাদ *আল-মুজামুল আওসাত*, নিরীক্ষণ : তারিক ইবনে আওদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ও আবদুল মুহসিন ইবনে ইবরাহিম হুসাইনি, দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি.।
- তাবারানি, সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ুব, *মুসনাদুশ শামিয়্যিন*, নিরীক্ষণ : হামদি ইবনে আবদুল মাজিদ সালাফি, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.।
- আবদুর রাযযাক কিলানি, *মিন মাওয়াকিফি উযামায়িল মুসলিমিন*, দারুন নাফায়িস লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.।
- আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু মুহাম্মাদ ইবনে নাসর কাসসি, *আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি আবদি ইবনে হুমাইদ*, নিরীক্ষণ : সুবহি বাদরি সামরায়ি ও মাহমুদ মুহাম্মাদ খলিল সায়িদি, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

- মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আমের আসবাহি মাদানি, *মুআত্তা মালেক*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি, আলি ইবনে হুসামুদ্দিন, *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল-আফআল*, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আবুল হুসাইন কুশাইরি নিশাপুরি, *সহিহ মুসলিম*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- নাসায়ি, আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব, *সুনানুন নাসায়িল-কুবরা*, নিরীক্ষণ : আবদুল গাফফার সুলাইমান বান্দারি ও সাইয়িদ কাসুরি হাসান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।
- হাইসামি, নুরুদ্দিন আলি ইবনে আবু বকর, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১২ হি.।

পঞ্চম : শুরুহুল হাদিস ওয়া উলুমুহু

- ইবনে আবি হাতিম, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস রাযি, *আল-জারহু ওয়াত-তাদিল*, দারু ইহয়ায়িত- তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনুল জাওযি, আবদুর রহমান, *কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সাহিহাইন*, নিরীক্ষণ : আলি হুসাইন বাউয়াব, দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম মুহাম্মাদ বুস্তি, *আল-মাজরুহিন*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ ইবরাহিম যায়াদ, দারুল ওয়ায়ি, আলেপ্পো।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *আত-তালখিসুল হাবির ফি তাখরিজি আহাদিসির রাফিয়িল কাবির*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

- ইবনে হাজার আসকালানি, *তাজিলুল মানফাআত বি-যাওয়ায়িদি রিজালিল আইম্মাতিল আরবাআ*, নিরীক্ষণ : ইকরামুল্লাহ ইমদাদুল হক, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *ফতহুল বারি শরহু সাহিহিল বুখারি*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৭৯ হি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আহমাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি, *আল-মাতালিবুল আলিয়া বি-যাওয়ায়িদিল মাসানিদিস সামানিয়া*, নিরীক্ষণ : গুনাইম আব্বাস গুনাইম এবং ইয়াসির ইবরাহিম মুহাম্মাদ, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, ১৪১৮ হি.।
- আবুল হাসানাত লাখনভি হিন্দি, *আর-রাফউ ওয়াত-তাকমিল ফিল-জারহি ওয়াত-তাদিল*, নিরীক্ষণ : আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, দারুস সালাম লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কায়রো, ২০০০ খ্রি.।
- আহমাদ ইবনে হাম্বল আবু আবদুল্লাহ শাইবানি, *মাসায়িলে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, রিওয়ায়াতু ইবনিহি আবদুল্লাহ*, নিরীক্ষণ : যুহাইর শাবিশ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।
- আলবানি, *তামামুল মিন্নাহ ফিত-তালিক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, দারুর রায়াহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হি.।
- আলবানি, *সহিহু ওয়া যয়িফুল জামিয়িস সগির ওয়া যিয়াদাতুহু*, আল-মাকতাবুল ইসলামি।
- আলবানি, *সহিহু ওয়া যয়িফু সুনানি আবি দাউদ*, মারকাযু নুরিল ইসলাম লি-আবহাসিল কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ছাপানো সংস্করণ।
- আলবানি, *গায়াতুল মারাম ফি তাখরিজি আহাদিসিল হালালি ওয়াল-হারাম*, আল-মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৫ হি.।

- আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন, *ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি আহাদিসি মানারিস সাবির*, আল-মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।
- আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন, *আস-সিলসিলাতুস সাহিহা*, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।
- বাজি আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান ইবনে খালাফ, *আত-তাদিল ওয়াত-তাজরিহ লিমান খাররাজা লাহুল বুখারি ফিল-জামিয়িস সহিহ*, নিরীক্ষণ : আবু লুবাবা হুসাইন, দারুল লিওয়া লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, রিয়াদ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- জাযারি, আবুস সাআদাত মুবারক ইবনে মুহাম্মাদ, *আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : তাহের আহমাদ যাবি এবং মাহমুদ মুহাম্মাদ তানাহি, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৯৯ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- যাহাবি, শামসুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *আত-তালখিস*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- যামাখশারি, মাহমুদ ইবনে উমর, *আল-ফায়িক ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহিম এবং আলি মুহাম্মাদ বাজাবি, দারুল মারিফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত।
- সাখাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, *ফাতহুল মুগিস শরহু আলফিয়্যাতিল হাদিস*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ১৪০৩ হি.।
- সুয়ুতি, *মিফতাহুল জান্নাহ ফিল-ইহতিজাজি বিস-সুন্নাহ*, আল-জামিআতুল ইসলামিয়্যা, তৃতীয় সংস্করণ, মদিনা মুনাওয়ারা, ১৩৯৯ হি.।
- শরিফ হাতেম ইবনে আরেফ আওনি, *খুলাসাতুত তাসিল লি-ইলমিল জারহি ওয়াত তাদিল*, দারু আলামিল ফাওয়াইদ, মক্কা মুকাররমা, ১৪২১ হি.।

- তাহাবি, আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা, *শরহু মাআনিল আসার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ যাহরি নাজ্জার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৯৯ হি.।
- আযিমাবাদি, মুহাম্মাদ শামসুল হক আবুত তাইয়িব, *আওনুল মাবুদ শরহে সুনানে আবু দাউদ*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৫ হি.।
- মুবারকপুরি, আবুল আলা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহিম, *তুহফাতুল আহওয়াযি বি শারহি জামিয়িত তিরমিযি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- মুনাবি, মুহাম্মাদ আবদুর রউফ ইবনে আলি, *ফয়যুল কাদির শরহুল জামিয়িস সগির*, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, প্রথম সংস্করণ, মিশর, ১৩৫৬ হি.।
- নববি, আবু যাকারিয়্যা ইয়াহয়া ইবনে শারাফ ইবনে মুরি, আল-মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৯২ হি.।

ষষ্ঠ : ইতিহাস, সিরাত এবং শামায়েলের কিতাব

- ইবনুল আসির আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ জাযারিঃ *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনুল ইখওয়া, যিয়াউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *মাআলিমুল কুরবাতি ফি তালাবিল হিসবাতি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০১ খ্রি.।
- ইবনুল জাওযি, *মানাকিবুল আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনু আবদিল আযিয*, দারু ইবনে খালদুন, আলেকজান্দ্রিয়া।
- ইবনুল জাওযি, আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ, *আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম*, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৫৮ হি.।

- ইবনুয যিয়া, আবুল বাকা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ হানাফি, *তারিখু মাক্কাতিল মুকাররামাতি ওয়াল-হারামিশ শারিফ*, নিরীক্ষণ : আলা ইবরাহিম এবং আইমান নসর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।
- ইবনুত তাকতাকা, *আল-ফাখরি ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ-দুওয়ালিল ইসলামিয়্যা*, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইবনুল আবারি ইউহান্না ইবনে আহরুন, *মুখতাসারু তারিখিদ দুওয়াল*, নিরীক্ষণ : অ্যান্টন আবদুল্লাহ সালিহানি, দারুর রায়িদ, লেবানন, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.।
- ইবনুল আদিম কামাল উদ্দিন, *বুগইয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালব*, নিরীক্ষণ, সুহাইল যাকারিয়া, দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনুল কালবি, হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ, *কিতাবুল আসনাম*, নিরীক্ষণ : আহমাদ যাকি পাশা, মাতবাআতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯২৪ খ্রি.।
- ইবনুন নাজ্জার বাগদাদি মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আবুল হাসান, *যাইলু তারিখি বাগদাদ*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুল কাদের আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনুল ওয়ারদি, *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ ফাখুরি, দারুশ শারকিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনুল ওয়ারদি, যাইনুদ্দিন উমর ইবনে মুযাফফার, *তারিখু ইবনিল ওয়ারদি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনে বুদরান আবদুল কাদের ইবনে আহমাদ, *তাহযিবু তারিখি দিমাশকিল কাবির লি-ইবনে আসাকির*, আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯১০ খ্রি.।

- ইবনে বাসসাম, আবুল হাসান আলি, *আয-যাখিরা ফি মাহাসিনি আহলিল জাযিরা*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারুল গারবিল ইসলামি, ২০০০ খ্রি.।
- ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ ইবনে আবদুস সালাম, *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ রাশাদ সালেম, মুআসসাসাতু কুরতুবা, প্রথম সংস্করণ।
- ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান বুস্তি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : আবদুস সালাম আলুশ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *ইনবাউল গুমার বি-আবনায়িল উমার ফিত-তারিখ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল মুইদ খান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- ইবনে হাজার, *তাওয়ালিত তাসিস বি-মাআলি ইবনে ইদরিস*, নিরীক্ষণ : আবুল ফিদা আবদুল্লাহ কাজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- ইবনে হাযম, *জাওয়ামিউস সিরাহ*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস প্রমুখ, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- ইবনে হাইয়ান কুরতুবি, হাইয়ান ইবনে খালাফ ইবনে হাইয়ান, *আল-মুকতাবাস ফি তারিখিল আন্দালুস*, দারুল আফাকিল জাদিদা, বৈরুত।
- ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দামা*, নিরীক্ষণ : আলি আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি, মাতবাআ দারুশ শিআব।
- ইবনে খালদুন আবদুর রহমান মাগরিবি, *আল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল-খাবার ফি আইয়ামিল আরাবি ওয়াল-আজমি ওয়াল-বারবারি ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত।

- ইবনে দুকমাক : আল জাওহারুস সামিন ফি সিয়ারিল খুলাফাই ওয়াল মুলুকি ওয়াস সালাতিন। জামিয়াতু উম্মুল কুরা, সৌদি আরব ১৪০৩ হি.।
- ইবনে দুকমাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ঈদমার, *আল-ইনতিসার লি-ওয়াসিতাতি আকদিল আমসার*, দারুল আফাকিল জাদিদা, বৈরুত।
- ইবনে সাদ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানি, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৬৮ খ্রি.।
- ইবনে সাইদ আন্দালুসি, *আল-মাগরিব ফি হুলিয়্যিল মাগরিব*, নিরীক্ষণ ও টীকা সংযোজন : শাওকি যাইফ, আল-হাইআতু মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো।
- ইবনে আবদুল হাকাম আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ, ফুতুহু *মিসর ওয়া আখবারুহা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ হুজাইরি, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনে আযারি মারাকেশি, *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল-মাগরিব*, দারুস সাকাফা, বৈরুত।
- ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক ওয়া যিকরু ফাযলিহা ওয়া তাসমিয়াতু মান হাল্লাহা মিনাল আমাসিলি আও ইজতাযা বি নাওয়াহিহা মিন ওয়ারিদিহা ওয়া আহলিহা*, নিরীক্ষণ : আলি শেরি, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- ইবনে ফাদলুল্লাহ উমারি, মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ নায়িফ দাইলামি, আলিমুল কুতুব লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, বৈরুত।
- ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যা, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব যারয়ি, *যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, নিরীক্ষণ, মুস্তাফা আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

- ইবনে কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, নিরীক্ষণ : আলি শেরি, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।
- ইবনে কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমর কুরাশি দিমাশকি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুল ওয়াহিদ, দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৬ হি./১৯৭১ খ্রি.।
- ইবনে মাসকুয়াহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *তাজারুবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম*, নিরীক্ষণ : সাইয়েদ কারবি হাসান দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ বৈরুত ২০০৩ খ্রি.
- ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক মাআফিরি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মদ ফাহমি সারজানি, আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যা, কায়রো।
- ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব*, দারুল কলম, কায়রো।
- আবুল আব্বাস নাসিরি আহমাদ ইবনে খালেদ, *আল-ইসতিকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, নিরীক্ষণ : জাফর নাসিরি, দারুল কিতাব, আদ-দারুল বাইযা, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- আবু শামাহ, শিহাবুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, *আর-রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, মাতবাআতু ওয়াদিন নিল, কায়রো, মিশর, ১২৮৭ হি.।
- আযদি, আবুল ওয়ালিদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইউনুস, *তারিখুল উলামা বিল-আন্দালুস*, নিরীক্ষণ : ইযযত আত্তার হুসাইনি, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।
- তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, *আশ-শামায়িল*, মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১২ হি.।
- তানুখি, আবু আলি মুহসিন ইবনে আবুল কাসিম, *আল-ফারজু বা'দাশ শিদ্দাহ*, মাকতাবাতুল খানজি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

- জাহশিয়ারি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস, *আল-ওয়াযারা ওয়াল-কিতাব*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা সাকা প্রমুখ, মাতবাআতুল-বাবিল-হালাবি, কায়রো, ১৯৩৮ খ্রি.।
- হালাবি, আলি ইবনে বুরহানুদ্দিন, *আসসিরাতুল হালাবিয়্যা*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪০০ হি.।
- হুমাইদি, *আল-মুকতাবাস ফি তারিখি উলামায়িল আন্দালুস*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইবারি, দারুল কিতাবিল মিসরি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৮ খ্রি.।
- খতিব বাগদাদি, আবু বকর মুহাম্মাদ, *তারিখে বাগদাদ*, নিরীক্ষণ : মুস্তফা আবদুল কাদের, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- যাহাবি, *আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ সাইদ ইবনে বাসয়ুনি দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, মুস্তফা আবদুল কাদের, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- সুহাইলি, আবুল কাসেম আবদুর রহমান, *আর-রওযুল উনুফ ফি শারহি সিরাতি ইবনে হিশাম*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- সুয়ুতি, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, *তারিখুল খুলাফা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, মাতবাআতুস সাআদাহ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- সায়িদ আন্দালুসি, সায়িদ ইবনে আহমাদ, তাবাকাতুল উমাম, নিরীক্ষণ : হুসাইন মুনিস, দারুল মাআরিফ, প্রথম সংস্করণ কায়রো: ১৯৯৮ খ্রি.।
- তাবারি, মুহাম্মাদ ইবনে জারির আবু জাফর, *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৭ হি.।

- আবদুল কাদের নুআইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম শামসুদ্দিন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।
- আবদুল কাদের বুদরান, *মুনাদামাতুল আতলাল ওয়া মুসামারাতুল খিয়াল*, নিরীক্ষণ : যুহাইর শাবিশ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- ফাসাবি, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, নিরীক্ষণ : খলিল মানসুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- আল-কিন্দি, উমর মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ, *আল-উলাতু ওয়াল-কুযাত*, মাকতাবাতুল আবায়িল ইয়াসুয়িয়্যিন, বৈরুত।
- মুহাম্মাদ ইবনে তাকিউদ্দিন আইয়ুবি, *মিযমারুল হাকাইক ওয়া সিররুল খালাইক*, নিরীক্ষণ : হাসান হাবশিন, আলামুল কুতুব, কায়রো।
- মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক আল-হামাযানি, *তাকমিলাতু তারিখিত তাবারি*, নিরীক্ষণ : আলবার্ট ইউসুফ সামআন, আল-মাতবাআতুল কাসুলিকিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৫৮ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালিহি শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ*, নিরীক্ষণ : আদিল আহমাদ আবদুল মাউজুদ এবং আলি মুহাম্মাদ মিওয়ায, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- মারাকেশি, *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ২০০৬ খ্রি.।
- মাক্কারি, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাতিব, *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুসির রাতিব*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।

- মাকরিযি, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি, *ইত্তিআযুল হুনাফা বি-আখবারিল আয়িম্মাতিল খুলাফা*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
- মাকরিযি, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- নাবলুসি, উসমান ইবনে ইবরাহিম সাফাদি, *লামউল কাওয়ানিনিল মুজিয়্যাহ ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যাহ*।
- ইয়াফেয়ি, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান ফি মারিফাতি মা ইয়ুতাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, টীকা সংযোজন, খলিল মানসুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- ইয়াকুবি, *তারিখুল ইয়াকুবি*, দারু সাদির, লেবানন।

সপ্তম : কুতুবিত তারাজিমি ওয়াত-তাবাকাত

- ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, নিরীক্ষণ : আমের নাজ্জার, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- ইবনু আবিল ওফা কুরাশি, আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মাদ, *আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ*, নিরীক্ষণ : আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ আল-হালব, মাকতাবাতু হাজার লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- ইবনুল আবার, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ কুযায়ি, *আত-তাকমিলা লি-কিতাবিস সিলাহ*, নিরীক্ষণ : আবদুস সালাম হারাস, দারুল ফিকরিল আরাবি, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।
- ইবনুল জাওযি, আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনে আলি, *সিফাতুস সাফওয়াহ*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ ফাখুরি এবং মুহাম্মাদ রুওয়াস

কিলআহ জি, দারুল মারিফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.।

- ইবনুল খতিব, লিসানুদ্দিন, *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আনান, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৭ খ্রি.।
- ইবনুল ইমাদ হাম্বলি, আবদুল হাই ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আকারি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, নিরীক্ষণ : আবদুল কাদির আরনাউত ও মুহাম্মাদ আরনাউত, দারু ইবনে কাসির, দামেশক, ১৪০৬ হি.।
- ইবনু নাদিম, আবুল ফারজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, *আল-ফিহরিসত*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৯৮ হি./১৯৮৯ খ্রি.।
- ইবনে বিশকাওয়াল, খালাফ ইবনে আবদুল মালিক, *আস-সিলাহ*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইবয়ারি, দারুল কিতাবিল মিসরি। প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *তাকরিবুত তাহযিব*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আওয়ামা, দারুর রশিদ, প্রথম সংস্করণ, সিরিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আলি, *তাহযিবুত তাহযিব*, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আবুল ফযল, *আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবা*, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আলি, *রাফউল ইসর আন কুযাতি মিসর*, নিরীক্ষণ : হামেদ আবদুল মাজিদ, আল-মাতবাআতুল আমিরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৫৭ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *লিসানুল মিযান*, নিরীক্ষণ : দায়িরাতুল মাআরিফিন নিযামিয়্যা বিল-হিন্দ, মুআসসাসাতুল আলামি লিল মাতবুআত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

- ইবনে খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর, *ওফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবায়ি আবনায়িয যামান*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি.।
- ইবনে খাইয়াত, খলিফা, *কিতাবুত তাবাকাত*, নিরীক্ষণ : সুহাইল যাক্কার, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৩ খ্রি.।
- ইবনে আবদুল বার, আবু উমর ইউসুফ, *আল-ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব*, (ইসাবাহর সাথে ছাপানো), দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।
- আবুত তাইয়িব লুগাবি, *মারাতিবুন নাহবিয়্যিন*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহিম, দারুন নাহদা, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো ১৯৭৪ খ্রি.।
- আবু নুআইম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানি, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল কিতাবিল আরাবি, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৫ হি.।
- আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, নিরীক্ষণ : খলিল মানসুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- আজিরি, মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন, *আখবারু আবি হাফস উমর ইবনে আবদুল আযিয*, নিরীক্ষণ : আবদুল্লাহ আবদুর রহিম আইলান, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.।
- বাবানি, ইসমাইল পাশা বাগদাদি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, ইস্তাম্বুলের ওয়াকালাতুল মাআরিফিল-জালিলা, এর সহায়তায় প্রকাশিত, ১৭৫১ খ্রি.।
- বালাযুরি, আহমাদ ইবনে ইয়াহয়া, *আনসাবুল আশরাফ*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
- হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল-ফুনুন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯২ খ্রি.।

- হুসাইনি, আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ ইবনে আলি, *যাইলু তাযকিরাতিল হুফফায*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.।
- খুশানি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস, *কুযাতু কুরতুবা*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইবারি, দারুল কুতুবিল লুবনানি, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি।
- যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, নিরীক্ষণ : হুসাইন আসাদ, *মুআসসাসাতুর রিসালা*, নবম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.। • যাহাবি, মারিফাতুল কুররায়িল কিবার আলাত-তাবাকাতি ওয়াল আছার নিরীক্ষণ : শুআইব আরনাউত ও অন্যরা মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ। বৈরত ১৪০৪ হি.।
- যুবাইরি, মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসআব ইবনে সাবেত ইবনে আবদুল্লাহ, *নাসাবু কুরাইশিন*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৫৩ খ্রি.।
- সুবকি, তাজুদ্দিন ইবনে আলি, *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ মুহাম্মাদ তানাহি ও আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ হুলুব, হাজার লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৩ হি.।
- সাখাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, *আদ-দাওউল লামি লি-আহলিল কারনিত তাসি*, দারুল জাইল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১২হি./১৯৯২ খ্রি.।
- সুয়ুতি, *বুগয়াতুল উআত ফি তাবাকাতিল লুগাবিয়্যিন ওয়ান-নুহাত*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুর কাদির আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.।
- শামসুদ্দিন ইবনে তুলুন, *কুযাতু দিমাশক*, আস-সাগরুল বিসাম ফি যিকরি মান উল্লিয়া কাযায়িশ শাম। নিরীক্ষণ : সালাহুদ্দিন মুনজিদ,

দারুল মাওয়াদির লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ ২০০৬ খ্রি.।

- শাহরাযুরি, শামসুদ্দিন, তারিখুল হুকামা, নিরীক্ষণ : আবদুল কারিম আবু শুওয়াইরিব, মাকতাবাতু বিবলিয়ুন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.।
- সাফাদি, সালাহুদ্দিন খলিল ইবনে আইবাক, আল-ওয়াফি বিল-ওফায়াত, নিরীক্ষণ : আল মাহাদুল আলমানি, ১৯৯৭ খ্রি.।
- আদ দাব্বিয়ুল বাগদাদি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে খালাফ ইবনে হাইয়ান, আখবারুল কুযাত, নিরীক্ষণ : আবদুল আযিয মুস্তফা মারাগি, আল-মাকতাবাতুত তুজারিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৪৭ খ্রি.।
- কাফতি, আলি ইবনে ইউসুফ, ইখবারুল উলামা বি ইখবারিল হুকামা, দারুল আসার, বৈরুত।
- কন্নৌজি, সিদ্দিক ইবনে হাসান, আবজাদুল উলুমিল ওয়াশিল মারকুম ফি বায়ানি আহওয়ালিল উলুম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৭৮ খ্রি.।
- কুতুবি, মুহাম্মাদ ইবনে শাকের, ফাওয়াতুল ওফায়াত, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত ১৯৭৪ খ্রি.।
- কাহহালা, উমর রেজা, মুজামুল মুআল্লিফিন, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- মিযযি, ইউসুফ ইবনে যাকি আবদুর রহমান আবুল হাজ্জাজ, তাহযিবুল কামাল, নিরীক্ষণ : বাশার আওয়াদ মারুফ, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.।
- নাবাহি, আবুল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল মালিকি আল-আন্দালুসি, আল-মারাকাবাতুল উলয়া ফি মান ইয়াসতাহিক্কুল কাযা ওয়াল-ফুতয়া, নিরীক্ষণ : লাজনাতু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, দারুল আফাকিল জাদিদা, পঞ্চম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

- ইয়াকুত আল-হামাবি আর-রুমি, *মুজামুল উদাবা ইরশাদুল আরিব ইলা মারিফাতিল আদিব*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৩ খ্রি.।

অষ্টম : মুজাম এবং সাহিত্যের কিতাবসূচি

- ইবনুল মুকাফফা, আবু আবদুল্লাহ, *আল-আদাবুস সগির*. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- ইবনে কুতাইবা আদ্দিনাওরি, *উয়ুনিল আখবার*, নিরীক্ষণ : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনে মানযুর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম আল-আফরিকি আল মিসরি, *লিসানুল আরাব*, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- ইবনু নুবাতা আল-মিসরি, *সারহুল উয়ুন ফি শারহি রিসালাতি ইবনে যাইদুন*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহিম, দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো, ১৯৬৪ খ্রি.।
- আবু ইসহাক আল-কায়রাওয়ানি, *যাহরুল আদাবি ওয়া সামারুল আলবাবি*, নিরীক্ষণ : ইউসুফ আত-তাবিল এবং অন্যান্য দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- বাগদাদি, আবদুল কাদির ইবনে উমর, *খিযানাতুল আদাবি ওয়া লুব্বু লিসানিল আরাবি*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ নাবিল তারিফি এবং অন্যান্য, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রি.।
- জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, নিরীক্ষণ : ফাওযি আতাবি, দারু সাব, বৈরুত, ১৯৬৮ খ্রি.।
- হারেস আল-মুহাসেবি, *আদাবুন নুফুস*, নিরীক্ষণ : আবদুল কাদির আহমাদ আতা, দারুলজিল, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৪ খ্রি.।
- খতিব বাগদাদি, আহমাদ ইবনে আলি ইবনে সাবিত, *আল-জামি লি-আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ আত-তাহহান, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৪০৩ হি.।

- খতিব তিবরিযি, *আল-ওয়াফি ফিল-আরুয ওয়াল-কাওয়াফি*, নিরীক্ষণ : ফখরুদ্দিন কাবাওয়া, দারুল ফিকরিল মুআসির, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৬ খ্রি.।
- খলিল ইবনে আহমাদ, আবু আবদির রহমান ইবনে আমর ইবনে তামিম আল-ফারাহিদি, কিতাবুল আইন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- সামআনি, আবু সায়িদ আবদুল কারিম ইবনে মুহাম্মাদ, আদাবুল *ইমলা ওয়াল-ইসতিমলা*, নিরীক্ষণ : ম্যাক্স ফায়সফায়লার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।
- সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশেমি, *মিযানুয যাহাবি ফি সিনাআতি শারিল আরাবি*, দারুল ঈমান, কায়রো, ১৯৭০ খ্রি.।
- গাযালি, আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, দারুল মারিফা, বৈরুত।
- গাযালি, আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *আল-মুনকিয মিনাদ দালাল*, নিরীক্ষণ : আবদুল হালিম মাহমুদ, দারুল কুতুবিল হাদিসা, কায়রো, ১৯৭৯ খ্রি.।
- ফিরুযাবাদি, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব, *আল কামুসুল মুহিত*, মাতবাআতু দারিল মামুন, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৫৭ হি.।
- কুদামা ইবনে জাফর, *আল-খারাজ ওয়া সিনাআতুল কিতাবা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যুবাইদি, দারুর রশিদ, ইরাক।
- কালকাশান্দি, আহমাদ ইবনে আলি, *সুবহুল আ'শা ফি সিনাআতিল ইনশা*, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, দামেশক, ১৯৮৭খ্রি.
- মুরতাযা আয-যাবিদি, আবুল ফাইয মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রাযযাক, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিল কামুস*, দারুল হিদায়া।
- *আল-মুজামুল ওয়াসিত : মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা*, মাকতাবাতুশ শুরুকিদ দুওয়ালিয়া, চতুর্থ সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

- নুওয়াইরি, শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, *নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব*, নিরীক্ষণ : মুফিদ কামহিয়্যাহ ও একদল গবেষক দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।

নবম : কুতুবুল বুলদান ওয়ার-রিহলাত

- ইবনু বতুতা, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ, *রিহলাতু ইবনি বাতুতা*, দারুন নাফায়িস লিত-তিবয়োতি ওয়ান-নাশরি, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনে জুবায়ের, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *রিহলাতু ইবনি জুবায়ের*, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইবনে হামদুন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে সাদ, *আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়্যা*, নিরীক্ষণ: ইহসান আব্বাস ও বকর আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনে খারদাদবেহ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, *আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক*, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- ইদরিসি, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, *নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক*, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- হামাবি, আবু আবদিল্লাহ ইয়াকুত ইবনে আবদিল্লাহ, *মুজামুল বুলদান*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- হিময়ারি, *আর-রওযুল মিতার ফি খাবারিল আকতার*, মাকতাবাতু লুবনান নাশিরুন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.।
- হিময়ারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল মুনয়িম, *সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস*, দারুল জিল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- শাবুশতি, আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ, *আদ-দিয়ারাত*, নিরীক্ষণ : কুরকিস আওয়াদ, দারুর রয়িদিল আরাবি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.।

- কাযবিনি, যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ, *আসারুল বিলাদি ওয়া আখবারুল ইবাদ*, দারু বৈরুত, বৈরুত, ১৯৭৯ খ্রি.।
- মাকরিযি, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবার বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ যেননুহুম ওয়া মাদিহাতুশ শারকাবি, মাকতাবাতু মাদবুলি, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।

দশম : আল-ফিকহু ওয়াস-সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যা

- ইবনু আবির রবি, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *সুলুকুল মালিক ফি তাদবিরিল মামালিক*, নিরীক্ষণ : হামিদ রবি, দারুশ শাব, কায়রো, ১৯৭৯ খ্রি.।
- ইবনুল আযরাক, *বাদায়িউস সিলক ফি তাবায়িয়িল মুলক*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল কারিম, আদ-দারুল আরাবিয়া লিল-কিতাব।
- ইবনুল হাজ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবদারি, *আল-মাদখাল*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০১ হি., ১৯৮১খ্রি.।
- ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা ফিস সিয়াসাতিশ শারয়িয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ জামিল গাজি, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো।
- ইবনে তাইমিয়া : শায়খুল ইসলাম তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ আল হিরানি (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) : আসসিয়াসাতুস -শারইয়্যা ফি ইসলাহির রায়ি ওয়ার রায়িয়্যা : নিরীক্ষণ, মুহাম্মদ শাবরাকি দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ২০০৮ হি.
- ইবনে হাযম, *আল-মুহাল্লা*, দারুল ফিকরি লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি।

- ইবনে যানজুয়া, *আল-আমওয়াল*, নিরীক্ষণ : আবু মুহাম্মাদ আল-আসয়ুতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৬ খ্রি.।
- ইবনে সুহনুন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদিস সালাম, *আদাবুল মুআল্লিমিন*, নিরীক্ষণ : হাসান হাসানি আবদুল ওয়াহহাব, দারুশ শারকিয়্যাহ-তিউনিসিয়া, ১৯৮২ খ্রি.।
- ইবনে আবিদিন, *হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, দারুল ফিকরি লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, বৈরুত, ১৪২১ হি. ২০০০ খ্রি.।
- ইবনে ফারহুন আল-মালিকি, ইবরাহিম ইবনে আলি, *তাবসিরাতুল হুককাম ফি উসুলিল আকযিয়াতি ওয়া মানাহিজিল আহকাম*, টীকা সংযুক্তি : জামাল মারআশলি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।
- ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওরি, *আল-ইমামা ওয়াস-সিয়াসা* (*তারিখুল খুলাফা* নামে প্রসিদ্ধ), নিরীক্ষণ : তহা মুহাম্মাদ আয-যাইনি, মুআসসাসাতুল হালাবি, কায়রো, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.।
- ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আবুল ফারাজ শামসুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *আশ-শারহুল কাবির আলা মাতানিল মুকনি*, দারুল কিতাবিল আরাবি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি।
- ইবনে কুদামা, মুয়াফফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল মাকদিসি, *আল-মুগনি*, দারুল আলামিল কুতুব লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ।
- ইবনে মুফলিহ আল-মাকদিসি, *আল-আদাবুশ শারইয়্যা ওয়াল-মিনাহুল মারইয়্যা*, দারুল ওয়াফা লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.।
- আবু উবাইদ, কাসেম ইবনে সাল্লাম, *আল-আমওয়াল*, নিরীক্ষণ : খলিল হাররাস, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি.।

- আবু ইউসুফ, ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম, *আল-খারাজ*, আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৩৫২ হি.।
- আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কালকাশান্দি, *মাআসিরুল ইনাফা ফি মাআলিমিল খিলাফা*, নিরীক্ষণ : আবদুস সাত্তার আহমাদ ফাররাজ, মাতবাআতু হুকুমাতিল কুয়েত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কুয়েত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- আল-খতিবুশ শারবিনি শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *মুগনিল মুহতাজ ইলা মারিফাতি মাআনি আলফাযিল মিনহাজ*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- শাফিয়ি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস, *আল-উম*, দারুল ফিকরি লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।
- শাওকানি, *আস-সাইলুল জারারুল মুতাদাফফিক আলা হাদায়িকিল আযহার*, দারু ইবনে হাযম, প্রথম সংস্করণ।
- শাইযারি, আবদুর রহমান ইবনে আবদিল্লাহ, *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক*, নিরীক্ষণ : আলি আবদুল্লাহ আল-মুসা, মাকতাবাতুল মানার, আয-যারকা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- তরতুশি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল অলিদ, *সিরাজুল মুলুক*, নিরীক্ষণ : জাফর আল-বায়াতি, রিয়াদুর রইস লিল-কুতুবি ওয়ান-নাশরি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- কারাফি, শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে ইদরিস, *আয-যাখির*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ হাজ্জি, দারুল গারবি, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি.।
- কালয়ি, আবু আবদুল্লাহ, *তাহযিবুর রিয়াসা ওয়া তারতিবুস সিয়াসা*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইউসুফ মুস্তাফা আজউ, মাকতাবাতুল মানার, প্রথম সংস্করণ, জর্দান।
- কাসানি, আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল-হানাফি, বাদায়িউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

- কাত্তানি, আবদুল হাই, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা ফি নিযামিল হুকুমাতিন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : ইমাদুদ্দিন খলিল, মারকাযুর রায়াহ লিত-তানমিয়াতিল ফিকরিয়্যা, দামেশক, ২০০৫ খ্রি.।
- মাওয়ারদি, আবুল হাসান আলি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.।
- মাওয়ারদি, *আদাবুল কাযি*, নিরীক্ষণ : মুহি হিলালুস সারহান, মাতবাআতুল ইরশাদ, প্রথম সংস্করণ, বাগদাদ, ১৯৭১ খ্রি.।
- মাওয়ারদি, আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবিব, *আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দিন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৭ হি./১৯৭৮ খ্রি.।
- নিযামুল মুলুক, হুসাইন আত-তুসি, *সিয়াসাতনামা আও সিয়ারুল মুলুক*, নিরীক্ষণ : ইউসুফ হুসাইন বাক্কার, দারুস সাকাফা, কাতার, ১৪০৭ হি.।
- নববি, মুহিউদ্দিন ইবনে শারাফ, *আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব লিশ-শিরাযি*, নিরীক্ষণ, টীকা সংযুক্তি ও অসমাপ্ত অংশটুকুর সমাপ্তি : মুহাম্মাদ নজিব আল মুতিয়ি, মাকতাবাতুল ইরশাদ, জিদ্দা।

একাদশ : সাধারণ উৎসগ্রন্থসমূহ

- ইবরাহিম আন-নাজ্জার, *আল-ফাননুল ইসলামি ওয়া আসারুহু আলাত-তাজরিদ ফিত-তাসবিরিল আরাবিয়্যিল মুয়াসির*, (তুলনামূলক পর্যালোচনা) পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, শিল্পকলা অনুষদ, ফটোগ্রাফি বিভাগ, হুলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭ খ্রি.।
- ইবরাহিম হারাকাত, *আন-নিযামুস সিয়াসিয়্যু ওয়াল-হারবিয়্যু ফি আহদিল মুরাবিতিন*, মাকতাবাতুল ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যা, আদ দারুল বাইযা, (মুদ্রণ তারিখ উল্লেখ নেই)।
- ইবরাহিম আলি আল-কাল্লা, *নিযামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা*, দারুন নাশরুদ দুয়ালিয়্যি, প্রথম সংস্করণ, সৌদি আরব, ২০০৩ খ্রি.।

- ইবরাহিম মাদকুর, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৬৮ খ্রি.।
- ইবনুল হাইসাম, আবু আলি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-মিসরি, *আল-মানাজির*, নিরীক্ষণ : ড. আবদুল হামিদ সবরুহু, আল-মাজলিসুল ওয়াতানি লিস-সাকাফাতি ওয়াল-ফুনুনি ওয়াল-আদাবি, ১৯৮৩ খ্রি.।
- ইবনে হাযম, *রসায়িলু ইবনে হাযম*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, আল-মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশরি, ২০০৭ খ্রি.।
- ইবনে রুসতা, আহমাদ ইবনে উমর, *আল-আ'লাকুন নাফিসা*, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রি.।
- ইবনে সিনা, *আল-কানুন ফিত-তিব*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আদ-দান্নাওবি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রি.।
- ইবনে আবদুল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি*, নিরীক্ষণ : ফাওয়াজ আহমাদ যামারলি, দারু ইবনে হাযম, প্রথম সংস্করণ।
- আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাযলুহু আলাল ইনসানিয়্যা*, দারু ইবনে কাসির, দামেশক, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, ১৪১০ হিজরি/১৯৯০ খ্রি.।
- আবুল আলা আফিফি, *আত-তাসাউফ : আস-সাওরাতুর রুহিয়্যা ফিল-ইসলাম*, দারুশ শাব, বৈরুত, (মুদ্রণ তারিখ উল্লেখ নেই)।
- আবুল ওয়াফা তাফতাজানি, *দিরাসাত ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুল কাহিরা আল-হাদিসা, কায়রো, ১৯৯৪ খ্রি.।
- আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, একাদশ সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৫ হিজরি/২০০৪ খ্রি.।

- এটিয়েন ডিনেট, *মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ*, অনুবাদ, আবদুল হালিম মাহমুদ, দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- ইহসান আব্বাস, শাযারাত মিন কুতুবিন মাফকুদাহ, দারুল গারবিল ইসলামিয়্যি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.।
- আহমাদ আহমাদ গালওয়াশ, *আন-নিযামুস সিয়াসিয়্যু ফিল-ইসলাম*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।
- আহমাদ আমিন, দুহাল ইসলাম, *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৭ খ্রি.।
- আহমাদ আমিন, *ফাজরুল ইসলাম*, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৬২ খ্রি.।
- আহমাদ দারবিশ, *নাযরিয়্যাতুল আদাবিল মুকারান ওয়া তাজালিয়্যাতুহা ফিল-আদাবিল আরাবি, দারু গারিবুন লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি*, কায়রো, ২০০২ খ্রি.।
- আহমাদ যাকি বাদাবি, *মুসতলাহাতির রিয়ায়াতি ওয়াত-তানমিয়াতিল ইজতিমাইয়্যা*, দারুল কিতাবিল লুবনানি, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ২০০১ খ্রি.।
- আহমাদ শালবি, *তারিখুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, পঞ্চম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৪ খ্রি.।
- আহমাদ শালবি, *মুকারানাতুল আদয়ান*, দারুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আহমাদ শালবি, *মাওসুআতুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা*, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৯৩ খ্রি.।
- আহমাদ আদিল কামাল, আতলাসু তারিখিল কাহেরা, দারুল সালাম, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ২০০৪ খ্রি.।

- আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, দারুল ফিকরিল আরাবিয়্যি, কায়রো, ২০০২ খ্রি.।
- আহমাদ ফরিদ আল-মাজিদি, *রসায়িলু জাবির ইবনে হাইয়ান ওয়া সালাসুনা কিতাবান ওয়া রিসালাতান ফিল-কিমিয়া ওয়াল-ইকসির ওয়াল-ফালাকি ওয়াত-তবিয়াতি ওয়াল-হাইয়াতি ওয়াল ফালসাফাতি ওয়াল-মানতিকি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৬ খ্রি.।
- আহমদ ফিকরি : *ফিল-ইমারাতি ওয়াত তুহাফিল ফান্নিয়্যা*, পরিচ্ছেদ, আসারুল আরব ওয়াল ইসলাম ফিন নাহদাতিল উরুবিয়্যা আল হাদিসা, তত্ত্বাবধান, মারকাযু কিয়ামিল সাকাফিয়্যা ও ইউনেসকো আল হাইয়াতুল আম্মা লিল কিতাব, কায়রো ১৯৮৭।
- আহমাদ মাহমুদ শাকের, *আল-বায়িসুল হাসিস শরহু ইখতিসারি উলুমুল হাদিস লি-ইবনে কাসির*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮২ খ্রি.।
- আহমাদ মুখতার উমর, *আল-বাহসুল লুগাবি ইনদাল আরব*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৭১ খ্রি.।
- আহমাদ ইউসুফ আল-হাসান, *তাকিউদ্দিন ওয়াল-হানদাসাতুল মিকানিয়্যাতু মাআ কিতাবি আত-তুরুকুস সানিয়্যা ফিল-আলাতির রুহানিয়্যা মিনাল-কারনিস সাদিসু আশারা*, হালাব বিশ্ববিদ্যালয়, মাআহাদুত তুরাসিল ইলমিয়্যিল আরাবিয়্যি, ১৯৭৬ খ্রি.।
- ইখওয়ানুস সফা, *রসায়িলু ইখওয়ানুস সফা ওয়া খুল্লানুল ওয়াফা*, দারু সাদির, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.।
- ইখওয়ানুস সফা, *রসায়িলুল আসারিল উলবিয়্যা*, দারু সাদির, বৈরুত।
- অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যাতু ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরিয়্যি*, অনুবাদ, মুহাম্মাদ আবদুল হাদি আবি রিদা, মাতবাআতু লাজনাতিত তালিফি ওয়াত-তরজামাতি ওয়ান-নাশরি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৩৭৭ হি./১৯৫৭ খ্রি.।

- এডওয়ার্ড ফেনডেক, *ইকতিফাউল কানু বিমা হুয়া মাতবু*, তাসহিহু মুহাম্মাদ আল-বাবলাবি, দারু সাদির, বৈরুত।
- আর্থার ক্রিস্টেনসেন, *ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন*, অনুবাদ, ইয়াহইয়া আল-খাসসাব, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, ২০০৬ খ্রি.।
- ইরিক ভোন ডানিকে, *আরাবাতুল আলিহাতি*, অনুবাদ ও নিরীক্ষণ, আদনান হাসান, দারুল মাদা লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, দামেশক, ১৯৯৫ খ্রি.।
- ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি ও লুস লামিয়া আল-ফারুকি, *আতলাসুল হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুল উবাইকান, রিয়াদ, ১৯৯৮ খ্রি.।
- আকরাম জিয়া আল-উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদা*, মাকতাবাতুল উবিকান, রিয়াদ।
- আকরাম আবদুল ওয়াহহাব, *মিয়াতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াযহাল আলাম*, দারুত তলায়ি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, ২০০০ খ্রি.।
- আকমালুদ্দিন ইহসান উগলি, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যা তারিখ ওয়া হাদারা*, অনুবাদ, সালেহ সাইদাবি, মারকাযুল আবহাসি লিত-তারিখি ওয়াল-ফুনুনি ওয়াস-সাকাফাতিল ইসলামিয়্যা, ইস্তাম্বুল, ১৯৯৯ খ্রি.।
- অ্যালেক্সিস ক্যারেল, *আল-ইনসান যালিকাল মাজহুল*, অনুবাদ, শফিক আসাদ ফরিদ, মুয়াসসসাতুল মাআরিফ লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, ২০০৩ খ্রি.।
- আমিন ইউসুফ ও আলি হুসাইন আন-নাহবান, *আশহারু মুহাকামাতিত তারিখ*, দারুত তুরাস, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রি.।
- আনওয়ার আল-জুনদি, *বিমাযা ইনতাসারাল মুসলিমুন*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

- আনওয়ার আল-জুনদি, *মুকাদ্দিমাতুল উলুম ওয়াল-মানাহিজ*, মুহাওয়াতুন লিবিনায়ি মানহাজিন ইসলামিয়্যিন মুতাকামিলিন, দারুল আনসার, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৯ খ্রি.।
- আনওয়ার আর-রিফায়ি, *আল-ইনসানুল আরাবি ওয়াল-হাদারাহ*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- ইনাস হুসনি, *আসারুল ফন্নিল ইসলামিয়্যি আলাত তাসবিরি ফি আসরিন নাহযাতি*, দারুল যিল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৫ খ্রি.।
- বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবুল হিয়াল*, নিরীক্ষণ, আহমাদ ইউসুফ আল হাসান ও অন্যান্যরা, মাআহাদুত তুরাসিল ইলমিয়্যিল আরাবিয়্যি, ১৯৮১ খ্রি.।
- বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবু মারিফাতি মাসাহাতিল আশকাল*, পরিমার্জন, নাসিরুদ্দিন তুসি, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, প্রথম সংস্করণ, হিন্দ, ১৩৫৯ হি.।
- আল-বিরুনি, *তাহকিকু মা লিল হিন্দি মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল-আকলি আও মারযুলাতিন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৩ খ্রি.।
- আল-বিরুনি, আবু রায়হান *তাহদিদু নিহায়াতিল আমাকিন লিতাসহিহি মাসাফাতিল মাসাকিন*, জামেউল ফাতেহ ইস্তাম্বুলের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থটিকে প্রাচ্যবিদ ক্রেনকো একটি স্মরকগ্রন্থ উপস্থাপন করেন।
- বায়ুমি ইসমাইল, *আন-নুযুমুল মালিয়্যাতুয়্য ফি মিসর ওয়াশ-শামি যমানা সালালিতিনিল মামালিক*, আল-হাইয়াতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যাতু লিল-কিতাব, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- তাওফিক ইউসুফ আলওয়ায়ি, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা মুকারানাতান বিল-হাদারাতিল গারবিয়্যা*, মাকতাবাতুল মানারিল ইসলামিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কুয়েত, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

- টমাস আর্নল্ড, *আদ-দাওয়াতু ইলাল ইসলাম*, আনুবাদ, হাসান ইবরাহিম হাসান ও অন্যান্যরা, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৮০ খ্রি.।
- সারওয়াত উকাশা, *আল-কিয়ামুল জামালিয়্যা ফিল-ইমারাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, মিশর।
- জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাবুত তাজরিদ*, গ্রন্থটিকে হুলিয়াম কর্তৃক অনূদিত ও নিরীক্ষণকৃত 'মুসান্নাফাত ফি ইলমিল কিমিয়া লিল হাকিম জাবের বিন হাইয়ান'- এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্যারিস, ১৯২৮ খ্রি.
- জ্যাক রেসলার, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, অনুবাদ, গুনিম আবদুন, আদ-দারুল মিসরিয়্যা লিত-তালিফ ওয়াত-তরজমা।
- জাফর আবদুস সালাম, *নিযামুদ দাওলা ফিল-ইসলাম*, রাবিতাতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যা, কায়রো, ২০০২ খি.।
- জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৭৪ খ্রি.।
- প্রাচ্যবিদদের একটি দল, থমাস অর্নল্ড। তুরাসুল ইসলাম, জারজিস ফাতহুল্লাহ, দারুত তলিয়া, দ্বিতীয় প্রকাশনা।
- জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, দারুস সাকি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- জর্জ সার্টন, *তারিখুল ইলম*, অনুবাদ, ইবরাহিম বাইয়ুমি মাদকুর ও অন্যান্যরা, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৯১ খ্রি.।
- গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, অনুবাদ, আদিল যায়িতার, মাতবাআতু ঈসা আলবাবি আল-হালাবি।
- হামেদ তাহের, *মাদখাল লিদিরাসাতিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যাতি*, হাজার লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, কায়রো, ১৯৮৫ খ্রি.।
- হাসসান শামসি পাশা, *হাকাযা কানু ইয়াওমা কুন্না*, দারুল মানার, জেদ্দা, আল-মামলাতুল আরাবিয়্যাতুস সুয়ুদিয়্যা।

- আল-হাসান আস-সায়িহ, *আল-হাদারাতুল মাগরিবিয়্যা*, মাতবা'তুন নাজাহিল জাদিদা, প্রথম সংস্করণ, আদ-দারুল বাইযা, ১৯৯৬ খ্রি.।
- হাসান আস-সাআতি, *ইলমুল ইজতিমায়িল খালদুনি*, দারুল মাআরিফ, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭২ খ্রি.।
- হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, *আসারুল উওয়াল ফি তারতিবিদ দুওয়াল*, মাতবাআতু বুলাক, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯২৫ খ্রি.।
- হাসান আবদুল আল, আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি, দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত ১৯৭৮ খ্রি.।
- হাসান আলি হাসান, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-মাগরিব ওয়াল-উন্দুলুস আসরুল মুরাবিতিন ওয়াল-মুওয়াহহিদিন*, মাকতাবাতুল খানজি, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৮০ খ্রি.।
- হুসাইন মুনিস, আতলাসুত তারিখিল ইসলাম, আজযাহরা লিল ইলামিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪০৭ হি., ১৯৮৭ খ্রিঃ।
- হুসাইন মুনিস, *মাওসুআতু তারিখিল উন্দুলুস*, মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দ্বীনিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৭হি./২০০৬ খ্রি.।
- হিকমত আবদুল কারিম ফারিহাত ও ইবরাহিম ইয়াসিন আল-খতিব, *মাদখাল ইলা তারিখিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুশ শুরুক, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ২০০০ খ্রি.।
- খালেদ আহমাদ হারবি, *উলুমু হাদারাতিল ইসলাম ওয়া দাওরুহা ফিল-হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, ওজারাতুল আওকাফিল কাতারিয়্যা, দোহা, ২০০৪ খ্রি.।
- খাদিজা আন-নাবরাবি, *মাওসুআতু হুকুকিল ইনসান ফিল-ইসলাম*, দারুস সালাম, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- খিজির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি দাওরিল আব্বাসিয়্যিন*, দারুল ইশআ লিত-তিবাআ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো।

- ড্যানিয়েল ব্রিফল্ট, *নাশআতুল ইনসানিয়্যা*, অনুবাদ, সুহাইল হাকিম, ওজারাতুস সাকাফাতিস সুরিয়া, দামেশক।
- ডোলান্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা লাবিনাতুন আসাসিয়্যা ফি সারহি হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, অনুবাদ, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, সিলসিলাতু আলমিল মারিফা।
- ডোলান্ড হিল, জাযারি রচিত 'আল জামে বাইনাল ইলমি ওয়াল আমাল আল নাফি ফি সিনায়াতিল হিয়াল' এর অনুবাদ।
- ভেটার মেসনার, *আল হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সম্পাদনা, সালমা আল জাইয়ুছি। মারকাযু দিরাসাতিল ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রি.।
- Dionysius, Richardhitch Cock : *আত তাছিরুল আরাবি ফিল-উসুরিল উসতা*, অনুবাদ, কাসেম আবদুহু কাসেম। গ্রন্থটিতে মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আর-রাযি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া, *আল-হাবি ফিত-তিব*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৪২২ হি./২০০৬ খ্রি.।
- রাগিব সারজানি, *কিসসাতুত তাতার মিনাল-বিদায়াতি ইলা আইনি জালুত*, মুয়াসসাসাতু ইকরা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.।
- রিবহি মুস্তাফা ইলাইয়ান, *আল-মাকতাবাত ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, দারু সফা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, জর্দান, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।
- রিহাব আকাবি, মুহাম্মাদ আমিন ফারসুখ, *মাওসুআতুল আবাকিরাতুল ইসলাম*, দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো, ১৯৯৬ খ্রি.।
- রহিম কাযেম মুহাম্মাদ আল-হাশেমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, আদ-দারুল মিসরিয়্যাতুল লুবনানিয়্যা, (মুদ্রণ তারিখ উল্লেখ নেই)।

- রজার জারুদি, *মিন আজাল্লি হিওয়ারিন বাইনাল হাদারাত*, অনুবাদ- যুকান কারকুত, দারুন নাফায়িস, বৈরুত, ১৯৯০ খ্রি.।
- জাহরানি, আলি মুহাম্মাদ, *নিযামুল ওয়াকফি ফিল-ইসলাম হাত্তা নিহায়াতিল আসরিল আব্বাসিল আওয়ালি*, পিএইচডি থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, ১৪০৭ হি.।
- সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, জার্মান থেকে আরবিতে অনুবাদ, ফারুক বাইযুন, দারু সাদির, দশম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।
- সামেরায়ি, *আল-মুআসসাসাতুল ইদারায়িয়্যা ফিদ-দাওলাতিল আব্বাসিয়্যা*, মাকতাবাতুল ফাতহ, দামেশক, ১৯৭১ খ্রি.।
- সাদ যাগলুল আবদুল হামিদ ও আহমাদ মুখতার আল-ইবাদি, *দিরাসাতুন ফি তারিখিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, জাতুস সালাসিল, কুয়েত, ১৯৮৬ খ্রি.।
- সাইদ আহমাদ হাসান, *আনওয়াউল মাকতাবাত ফিল-আলামাইন আল-আরাবি ওয়াল-ইসলামি*, দারুল ফুরকান লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, জর্দান, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।
- সুলাইমান ইবনে আবদুর রহমান আল-কিল, *হুকুকুল ইনসান ফিল-ইসলাম*, মাতবাআতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়্যা, সৌদি আরব, ১৯৯৭ খ্রি.।
- সানহুরি, আবদুর রাযযাক আহমাদ, *ফিকহুল খিলাফাতি ওয়া তাতাওয়ুরুহা লিতুসবিহা উসবাতা উমামিন শারকিয়্যাতিন*, নিরীক্ষণ : তাওফিক মুহাম্মাদ আশশাবি ও নাদিয়া আবদুর রাযযাক আস-সানহুরি, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- সুহাইল হুসাইন আল-কাতলাবি, *দাবলুমাসিয়্যাতুন নাবিয়্যি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিরাসাতুন মুকারানাতুন বিল-কানুনিদ দুওয়ালিয়্যিল মুআসির*, দারুল ফিকরিল আরাবিয়্যি, ২০০১ খ্রি.।

- সিডিও, *তারিখুল আরাবিল আম*, অনুবাদ, আদিল যা'য়িতা, দারুল ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৬৯ খ্রি.।
- শাহিন মেকারিওস, *তারিখু ইরান*, দারুল আফাকিল আরাবিয়্যা, কায়রো, ২০০৩ খ্রি.।
- শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, দারুল ফিকরিল মুআসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, দামেশক, ২০০২ খ্রি.।
- সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, দারুল কলম, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯০ খ্রি.।
- সালেহ ইবনে আবদুর রহমান হুসাইন, *আল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাতু বাইনা মানহাজিল ইসলাম ওয়াল মানহাজিল হাদারিয়্যিল মুআসির*, মাকতাবাতুল উবিকান, প্রথম সংস্করণ, রিয়াদ, ২০০৮ খ্রি.।
- সুবহি সালেহ, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা নাশআতুহা ওয়া তাতওয়ুরুহা*, দারুল ইলম লিল-মালায়িন, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.।
- যাফের কাসেমি, *আল-জিহাদ ওয়াল-হুকুকুল দুওয়ালিয়্যা ফিল-ইসলাম*, দারুল ইলম লিল-মালায়িন, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকম ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামিয়্যি*, দারুন নাফায়িস, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।
- আমের আন-নাজ্জার, *তারিখুত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৯৪ খ্রি.।
- আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, *আল-আমালুল কামিলা*, দারুল কিতাব, বৈরুত।

- আবদুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলম ওয়া দওরুল উলামায়িল আরব ফি তাকাদ্দুমিহি*, দারুল মাআরিফ, দশম সংস্করণ, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- আবদুল হামিদ সবরুহ, *আবকারিয়্যাতুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা মানবাউন নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পরিমার্জন, আর.বি বিনদার, আদ-দারুল জামাহিরিয়্যা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি ওয়াল ইলান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.।
- আবদুল হাই যালুম, *ইমবারাতুরিয়্যাতুশ শাররিল জাদিদা আল-ইরহাবুদ দুওয়ালিয়্যু দিদদাল ইসলাম*, আল-মুআসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশরি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.।
- আবদুর রহমান হাসান হানবাকাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, দারুল কালম, প্রথম সংস্করণ, দামেশক, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- আবদুর রহমান হামিদা, *আলামুল জুগরাফিয়্যিনিল আরব ওয়া মুকতাতফাতুন মিন আসারিহিম*, দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, দামেশক, ১৯৮৪ খ্রি.।
- আবদুর রহমান আমিরা, *আল-ইসতিরাতিজিয়্যাতুল হারবিয়্যাহ ফি ইদারাতিল মাআরিক ফিল-ইসলাম*, আল-হাইআতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- আবদুল আল আহমাদ আবদুল আল, *আত-তাকাফুলুল ইজতিমায়ি ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, দারু হিবাতিন নিল, কায়রো, ১৯৯৫ খ্রি.।
- আবদুল আযিয দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, মারকাজু দিরাসাতিল ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ২০০৮ খ্রি.।
- আবদুল গনি মাহমুদ আবদুল আতি, *আত-তালিমু ফি মিসরা যামানাল আইয়ুবিয়্যিনা ওয়াল-মামালিক*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৮৪ খ্রি.।

- আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রবিয়ি, *আসারুশ শারকিল ইসলামি ফিল-ফিকরিল উরুব্বি খিলালাল হুরুবিস সলিবিয়্যা*, রিয়াদ, ১৪১৫ হি.।
- আবদুল্লাহ উলওয়ান, *মাআলিমুল হাদারাহ ফিল-ইসলাম ওয়া-আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্যিয়্যাহ*, দারুস সালাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।
- আবদুল মুতি দালাতি, *রাবিহতু মুহাম্মাদ ওয়া-লাম আখসারিল মাসিহ*, দারুশ শিহাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.।
- আবদুল মুনয়িম নিমর, *আল-ইসলামু ওয়াল-মাবাদিউল মুসতাওরাদাহ*, দারুল কিতাবিল মিসরিল লুবনানি, কায়রো, ১৯৯৫ খ্রি.।
- আবদুল মুনয়িম সফউ, *তালিমুত তিব্বি ইনদাল আরব*, আবহাসুন নাদওয়াতিল ইলমিয়্যাহ লিল-জাময়িয়্যাতিস সুরিয়্যাহ লি-তারিখিল উলুম, দারুল জামিআ, আলেপ্পো, ১৯৮০ খ্রি.।
- আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, মাকতাবাতুল আনজালু, কায়রো, ২০০৪ খ্রি.।
- আবদুল হাদি তাযি, *আহাদা আশারা কারনান ফি জামিআতি কাযবিন*, মাতবাআতু ফুদালাতা আল মুহাম্মাদিয়্যা, ১৯৬০ খ্রি.।
- আবদুল হাদি মুহাম্মাদ রিদা, *নিযামুল মুলক আল-হাসান ইবনু আলি আত-তুসি কাবিরুল উযারা ফিল-উম্মাতিল ইসলামিয়্যা : দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ফি সিরাতিহি ওয়া-আহাম্মি আমালিহি খিলালা ইসতিযারিহি*, আদ-দারুল মিসরিয়্যাতুল লুবনানিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি, *দিরাসাতু মুকাদ্দিমাতি ইবনি খালদুন*, দারুন নাহদতি মিসরা, কায়রো, ১৯৫৬ খ্রি.।
- আবদুল ওয়াদুদ শালবি, *ফি মাহকামাতিত তারিখ*, দারুশ শুরুক, কায়রো, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

- আদদান খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, মাহাদুল বুহুস ওয়াদ-দিরাসাতিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৬ খ্রি.।
- আরনুস মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ, *তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম*, মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যা, কায়রো।
- আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়্যা*, অনুবাদ, আমিন তিবি, আদ-দারুল আরাবিয়্যা লিল-কিতাব, ১৯৮০ খ্রি.।
- আফিফ আবদুল ফাত্তাহ তইয়ারাহ, *রুহুদ্দীনিল ইসলামি*, দারুল ইলমি লিল-মালায়িন, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- ইকরিমা সায়িদ সাবরি, *আত-তামরিদু ফিত-তারিখিল ইসলামি*, দারুস সাকাফা, রামাল্লা, ফিলিস্তিন, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।
- ইকরিমা সায়িদ সাবরি, *আল-ওয়াকফুল ইসলামি বাইনান নাযরিয়্যাতি ওয়াত-তাতবিক*, দারুন নাফায়িস, প্রথম সংস্করণ, জর্ডান, ১৪২৮ হি./২০০৮ খ্রি.।
- আলি ইবনু আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমু বাহতাহ ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, মুআসসাসাতুর রিসালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৩ খ্রি.।
- আলি ইবনু আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িয়ুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, আলামুল কুতুব লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ, ১৯৯১ খ্রি.।
- আলি ইবনু আবদুল্লাহ দাফফা, *রুওয়াদু ইলমিত তিব্বি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- আলি ইবনু নায়িফ শাহুদ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া-আমালিল মুসতাকবাল*, মাজমুআতুম মিনাল আবহাসিল মুজাম্মাআহ লি-কিবারি আসাতিযাতিত তারিখ ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা।
- আলি সামি নাশশার, *নাশআতুল ফিকরিল ফালসাফি ফিল-ইসলাম*, দারুল মাআরিফ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৫ খ্রি.।

- আদ দাওলাতুল উমাবিয়্যা আওয়ামিলুল ইযাদিহার ওয়া তাদাইয়া-তুল ইনহিয়ার, মুআসসাসা ইকরা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৬ হি. ২০০৫ খ্রি.
- আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহূদ ওয়া-আসবাবুস সুকুত*, দারুত তাওযি ওয়ান-নাশরিল ইসলামিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।
- আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল মুরাবিতিন*, দারুত তাওযি ওয়ান-নাশরিল ইসলামিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো।
- উমর আসআদ, *মাআলিমুল আরুদ ওয়াল-কাফিয়াহ*, মাকতাবাতুল উবিকান, তৃতীয় সংস্করণ, রিয়াদ, ১৯৯৬ খ্রি.।
- গানিম মুহাম্মাদ সালিহ, *আল-ফিকরুস সিয়াসিয়্যুল কাদিমু ওয়াল-ওয়াসিত*, জামিআতু বাগদাদ, বাগদাদ, ১৯৮৮ খ্রি.।
- ফুয়াদ সুযকিন, *তারিখুত তুরাসিল আরাবি*, মাকতাবাতু দারিয যামান, মদিনা মুনাওয়ারা।
- ফারুক মাজদালাবি, *আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যা ফি আহদি উমার ইবনিল খাত্তাব*, রাওয়ায়িয়ু মাজদালাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, লেবানন, ১৪১১ হি./১৯১১ খ্রি.।
- ফাতহিয়্যাতুন নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল ফিকরিল আরাবি, চতুর্দশতম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.।
- ফ্রাঞ্জ রোসেনথাল, *ইলমুত তারিখ ইনদাল মুসলিমিন*, অনুবাদ, সালিহ আহমাদ আলি, মুআসসাসাতুর রিসালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।
- ফোরবস সি. জি. এবং ডিকেসটরহুজ এ. জি., *তারিখুল ইলমি ওয়াত-তিকনুলুজিয়া*, আরবি অনুবাদ, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ১৯৬৬ খ্রি.।
- ফাও[illegible] আহমুদ, *মা[illegible]লাতুন ফি আসালাতিল ফিকরিল মুসলিম*, দা[illegible] আর[illegible]৭৬ খ্রি.।

- কাসিম আবদুহু কাসিম, *আর-রুয়াতুল হাদারিয়্যাহ লিত-তারিখ*, দারুল মাআরিফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো।
- কাদরি হাফিজ তুকান, *আল-উলুমু ইনদাল আরব*, মাকতাবাতু মিসর, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- কাদরি হাফিজ তুকান, *উলামাউল আরব ওয়া-মা আতাওহু লিল-হাদারাহ*, দারুল কিতাব আরাবি।
- কাদরি তুকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, দারুশ শুরুক, কায়রো।
- কাদরি তুকান, *মাকামুল আকলি ইনদাল আরাব*, আল-মুআসসাসাতুল আরাবিয়্যা লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশর, বৈরুত।
- কুসাই হুসাইন, *মিন মাআলিমিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, আল-মুআসসাসাতুল জামিয়িয়্যাহ লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- কুতব মুস্তাফা সানু, *আন-নুযুমুত তালিমিয়্যাতুল ওয়াফিদাহ ফি ইফরিকিয়া-কিরাআতুন ফিল-বাদিলিল হাদারি*, ওয়াযারাতুল আওকাফি ওয়াশ-শুউনিল ইসলামিয়্যা, দুহা, ১৪১৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.।
- ক্র্যাচকোভ্স্কি, *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবিয়্যি*, অনুবাদ, সালাহুদ্দিন হাশিম, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮৭ খ্রি.।
- কামাল ইনানি ইসমাইল, *দিরাসাতুন ফি তারিখিন নুযুমি ওয়াল-হাদারাহ*, দারুল আন্দালুস লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, হায়েল সৌদি আরব ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।
- কিনদি আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইসহাক, *রাসায়িলুল কিনদিয়্যিল ফালসাফিয়্যাহ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল হাদি আবু রিদাহ, দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো, ১৯৫০ খ্রি.।
- আবদুল্লাহ মাশুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, মাকতাবাতুল মানার, জর্ডান, ১৪০৩ হি.।

- লথ্রোপ স্টোডডার্ড, *হাদিরুল আলামিল ইসলামি*, অনুবাদ, আজাজ নুওয়াইহিদ, টীকা : শাকিব আরসালান, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- সফিউর রহমান মুবারকপুরি, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, দারুল ওয়াফা, মানসুরা, সতেরোতম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *আল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যা ফিল-ইসলাম*, দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *মুহাদারাতুন ফিল-ওয়াকফ*, দারুল ফিকরিল আরাবি, নসর, কায়রো, ১৪২৫ হি., ২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আহমাদ ইসমাইল মুকাদ্দাম, *আল-মারআতু বাইনা তাকরিমিল ইসলামি ওয়া-ইহানাতিল জাহিলিয়্যা*, দারুল ঈমান, ২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আসাদ, *আল-ইসলাম আলা মুফতারাকিত তুরুক*, অনুবাদ, উমর ফাররুখ, দারুল ইলমি লিল-মালায়িন, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ দুসুকি, *আল-ওয়াকফু ওয়া-দাওরুহু ফি তানমিয়াতিল মুজতামায়িল ইসলামি*, সিরিজ : কাদায়া ইসলামিয়্যা, সংখ্যা : ৪৬, প্রকাশক : আল-মাজলিসুল আলা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়্যা, প্রথম অংশ, মুহাম্মাদ যুহাইলি, তারিখুল কাদা ফিল-ইসলাম, দারুল ফিকর, দ্বিতীয় সংস্করণ, দামেশক, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *আল-ইসলামু ওয়াল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যা*, দারুর রায়িদিল আরাবি, বৈরুত।
- মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৭৭ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ গাযালি, *খুলুকুল মুসলিম*, দারুর রাইয়ান, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ গাযালি, রাকায়িযুল ঈমান বাইনাল আকলি ওয়াল-কালব, দারুশ শুরুক, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।

- মুহাম্মাদ মুখতার সুসি, *সুসুল আলিমাহ*, মাতবাআতু ফুদালাতাল মুহাম্মাদিয়্যা, ১৯৬০ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ মুখতার সুসি, *মাদারিসু সুসিল আতিকাহ*, তবআতু তনজাহ, মরক্কো (প্রকাশকাল ও সংস্করণ নম্বর অজ্ঞাত)।
- মুহাম্মাদ মানুনি, *হাদারাতুল মুওয়াহহিদিন*, দারু তুবকাল, প্রথম সংস্করণ, আদ-দারুল বাইদা, ১৯৮৯ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সালিহ, *হুকুকুল ইনসান ফিল-কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ ওয়া-তাতবিকাতুহা ফিল-মামলাকাতিল আরাবিয়্যাতিস সুয়ুদিয়্যা*, ওযারাতুল আওকাফ সৌদি আরব, ২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ ইবনু উসমান হাশায়িশি, *তারিখু জামিয়িয যাইতুনাহ*, নিরীক্ষণ : জিলানি ইবনু আলহাজ ইয়াহয়া, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮২ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাসিনাহ, *আদওয়াউন আলা তারিখিল উলুমি ইনদাল মুসলিমিন*, দারুল কিতাবিল জামিয়ি, প্রথম সংস্করণ, আল আইন (সংযুক্ত আরব-আমিরাত), ২০০১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ রশিদ রেজা, *আল-খিলাফা*, আয-যাহরাউ লিল ইলামিল আরাবি, কায়রো (প্রকাশকাল ও সংস্করণ নম্বর অজ্ঞাত)।
- মুহাম্মাদ রাওয়াস কালআজি ও হামিদ সাদিক কুনাইবি, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, দারুন নাফায়িস, বৈরুত।
- মুহাম্মাদ দইফুল্লাহ বাত্তানিয়্যাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, দারুল ফুরকান, প্রথম সংস্করণ, জর্ডান, ২০০২ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *আল-আসারুল আন্দালুসিয়্যাতুল বাকিয়াহ ফি আসবানিয়া ওয়াল-বুরতুগাল*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৬১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবদুল মুনয়িম খাফাজি ও আবদুল আযিয শারাফ, *আল-উসুলুল ফান্নিয়্যাহ লি-আওযানিশ শিরিল আরাবি*, দারুল জিল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।

- মুহাম্মাদ আবদুহু, আল-ইদতিহাদ ফিন-নাসরানিয়্যাতি ওয়াল-ইসলাম, প্রবন্ধ : *মাজাল্লাতুল মানার*, পঞ্চম খণ্ড।
- মুহাম্মাদ আলি শাওয়াবিকাহ ও আনওয়ার আবু সুওয়াইলিম, *মুজামু মুসতালাহাতিল আরুদি ওয়াল-কাফিয়া*, দারুল বাশির, ওমান, ১৯৯১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আলি উসমান, *মুসলিমান আল্লামুল আলাম*, মাকতাবাতু মারুফ, কায়রো।
- মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, মাতবাআতু লাজনাতুত তালিফ ওয়াত-তারজামাহ ওয়ান-নাশর, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৬৮ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ মাহির হাম্মাদাহ, *আল-মাকতাবাতু ফিল-ইসলাম*, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৯৭৮ খ্রি.।
- মাহমুদ ইবরাহিম সাদানি, *মাআলিমু তারিখি রুমাল কাদিম*, আদ-দারু দুওয়ালিয়্যা লিল-ইসতিসমারাতিস সাকাফিয়্যা, ২০০৭ খ্রি.।
- মাহমুদ আলহাজ কাসিম, *আত-তিব্বু ইনদাল আরাবি ওয়াল-মুসলিমিনা : তারিখুন ওয়া-মুসামাহাতুন*, আদ-দারুস সুয়ুদিয়্যা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, জেদ্দা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- মাহমুদ তহহান, *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস*, মারকাযুল হুদা লিদ-দিরাসাত, সপ্তম সংস্করণ, ১৪০৫ হি.।
- মাহমুদ হামদি যাকযুক, আল-ইনসানু খালিকাতুল্লাহু : আত-তাফকিরু ফারিদাতুন, প্রবন্ধ : *জারিদাতুল আহরাম*, পয়লা রমজানসংখ্যা, ১৪২৩ হি./নভেম্বর ২০০২।
- মাহমুদ হামদি যাকযুক হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফী মুওয়া-জাহাতি হামালাতিল আশকিক, সুপ্রীম কাউন্সিল ফর ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স কায়রো।
- মাহমুদ শালতুত, *আল-ইসলামু আকিদাতান ওয়া-শারিআতান*, দারুশ শুরুক, কায়রো।

- মাহমুদ মুহাম্মাদ হুওয়াইরি, *রুয়াতুন ফি সুকুতিল ইমবারাতুরিয়্যাতির রুমানিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, তৃতীয় সংস্করণ, মিশর, ১৯৯৫ খ্রি.।
- মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, দারুল ওয়াররাক ও দারুস সালাম, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- মুস্তাফা শাকআ, *আল-আয়িম্মাতুল আরবাআ*, দারুল কিতাবিল মিসরি, চতুর্থ সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- মুস্তাফা শাকআ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া-নাযারিয়্যাতিহ*, দারুল কুতুবিল হাদিসাহ।
- মুস্তাফা শাকআ, *মাআলিমুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল ইলমি লিল-মালায়িন, লেবানন, ১৯৮৮ খ্রি.।
- ম্যাক্সিম রোডিনসন, *আস-সুরাতুল গারবিয়্যাহ ওয়াদ-দিরাসাতুল গারবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, এটি তুরাসুল ইসলাম গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ তত্ত্বাবধান : শাখত ও বসওয়ার্থ অনুবাদ, হুসাইন মুনিস ও অন্যান্য, কুয়েত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- মানসুর যাবিদ মাতিরি, *আস-সিয়াগাতুল ইসলামিয়্যা লি-ইলমিল ইজতিমা : আদ-দাওয়ায়ি ওয়াল-ইমকান*।
- মানসুর মুহাম্মাদ সারহান, *আল-মাকতাবাতু ফিল-উসুরিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতু ফাখরাবি, ১৯৯৭ খ্রি.।
- মুনির আজলানি, *আবকারিয়্যাতুল ইসলাম ফি উসুলিল হুকম*, দারুন নাফায়িস লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.।
- মুনির হাসান আবদুল কাদির, *মুআসসাসাতু বাইতিল মাল ফি সাদরিল ইসলাম*, পিএইচডি থিসিস, দেশীয় সম্পর্ক অনুষদ, ফিলিস্তিন, ২০০৭ খ্রি.।
- *এনসাইক্লো পিডিয়া অব ব্রিটানিকা*, একাদশতম সংস্করণ।
- *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ*, ইলেকট্রনিক ডিজিটাল সংস্করণ, সৌদি আরব, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

- *মাওসুআতুল মাওরিদিল হাদিসাহ* (১৯৯৫ খ্রি.)।
- *আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল-আদয়ানি ওয়াল-মাযাহিবি ওয়াল-আহযাবিল মুআসিরাহ*, প্রস্তুত : আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ-শাবাবিল ইসলামি।
- মন্টেগোমারি ওয়াট, *ফাদলুল ইসলাম আলাল হাদারাতিল গারবিয়্যাহ*, আরবি অনুবাদ, হুসাইন আহমাদ আমিন, দারুশ শুরুক, কায়রো।
- নাজি যাইনুদ্দিন, *মুসাওয়ারুল খাত্তিল আরাবি*, মাকতাবাতুন নাহদাহ, বাগদাদ, ১৯৬০ খ্রি.।
- নাদিয়া হুসনি সকর, *আল-ইলমু ওয়া মানাহিজুল বাহসি ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.।
- নাসির আনসারি, *তারিখু আনজিমাতিশ শুরতাহ ফি মিসর*, দারুশ শুরুক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.।
- নাজিব আকিকি, *আল-মুসতাশরিকুন*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- নুমান আবদুর রাযযাক সামিরায়ি, *নাহনু ওয়াল-হাদারাতু ওয়াশ-শুহুদ*, কিতাবুল উম্মাহ, কাতার, ২০০১ খ্রি.।
- নিকুলা যিয়াদাহ, *আল-হিসবাতু ওয়াল-মুহতাসিব ফিল-ইসলাম*, বৈরুত, ১৯৬৩ খ্রি.।
- হানি মুবারক ও শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, দারুল ফিকর, দামেশক, ১৯৯৬ খ্রি.।
- ওয়াহিদুদ্দিন খান, *আল-ইসলামু ইয়াতাহাদ্দা*, মুআসসাসাতুর রিসালা।
- *আল-মাওসুআতুল ইসলামিয়্যাতুল আম্মাহ*, ওযারাতুল আওকাফিল মিসরিয়্যা।

- উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, অনুবাদ, যাকি নাজিব মাহমুদ ও অন্যান্য, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- উইল ডুরান্ট, *মাবাহিজুল ফালসাফা*, অনুবাদ, আহমাদ ফুয়াদ আহওয়ানি, মাকতাবাতুল আনজলুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৫৫ খ্রি.।
- ইয়াহয়া হুওয়াইদি, *মুকাদ্দিমাতুন ফিল-ফালসাফা*, দারুস সাকাফাতি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.।
- ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, আলামুল মারিফাহ, কায়রো, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।
- ইউসুফ ইশ, *তারিখু আসরিল আব্বাসিয়্যা*, দারুল ফিকরিল মুআসির লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, আল-ইসলাম হাদারাতুল গাদ, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্কারণ, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি : আল ওয়াল হায়াতু, মাকতাবাতু ওয়াহবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৮ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, *তারিখুনাল মুফতারা আলাইহ*, দারুশ শুরুক, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, *রিয়ায়াতুল বিআহ ফি শারিআতিল ইসলাম*, দারুশ শুরুক, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪২১ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, *মাদখারুন লি-মারিফাতিল ইসলাম*, মুআসসাসাতুর রিসালা, কায়রো।
- ইউসুফ কারযাবি, *মালামিহুল মুজতামায়িল মুসলিমিল্লাজি নানশুদুহ*, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৬ খ্রি.।

- জোহান হুয়িযিনগা, *ইদমিহলালুল উসুরিল উসতা*, অনুবাদ, আবদুল আযিয তওফিক, আল-হাইআতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যা লিল-কিতাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- জোহান ভেলার্জ, *কুনুযু ইলমিল ফালাক*, আল-মাতহাফুল কওমিয়্যুল আলমানি, নুরেমবার্গ, ১৯৮৩ খ্রি.।

দ্বাদশ : অন্যান্য ভাষার গ্রন্থপঞ্জি

- *A Survey of Indian History.*
- A. D. White: *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom.*
- *Emotions as The Basis of Civilization.*
- F. Yahya: *Inventaire archéologique des carvanserail de Damas*, Thèse dactylographiée, Aix-en-Provence, 1979.
- *The History of Decline and Fall of the Roman Empire.*
- Turan (Osman), Celâleddin Karatay, *Vkiflari ve Vakfiyeleri,* Belleten, cilt: XII, Sayi: 45, 46, 47, 48 Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1948

ত্রয়োদশ : ওয়েবসাইট লিংকসমূহ

- http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?t=60832
- http://www.alargam.com/general/arabsince/7.htm
- http://www.arabicmagazine.com/artDetails.aspx?id=56
- http://balagh.com/deen/ya1dbf66.htm
- http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26850
- http://www.islamset.com/arabic/aislam/civil/civill/algalely.html
- http://www.islamset.com/arabic/aislam/civil/civill/algalely.html
- http://www.islamset.com/arabic/asc/fangryl.html
- http://www.islamtoday.net/toislam/11/11.3.cfm.
- http://www.nooran.org/Default.asp
- http://www.osrty.com/main/?a=4044&c=352

চতুর্দশ : পত্রিকা ও সাময়িকী

- আবদুল বাকি খলিফা, আল-আসারুত তারিখিয়্যাহ ফিল-বুলকান, *আশ-শারকুল আওসাত* পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ, ২৫/১১/২০০৮ খ্রি.।
- তাওফিক আলি ওয়াহবা, আল-মুআহাদাত ফিল-ইসলাম, *মাজাল্লাতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যা*, সংখ্যা : ২০।
- জাদুল হক, *মাজাল্লাতুল আযহার*, ডিসেম্বর, ১৯৯৩ খ্রি.।
- জুমআ আলি খাওলি, আল-মিসালিয়্যা ওয়াল-ওয়াকিয়িয়্যা ফিল-ইসলাম, *মাজাল্লাতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যা বিল-মাদিনাতিল মুনাওয়ারা*, সংখ্যা : ৪৪।
- জোয়ান ভার্নেট (Vernet), আল-ইনজাযাতুল মিকানিকিয়্যা ফিল-গারবিল ইসলামি, *মাজাল্লাতুল উলুমিল আমরিকিয়্যা*, আরবি অনুবাদ, কুয়েত, অক্টোবর-নভেম্বর, খণ্ড : ১০, ১৯৯৪ খ্রি.।
- সুহাইলা যাইনুল আবিদিন, নাযারিয়্যাতুদ দাওলাহ ইনদা ইবনি খালদুন, *মাজাল্লাতুল মানার*, সংখ্যা : ৭৫, ৭৬, ৭৭, বর্ষ : ১৪২৪ হি.।
- আদিল ইওয়াজ, আল-মাদিনাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-মাদিনাতুল উরুব্বিয়্যা, *মাজাল্লাতুল ইলম ওয়াত-তিকনুলুজিয়া*, মাহাদুল ইনমায়িল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, সংখ্যা : ২৭, ১৯৯২ খ্রি.।
- আবদুল কারিম যাইদান, আশ-শারিআতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-কানুনুদ দুওয়ালিল আম, *মাজাল্লাতুল উলুমিস সিয়াসিয়্যা ওয়াল-কানুনিয়্যা*, তৃতীয় পর্ব, কায়রো, ১৯৭৩ খ্রি.।
- আলি আবদুল্লাহ দাফফা, মুবতাকিরু ইলমিল জাবর মুহাম্মাদ ইবনু মুসা আল-খাওয়ারিযমি, *মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যা*।
- ফুয়াদ ইয়াহইয়া, প্রবন্ধ : জারদুন আসারিয়্যুন লি-খানাতি দিমাশক, *মাজাল্লাতুল হাওলিয়্যাতিল আসারিয়্যা*, সংখ্যা : ৩১।

- *আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যা*, সংখ্যা : ৩৩৪, বর্ষ : ২৯, যিলকদ, ১৪২৫ হি./জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রি.।
- *মাজাল্লাতুল মুসলিমিল মুআসির*, সংখ্যা : ২৫, বর্ষ : ১৪০১ হি.।
- *মাজাল্লাতু বারিদিল ইউনেস্কো*, অক্টোবর-সংখ্যা, বর্ষ : ১৯৮০ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ খাইর মাহমুদ বিকায়ি, আত-তালিফ ফি তবাকাতিল মালিকিয়্যা ফিত-তুরাসিল আরাবি দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়াসফিয়্যাতুন, *মাজাল্লাতু মাকতাবাতিল মালিক ফাহদিল ওয়াতানিয়্যা*, রজব, ১৪২৫ হি.।
- ওয়ালিদ আহমাদ সাইয়িদ, ইনয়িকাসাতুন ফালাকিয়্যাতুন ফিল-ইমারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা, প্রবন্ধ : সৌদি *জাযিরাতুল আরব* পত্রিকা।
- *মুলহাকুল* (অতিরিক্ত পাতা) *আনবাউল কুয়েতিয়্যা*, সংখ্যা : ৫১৭, তারিখ : ১৬/৭/১৯৮৬ খ্রি.।
- *আখবারুল মিসরিয়্যা* পত্রিকা, তারিখ : ১৩/৪/২০০৭ খ্রি.।
- *আশ-শারকুল আওসাত* পত্রিকা, তারিখ : ২৫/১১/২০০৮ খ্রি.।

।। চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।।

।। সমাপ্ত।।

মাকতাবাতুল হাসান-এর
ইতিহাস-প্রকাশনা পরিকল্পনা

- বৃহৎ কলেবরের সমৃদ্ধ ইসলামি ইতিহাস বিশ্বকোষ।
- সংক্ষিপ্ত কলেবরের ইসলামি ইতিহাসকোষ।
- এক মলাটে ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।
- রাজনীতি, সমরনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস।
- অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস।
- রাজপরিবার-কেন্দ্রিক ইতিহাস।
- জীবনীকেন্দ্রিক ইতিহাস।
- জাতি-দল-শ্রেণিকেন্দ্রিক ইতিহাস।
- স্থাপনা-প্রতিষ্ঠাননির্ভর ইতিহাস।
- ইসলামি ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় বিভিন্ন ঘটনানির্ভর গ্রন্থ।
- শিশুতোষ ইতিহাসগ্রন্থ।
- ইতিহাসনির্ভর মানচিত্র, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি।

আমাদের প্রথম কর্মপন্থা হবে প্রকৃতার্থে এ কথা অনুধাবন করা যে, নিশ্চয়ই এ জাতির সফলতা, মুক্তি কেবল কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণেই নিহিত। এটি কোনো আবেগপ্রসূত, অপ্রমাণিত কথা নয়। তেমনই নিজের সত্যিকারের অবস্থান সম্পর্কে বেখবর হীনম্মন্য কারও কথা নয়। বরং এটা দলিলসমৃদ্ধ যৌক্তিক কথা। আমরা এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় দেখেছি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার অনন্য চিত্র। আর এই অনন্যতা নামাযের মেহরাবে কিংবা জিহাদের ময়দানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তা মানবজীবনের ছোট-বড় প্রতিটা ক্ষেত্রেই ছিল। ইসলামি সভ্যতার অনুশীলন অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে, আর আমরাও এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাসী যে, ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি অবিমিশ্রিত ও অনন্য এক দৃষ্টান্ত। যা ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাধারা, সাহিত্য-শিল্পকলা, চরিত্র ও মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, শান্তি ও সংঘাত ইত্যাদিতে চিরভাস্বর। প্রতিটি শাখাতে এই বিশেষ অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপিত কুরআন-সুন্নাহের সুস্পষ্ট মূলনীতির উপর।

মাকতাবাতুল হাসান